সমরেশদার 'নস্টামি'

২০০০ সালের গোড়ার দিক। একটি বিদেশি পত্রিকার সম্পাদনার বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে সবে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম ভাবছি, আর এক ভূত উড়ে এসে জুড়ে বসল ঘাড়ে। ঘোরাফেরা করছিলই সে। জাঁকিয়ে বসল, যখন সমরেশদার 'কইতে কথা বাধে' শেষ না হয়েই শেষ হয়ে গেল। অপ্রিয় সত্যকথনে প্রিয়জনরা তখন সমরেশদার মুণ্ডপাত করছেন যে যাঁর মতো; অবশ্যই তাঁর আড়ালে-আব্‌ডালে।

একদিন পূর্ণদাস রোডে সমরেশদার অফিসে হানা দিয়ে বললাম,—একটি নতুন মাসিকপত্র শুরু করতে চাই; নাম ভেবেছি—'পত্রপাঠ'। আপনাকে প্রতি সংখ্যাতেই লিখতে হবে। এই যে কইতে কথা সত্যিই বেধে গেল, তা আবার চালু করতে হবে, কইতেই হবে অবরুদ্ধ কথাগুলি।

পত্রিকার নামটা শুনেই সমরেশদা হা হা করে দরাজ গলায় হেসে উঠে বললেন,—'পত্রপাঠ'! সত্যি, তোমার মাথায় আসেও বটে! ঠিক আছে, লিখব।

সমরেশদার বিরল স্নেহে ততদিনে এ অধম সমরেশ মজুমদার রূপী ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন। শুরু হল কাগজ। 'কইতে কথা বাধে' শিরোনামটি শুধু বদলে গেল, কলমের নাম দিলেন—'অকপটে'। জুলাইয়ের শেষ সপ্তায় প্রেস ক্লাবে পত্রপাঠ-এর প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সমরেশ মজুমদার দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন,—".... এবার অকপটে কথা বলার সময় এসেছে।..." সেই অনুষ্ঠানে অনেক দিকপালের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বন্ধু, দীপ প্রকাশনের কর্ণধার শ্রী শংকর মণ্ডল। প্রচার-বিমুখ শংকরবাবু শত অনুরোধেও মঞ্চের ধারে-কাছে এলেন না। অথচ প্রথম সংখ্যার, অফসেট প্রিন্টিং বাদে, যাবতীয় কর্ম তাঁরই অবদান। এবং পরবর্তী একটি বছর তাঁরই আশ্রয়ে পত্রপাঠের পথ চলা। সেই শংকরবাবুর প্রকাশনা থেকে আজ 'বাঙালির নষ্টামি' নামে, দু'হাজার আট সাল পর্যন্ত প্রকাশিত 'অকপটে'-র সামগ্রিক লেখা-লিখি প্রকাশিত হতে চলেছে—এও এক 'নস্টামি'—নস্টালজিক নস্টামি।

বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ধাক্কা সামলাতে প্রথম-প্রথম 'অকপটে' একটু সতর্ক পা ফেলছিল বটে, কিন্তু নাচের পা কি আর বেতালে চলতে পারে? ফিরে এল ছন্দের অচিরাৎ। সাহিত্য, সমাজ, রাজনীতি—ছাড় পায়নি কেউই।

দীর্ঘ সাড়ে আট বছরে মাত্র একটিবার, অকস্মাৎ বিদেশ গমনে, একটি সংখ্যায় তাঁর কলম না থাকায় পত্রপাঠ-এর মাথায় অকস্মাৎ বজ্রপাত হয়েছিল। তা পুষিয়ে গেল এই গ্রন্থ প্রকাশে।

এই বইয়ের সবচাইতে বড় গুণ, প্রায় প্রতিটি রচনাতেই গল্পের স্বাদ। কোনো-কোনোটি তো একেবারে 'সত্যি নয়, গল্প'! তাঁর রচনার গুণাগুণ যদি এই অধমাধম বর্ণনা করার চেষ্টামাত্রও করে, তবে পাঠককুল যে 'রেগে আগুন তেলে বেগুন' হবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

সমরেশদার এই সরস গ্রন্থের সবচেয়ে বড় রসিকতা হল, অন্ধ স্নেহে এই অনুজকে এই বইয়ের ভূমিকা লিখতে বলা। মারাত্মক 'নস্টামি' বৈ আর কী।

এই 'আবোল তাবোল' বকুনি যে ভূমিকা হল না, তা নিয়ে আর ভূমিকা না করাই শ্রেয়।

পাঠকদের কাছে একটিই অনুরোধ, ভবিষ্যতে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড এবং খণ্ডের পর খণ্ড যাতে বেরোয়—তার জন্যে আপনাদের প্রিয় লেখকের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ চালিয়েই যাবেন। তাহলে আপনাদের সঙ্গে পত্রপাঠেরও কার্যসিদ্ধি, 'ব্যোম শংকর!' বলে একেবারে 'সিদ্ধি'-Love!

শংকর আইচ

নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টীকা

বছর দশেক আগের কথা। কলেজস্ট্রিটের এক বিখ্যাত প্রকাশকের অফিসে গিয়েছি। ঘরে ঢুকতেই দেখলাম একজন প্রবীণ লেখক প্রকাশকের টেবিলের এপাশে বসে আছেন। ভদ্রলোক আমার থেকে বয়েসে অনেক বড় এবং খুব অমায়িক, আমাকে স্নেহের চোখে দেখেন। তিরিশ বছর আগে ওঁর লেখা কয়েকটি বই হট্‌কেকের মতো বিক্রি হয়েছিল। এখনও সেগুলোর চাহিদা একদম কমে যায়নি। কিন্তু তার পরের লেখাগুলো নিয়ে তেমন হইচই হয়নি। তবে বেশিরভাগ অনুষ্ঠানে ওঁকে প্রধান অতিথির আসনে দেখা যায়। কয়েকটি কাগজে নিয়মিত লেখেন তিনি। আমাকে দেখে প্রকাশক উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন, 'আরে! আসুন, আসুন। বসুন সমরেশবাবু।'

লেখক আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। পাশে বসে বললাম, 'কেন আছেন দাদা?'

'আছি, এখনও আছি।' উনি হাসলেন।

'এভাবে বলছেন কেন? আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।'

প্রকাশক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী খাবেন বলুন? চা না কফি?'

আমি কিছু বলার আগেই লেখক বললেন, 'এই দেখুন, এখন আপনার সময়, তাই আপনি ঢোকামাত্র ইনি জিজ্ঞাসা করলেন কী খাবেন? আর আমি প্রায় চল্লিশ মিনিট আগে এখানে এসেছি, আমাকে একবারও জিজ্ঞাসা করেননি!'

আমি হতভম্ব। প্রকাশক অস্বস্তিতে পড়লেন,—'আরে না না। এভাবে বলছ কেন? আসলে কথা বলতে বলতে খেয়াল ছিল না।'

লেখক বললেন, 'আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে হলে ঠিক খেয়াল হত। বুঝলেন ভাই সমরেশ, আপনারও এই দিনটা আসবে, যখন প্রকাশকের ঘরে ঢুকলেই বুঝতে পারবেন লোকটা মুখে না বললেও মনে মনে বলছে, আপদটা কেন এল?'

বললাম, 'দাদা, সেরকম অবস্থায় পৌঁছবার আগেই লেখা থামিয়ে দেব।'

'পারবেন না। আপনি আমি এমন একটা ঘোড়ায় চড়েছি, যার ওপর আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই। যখন টগবগিয়ে ছুটবে তখন লাগাম ধরে বসে মনে হবে হাওয়ার উড়ছি। সবাই খাতির করবে। যেই ঘোড়ার পায়ে বাত ধরবে, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলবে, অমনি পিছিয়ে পড়বেন। এটাই জীবনের নিয়ম।' প্রবীণ লেখক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন,—'চলি।'

প্রকাশক বলেছিলেন, 'আপনি রাগ করে উঠে যাচ্ছেন!'

'না ভাই। রাগ নয়, সমরেশকে দেখে আমার নিজের অতীত মনে পড়ল। আমাকে দেখে সমরেশ যদি নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পায় তো তার চেয়ে ভালো আর কিছুতেই ওর হতে পারে না।' লেখক চলে গেলেন।

প্রকাশক বললেন, 'এই হয়েছে মুশকিল। আজকাল ইনি ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে মরছেন। আচ্ছা, ওঁর

উপন্যাস ছাপলে বছরে তিনশো কপির বেশি বিক্রি হতে চায় না। হাজার কপি বিক্রি না হ খরচ ওঠে না, উনি একথাটা বুঝতে চান না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'শেষ বয়সে পৌঁছে কি সব লেখকই এমন হন?'

'না সবাই নয়। কেউ কেউ। মুজতবা আলী সাহেব, তারাশঙ্করবাবুকে এমন কথা বলতে শুনিনি কিন্তু অনেকেই ঈর্ষান্বিত হন। আপনার বই-এর বিজ্ঞাপন বড় করে ছাপছি দেখে আমাদের ঘ বই আছে এমন তিনজন বিখ্যাত লেখক চিঠি দিয়েছেন—এবার থেকে শুধু ওর বইই ছাপুন; আমা দরকার তো ফুরিয়ে গেছে। কী করি বলুন? যাঁর বই বিজ্ঞাপন দিলে বিক্রি হয় তাঁর বিজ্ঞাপ দেব না?' প্রকাশক জিজ্ঞাসা করলেন।

এ বড় বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রকাশককে 'না' বলার ক্ষমতা আমার নেই। উনি ব্যবসা করছেন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে বসেননি। বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নিজে ছেলেমেয়েকে নিশ্চয়ই অভুক্ত রাখতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা জীবনানন্দের কথা আমরা জানি। এঁরা ছাড়া আর কোন কোন বাঙালি লেখক মৃত্যুর পরে চমৎকার বেঁচে আছেন? সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, বঙ্কিম বেঁচে আছেন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে। তাছাড়া তিনি কিংবদন্তি হয়ে যাওয়ায় এবং গ্রন্থাবলির সংরক্ষণের কারণে এই আলোচনায় আসবেন না। 'কল্লোলে'র বা 'কালিকলমে'র লেখকরা এখন কে কেমন ভাবে বেঁচে আছেন? বই কিনতে আসা পাঠকদের কাছে তাঁদের প্রয়োজন কতটা এখানেও সেই গ্রন্থাবলি। তারাশঙ্কর বা মানিক ব্যানার্জির বই আলাদা বিক্রি নিতান্তই কম। কিন্তু গ্রন্থাবলি এখনও চলছে। বিভূতিভূষণ চমৎকার বেঁচে আছেন কয়েকটি বই-এর কল্যাণে। গ্রন্থাবলি ছাড়াও 'পথের পাঁচালী', 'চাঁদের পাহাড়', 'দেবযান', 'আরণ্যকে'র বিক্রি এক তালেই চলেছে। বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্তরা এখন মৃত। মৃত্যুর পরে দারুণভাবে বেঁচে উঠেছেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এই ব্যাপারে সৈয়দ মুজতবা আলীও পিছিয়ে নেই খুব বেশি। কিন্তু বেদনাদায়কভাবে হারিয়ে গিয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। শুধু টেনিদা এখনও প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। সন্তোষ কুমার ঘোষের বই বিক্রি তাঁর জীবদ্দশায় কম ছিল, এখন তো নেইই। নরেন্দ্রনাথ মিত্র মাঝারি বিক্রির শ্রেণীতে ছিলেন, এখন তো বিক্রি কমবেই। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার সমরেশদার ক্ষেত্রে হল। আমরা সমরেশদাকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম সাতজন ঔপন্যাসিকের একজন বলে মনে করি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরেই এই বিক্রি কমে গিয়েছে অস্বাভাবিকভাবে। কেন এমন হল তা গবেষকরা বলতে পারবেন। আনন্দ পাবলিশার্স চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমরাও আশা করছি একটা পুনরুত্থানের।

আজ যিনি জনপ্রিয় লেখক তিনি মারা গেলে হারিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ লেখক মারা গেলেই পাঠক আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে? তবে কি জীবিত লেখকই আকর্ষণের কারণ, তাঁর লেখা নয়? আমি বিশ্বাস করি না।

বিমল কর, রমাপদ চৌধুরীকে পাঠকরা খুব পছন্দ করতেন। বিশেষ করে রমাপদদাকে। আজও সেটা বজায় আছে। কিন্তু আশুতোষ মুখার্জিকে উন্নাসিকরা বড় মাপের সাহিত্যিক বলে মনে না করলেও তাঁর মৃত্যুর পরে বিক্রি মোটেই কমেনি। একই কথা আশাপূর্ণা দেবী সম্পর্কে। তিনি মহিলা লেখিকা হিসেবে চিরকাল উপেক্ষা পেয়ে এসেছেন এদেশীয় সমালোচকদের। এমনকী জ্ঞানপীঠ পাওয়ার পরেও। পাঠকরা কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর মুখ ফিরিয়ে নেননি। এখানেই বোধের জয়, বুদ্ধির হার।

অবধূত, নিমাই ভট্টাচার্য, চাণক্য সেনরা কয়েকটি বই-এর কারণে জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠলেও পরে সেটা ধরে রাখতে পারেননি। কিন্তু এ ব্যাপারে শংকর অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করে গেছেন। অথবা যাচ্ছেন। কু-লোকে বলে, এখন ওঁর জনপ্রিয়তা নিম্নমুখী। হয়তো! কিন্তু কাল

সূচিপত্র

সময় বড় কঠিন দাওয়াই	১
কৃপাধন্য কাগুজে লেখক	৩
সমালোচনা সাহিত্যিক	৬
তুমি তো জানো না কিছু	৯
নির্বাপিত জ্যোতির্ময় টীকা	১২
সান্ত্বনা	১৫
বিকৃত করিয়া মুখ	১৭
নাটুকেপনা	২০
রবীন্দ্র-অনাথ	২৩
নামগান	২৬
চাইলেই হওয়া যায় না	২৮
বিদ্যে দাও, বুদ্ধি দাও, সেই সঙ্গে কপালও	৩১
দাদাগিরি-ভাইগিরি	৩৪
উদারতা না দুর্বলতা	৩৬
প্যারাসাইট লেখক	৩৯
কে কাকে ভোগ করে	৪৪
তেনারা আছেন, থাকবেন	৪৭
বেশ আছি!	৫০
বই-ব্যবসা এবং লেখক	৫৩
সাক্ষী থাকুন গোপালবাবু	৫৬
লাল শায়ায় ইস্ত্রি	৫৮
লুটেরা	৬১
ন্যুইয়ারের ইয়ার্কি	৬৩
পারভার্টেড উইপোকারা	৬৫
নেকু বনাম ন্যাকামি	৬৭
চোরের মা, অথবা চোরের দিদি, চোরের বাবা কোথায়?	৭০
জলের ভূমিকা	৭৩
পত্রপাঠের কান	৭৬

দেওয়ালটা একটু সরাও ৭৯
যদি সুযোগ পাই ৮২
লেখক-প্রকাশক, বিচিত্র সম্বন্ধ ৮৪
নিজের জীবন আর লেখা যাঁর একাকার ৮৭
গাঁয়ে মানে না ৯০
দীপ্তেন সান্যাল (শেখর) ৯২
আকালচার ৯৯
অর্ধ শতাব্দীর একটি সাম্রাজ্য ১০২
ঐতিহাসিক ভুল ক'বার হয়? ১০৫
ভালোমানুষের পো ১০৯
'উপ'-র উপদ্রব ১১২
লেখকের দাম ফুলের তোড়া ১১৫
বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ১১৯
পুলিশ ও ভাই পুলিশ ১২৩
মেড ফর ঈচ আদার ১২৬
ঘুষের কথা ১২৯
চাকর-চরিত ১৩২
রূপকথা বিরূপকথা ১৩৫
'পত্রপাঠ কি জয়'! ১৩৯
পার করেগা ১৪২
বুনো ওল বাঘা তেঁতুল ১৪৪
হায় সমরেশদা!! ১৪৬
ব্যঙ্গ-সংস্কৃতি ১৪৯
রবীন্দ্রনাথের প্রেম ১৫২
দাদাঠাকুর ১৫৪
ভোটায় নমঃ ১৫৬
রিমেক ১৫৮
স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং ১৬১
লেখকের দুর্দিন ১৬৪
শাদি কা লাড্ডু ১৬৮
জীবিত মানুষের গল্প ১৭১
কাঙাল চরিত ১৭৭
কইতে কথা বাধে না ১৮০
গিল্ডোটিন ১৮৩
নন্দীগ্রামের নন্দী-ভৃঙ্গী ১৮৬
হারাবার ভয়ডর ১৮৮
জো হুজুর ১৯১
পুত্রদায় ১৯৪
ভালোবাসা, রাগ-অভিমান ১৯৬
দশে মিলি করি কাজ ১৯৮
কোকিলের ডিম ২০১
চলে যা (তসলি) মা প্রাণে বাঁচি ২০৫
অহেতুক পরামর্শ ২০৮
ওহে সমরেশ... ২১০
DAM-পত্য ২১৩
বুক ভেঙে যায় বিজ্ঞাপনে ২১৫
দিবস-হুজুগ ২১৭
WRONG-বদল ২১৯
আমরা সবাই স্বাধীন... ২২১
B-রোধি পক্ষ ২২৪
জোটের জট ২২৬

সময় বড় কঠিন দাও

'কইতে কথা বাধে' লেখার ভাবনা মাথায় এলে আমার এক সুহৃদ বলেছিলেন, 'লিখো না, বি
পড়বে।'

আমি বলেছিলাম, 'কাউকে আহত করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। কারও ব্যক্তি
নিয়ে কুৎসা গাওয়ার কথা ভাবছি না। যেমনটি দেখেছি তেমনটিই লিখতে চাই।'

সুহৃদ জানতে চেয়েছিলেন, 'লেখো তো গল্প-উপন্যাস। হঠাৎ এসব কেন?'

বললাম, 'সেই কবে থেকে দেখে আসছি, সমসাময়িক লেখকদের সম্পর্কে কোনো
কিছু লিখতে চান না। এমনকী প্রকাশ্যে বলতেও শুনি না। অথচ নিভৃত আলাপে মন্তব্য ক
দ্বিধা করেন না অনেকেই। তাই।' সুহৃদ বললেন, 'কিন্তু লেখার পর যদি দ্যাখো যাদের কথা
তারা অস্বীকার করছে! বলছে, বলেনি! তাহলে?'

আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। তা আবার হয় নাকি!

সুহৃদ বলেছেন, 'শোনো, তোমার অল্প বয়সে যাঁরা চমক দিয়ে শুরু করেছেন, একটু
আলোচিত হয়েছিলেন এবং তারপর আর কিছু দেওয়ার ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও সেই সুবাদে এ
মঞ্চে জায়গা পেয়ে যান, তাঁদের কারও কারও বুকে ঈর্ষা ছাড়া কোনো বস্তু নেই। আর
মানুষকে মিথ্যেবাদী করে।'

শেষ কিস্তি বেরোলো যখন, তখন দেখলাম, সম্পাদক মশাই অতি সতর্ক হয়েছেন। এর অ
সংখ্যাগুলোকে তিনি গুরুত্ব দেননি, সম্ভবত তসলিমার জন্যেই ওই সতর্কতা। অতি উৎসাহে
আবার লেখার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। এটি নাকি আমেরিকান সম্পাদনার নিদর্শন। জানি না।
মনে হচ্ছে 'তসলিমা বাঁচাও' কমিটি তৈরি হলে তার সভাপতি ওই কাণ্ডটি করতেন।

কবি শামসুর রহমান প্রচুর পান করে গাড়িতে বসেছিলেন বলে লিখেছিলাম।

সম্পাদক মশাই ব্রাকেটে লিখেছেন, উনি অস্বীকার করেছেন। কেন করেছেন? আমি
লিখেছিলাম? না, মাঝরাতে পানে জ্ঞান হারালে কী ঘটছে চারপাশে তা পরের দিন জেগে
পর মনে থাকে না। তাই অস্বীকার। বাঃ। বুদ্ধদেব গুহ অস্বীকার করেছেন তসলিমার টেলি
করার ব্যাপারটা। সম্পাদক সেটাই লিখেছেন ব্রাকেটে। বুদ্ধদেবদা সেটা পড়ে বলেছেন তর্সা
ফোন তিনি পেয়েছিলেন এবং কখনোই অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর বিশ্বাস সাক্ষাতে অ
বলেছেন ঘটনাটা, ঢাকায় ফোন করে নয়।

আলতাফ হোসেনের সন্ধান পাওয়া যায়নি মানে চরিত্রটি আমার কল্পিত। কিন্তু ভদ্রলোক
ঢাকার বাংলা বাজারে যান। ওঁর ডাকনাম মেনু। সবাই 'মেনুভাই' বলে জানে। বিশাল

তাঁর, পার্ল পাবলিকেশন। সম্পাদক অবশ্য আমাকে একটু অক্সিজেন দিয়েছেন এই বলে, কবির ভাই-এর বাড়িতে নিজের পায়ে না-দাঁড়ানো তসলিমাকে দেখেছেন, এমন কিছু সাক্ষীর সন্ধান তিনি পেয়েছেন। অর্থাৎ কোনো লেখক কিছু লিখলে সম্পাদক তা ডিটেকটিভ এজেন্সির কাছে পাঠাবেন। তাদের মন্তব্য ব্রাকেটে ছাপবেন। যেন চোরকে খোঁচা দিচ্ছেন। যদি সম্পাদক মনে করেন লেখক মিথ্যে লিখছেন, তাহলে জেনেশুনে সেই লেখা তিনি ছাপবেন কেন? লেখার শেষে সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকতে পারত। পরবর্তী সংখ্যায় চিঠিপত্রে গালাগাল দেওয়া যেতে পারত।

প্রায় দু'মাস গবেষণা করার পর সম্পাদক যে শেষপর্যন্ত লেখাটা ছেপেছেন, এতে আমি কৃতার্থ। কিন্তু বিস্ময় আরও অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে।

ষাটের দশকের সুনীলদারা যখন হইহই করে লেখা শুরু করলেন, তখন একজন লেখক তাঁর নিজস্ব গদ্যের জন্যে কিছু স্তাবক তৈরি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাদের বেশিদিন ধরে রাখার ক্ষমতা ছিল না। সুনীলদারা অনেক এগিয়ে যাচ্ছেন অথচ তিনি পারছেন না বলে এমন ঈর্ষায় আক্রান্ত হলেন যে তাঁর লেখায় অশ্লীলতার বন্যা বইতে লাগল। শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার ঘোষকে বেনামে চিঠি লিখতেন গালাগাল দিয়ে। তাঁর ভাষা বেশ জোরালো ছিল কিন্তু নির্বাচিত অশ্লীল শব্দ থেকে পচা গন্ধ বের হত। ইনি বড় কাগজগুলোয় লেখার আমন্ত্রণ পেতেন না। প্রথম দিকে তরুণ লেখকদের সঙ্গে শিং ভেঙে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, পরে প্রাক্তন বন্ধুদের সঙ্গ চেয়েছেন, যাতে একটু ভদ্রলোক হওয়া যায়। ষাট বছদিন পেরিয়ে আসা মানুষটিকে আমি লক্ষ্য করেছি দীর্ঘকাল। আমার সঙ্গে কখনোই কথা হত না। কিন্তু ইদানীং বইমেলায় গেলে মুখোমুখি হলে দু-একটা কথা বলেছি, উনিও শান্তির জল-খাওয়া মুখ করে কথা বলেছেন আমার সঙ্গে। সেই সময় ওঁর মুখ থেকে সুনীলদার অতীতকালের একটি প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। বেশ রসিক তিনি বলেছিলেন। শ্রোতা ছিলেন আরও দুজন। গতকাল শুনলাম, তিনি অস্বীকার করেছেন। বলেছেন আমার সঙ্গে এসব কথা হয়নি। উনি জানেন না, কথাটা শোনার পরের সকালে টেলিফোনে সুনীলদার সঙ্গে এই ব্যাপারে আমার আলোচনা হয় এবং সুনীলদার বক্তব্য আমি জানতে পারি।

তাহলে এই ভদ্রলোকের মিথ্যাচরণের কারণ কী? অবশ্যই সুনীলদার বিপক্ষে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছেন না। লুকিয়ে যা বলা যায়, প্রকাশ্যে তা স্বীকার করলে যদি আখের নষ্ট হয়। হায়, অন্তর্জলি যাত্রার সেই বৃদ্ধের সঙ্গে তফাত করা যাচ্ছে না। এখনও লালা গড়াচ্ছে।

দশচক্রে ভগবানও ভূত হয়। বামুনের কাঁধের ছাগলকে বলতে বলতে কুকুর বানানো যায়। সজ্জনেরা এমন চাল চেলেছেন যে মনেই হবে 'কইতে কথা' বানানো। উপন্যাসের গোড়ায় যেমন কেউ কেউ লেখেন, সব চরিত্র কাল্পনিক, তেমনই। কিন্তু সময় বড় কঠিন দাওয়াই। ভূতকে পালাতে হবে, কুকুর ছাগল হবেই। এইটেই এঁরা বোঝেন না।

সুহৃদ উপদেশ দিয়েছিলেন, লিখো না। বিদ্বজ্জনরা চোখ পাকিয়েছেন, কিন্তু সাধারণ পাঠকরা যেসব চিঠি লিখেছেন তা আমাকে আশ্বস্ত করেছে এই কারণে, সমসাময়িকদের নিয়ে লেখালেখি করাটা দরকার ছিল। আর কতকাল জঙ্গলে মুখ ঢুকিয়ে সারা শরীরটাকে শিকারির সামনে তুলে ধরব?

আগস্ট ২০০০

কৃপাধন্য কাগুজে লে

ধরা যাক, কোনো তরুণ এবং নবীন লেখক গোটা দু'য়েক গল্প লিখলেন বাংলা ভাষায় সবে বিখ্যাত কাগজে। সেই গল্পদুটো এত ভালো যে চিঠিপত্র ছাপা হল উৎসাহ জানিয়ে। সম্প উৎসাহিত হয়ে লেখকের উপন্যাস ছাপলেন শারদীয় সংখ্যায়। সেটাও খুব ভালো হল। স্বাভা ভাবেই লেখক আশা করবেন কলেজস্ট্রিটের প্রকাশকরা ছুটে আসবেন সেই উপন্যাসটিকে এর চেহারা দিতে। কিন্তু কেউ এল না। বিখ্যাত কাগজটির যদি নিজস্ব প্রকাশনা সংস্থা থাকে তাহ বছরখানেক বাদে উপন্যাসটি বই হয়ে বেরোতে পারে। ততদিনে আর একটি পুজো এসে গে লেখককে দিয়ে আর একটি উপন্যাস লেখানো হয়েছে। কাগজে কাগজে তাকে নিয়ে খুব হই অথচ কলেজস্ট্রিট নিরুত্তাপ। এক বছর বাদে প্রথম উপন্যাসের বিক্রির হিসেব পাওয়া গেল, তিন বত্রিশ কপি। কলেজস্ট্রিটের অন্য প্রকাশকরা মুখ লুকিয়ে বলতে শুরু করলেন, ভাগ্যিস বইটা ছাপি

এখন বই প্রকাশের খরচ খুব বেড়ে গেছে। কাগজ, ছাপা, শিল্পী, বিজ্ঞাপন, বাঁধাই-এর খ যা, তা মিটিয়ে কোনো বই থেকে লাভ করতে হলে অন্তত এক হাজার কপি মাস আটে মধ্যে বিক্রি হওয়া দরকার। কাগজ থেকে বাঁধাই—বিভিন্ন খাতে খরচ করতে হয় নগদে। একে লেখককে এক পয়সা না দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা যায়। লেখক টাকা চাইতে দুঃসাহস দেখালে সহজে ধমকানো যায়, দূর মশাই, বিক্রিবাটা নেই, দেব কোত্থেকে! অতএব যার বই অন্তত এক হাজ বিক্রি হয় না বছরে, তার বই ছাপা মানে ডুবে যাওয়া।

ধরা যাক, এক নবীনা লেখিকা সম্পাদকের স্নেহধন্য হওয়ায় তাঁর উপন্যাস, গল্প ঘন ঘন ছ হতে লাগল কাগজে। সম্পাদক তাঁর বন্ধুদের মুচকি হেসে বললেন, এমন প্রচার করব যে ও লেখিকা বানাতে অসুবিধে হবে না। এই প্রচারের অঙ্গ হিসাবে বিরাট টাকার সাহিত্য-পুরস্কার দেওয়া হল। সম্পাদকের নিজস্ব প্রকাশনা থেকে লেখিকার বই ছাপা হল। কিন্তু সেই বই তিন-চারশোতে আটকে থাকে, তাহলে কলেজস্ট্রিট মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর কলেজস্ট্রিট এগি না এলে সেই লেখিকার পেছনে যত বড় কাগজই থাক না কেন, তার আর ভবিষ্যৎ রইল ন

ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম। সিংহী খুব ছোটাছুটি করে একটি জেব্রাকে বধ করতে সক্ষম হ দূর থেকে তার এই পরিশ্রম দেখল সিংহ এবং শাবকেরা। যখন বুঝতে পারল শিকার মা গিয়েছে, তখন তারা গম্ভীর পায়ে হেঁটে এসে সিংহীর পাশে বসে মাংস ছিঁড়তে লাগল। নিজে উদ্যোগী হয়ে শিকার করবে না।

আমার প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছিল পঁচাত্তর সালে 'দৌড়'। তার আট বছর আগে 'দেশে' প্রথ গল্প লিখেছি। বছরে দুটোর বেশি ছাপা হয়নি। শারদীয় সংখ্যায় জায়গা পেয়েছি বাহাত্তর সালে ছোটগল্প ছাপা হয়েছিল। ধারাবাহিক লিখেছি উনআশি সালে। অর্থাৎ প্রথম উপন্যাসের জন্যে অ এবং ধারাবাহিকের জন্যে বারোটা বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আনন্দ পাবলিশার্স 'দৌড়' ব

হিসেবে ছাপলেও পরের উপন্যাস 'এই আমি রেণু' দে'জ পাবলিশার্স ছাপতে চায়নি। বিক্রি হবে না, এই ভয়ে। প্রথম ধারাবাহিক 'উত্তরাধিকার' যখন 'দেশে' বেরোচ্ছিল তখনও কোনো প্রকাশকের দেখা পাইনি। শেষ হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় গজেন্দ্রকুমার মিত্র আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, তিনি বইটি ছাপতে চান। মিত্র ও ঘোষ থেকে বইটি বেরিয়েছিল এবং এখনও বছরে বাইশশো বিক্রি হয়।

কিন্তু পঁচাত্তর সালটাকে যদি শুরুর সময় ধরি তাহলে আমার পরে মাত্র দু'জন লেখককে কলেজস্ট্রিট আমল দিয়েছে। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং সুচিত্রা ভট্টাচার্য। সঞ্জীব এখন তেমনভাবে লেখালেখির মধ্যে নেই, তবু এই দু'জনের যে-কোনো বই কলেজস্ট্রিটের প্রকাশকরা নির্দ্বিধায় ছাপতে রাজি আছেন। আমার অগ্রজ যাঁরা তাঁদের বয়স পঁয়ষট্টি পেরিয়েছে। আমার পরে এই দু'জন। তাহলে আগামী পনেরো বছর বাদে বাংলা গল্প-উপন্যাসের প্রকাশকরা কী করবেন? মনে রাখতে হবে, সঞ্জীবও ষাট পেরিয়ে গেছে, আমার পরে লেখা শুরু করেও। সুচিত্রাও পঞ্চাশ।

তাহলে জনপ্রিয় হতে পারছেন না কেন এখনকার তরুণ লেখক-লেখিকারা? বহু বছর ধরে লিখতে লিখতে শুধু কাগজের লেখক হিসেবে পরিচিত হয়ে থাকছেন যাঁরা, তাঁদের জন্যে আকর্ষণ বোধ করছেন না কলেজস্ট্রিটের প্রকাশকরা। কেন?

নতুন লেখক খুঁজে বের করবেন পত্রিকার সম্পাদকরা, তাকে যাচাই করে করে নিঃসন্দেহ হয়ে তবে প্রকাশকরা এগোবেন, এ কেমন কথা। এই করতে করতে তো তাঁদের ব্যবসাই উঠে যাবে।

আজ যখন পৃথিবীর সমস্ত ব্যবসাই সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে তখন কলেজস্ট্রিটের বই-ব্যবসা পড়ে রয়েছে মান্ধাতার বাবার আমলে। প্রকাশক কোনো বই ছেপে 'দেশ' বা 'বর্তমানে' বিজ্ঞাপন দিয়ে দোকানে বসে থাকেন আর ভাবেন ওই বিজ্ঞাপন দেখে হাজার হাজার লোক ছুটে আসবে বই কিনতে। তাঁরা চিন্তাও করেন না, 'দেশ' বা 'বর্তমান'-এর পাঠকদের বাইরে কোটি কোটি বাঙালি আছেন যাঁরা খবরটা পাচ্ছেন না। আর আজ যখন অন্য সব ব্যবসায়ী ক্রেতার দরজায় গিয়ে হাজির হচ্ছেন তখন ক্রেতা কেন তাঁর দোকানে ছুটে আসবে? 'রিডার্স ডাইজেস্ট' থেকে প্রতি সপ্তাহে বাড়িতে চিঠি আসে বিভিন্ন প্রকাশনার খবর দিয়ে। বই পড়ে তৃপ্তি না পেলে দাম ফেরতের প্রস্তাবও তাঁদের থাকে। স্কুল-বই বিক্রির জন্যে গ্রামেগঞ্জে সেলসম্যান ছুটে যান। অথচ গল্প-উপন্যাসের বেলায় সেই সনাতনী স্থবিরতা। কোনো উদ্যোগ নেই বাংলা বই-এর নতুন বাজার তৈরি করার। বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বই-এর দাম বাড়াচ্ছে। এক কেজি ইলিশ মাছ লোক দুশো টাকা দিয়ে কিনে খেয়ে ফেলে একবেলাতেই। একশো টাকার বই কিনতে সেই লোকই দশবার ভাবে। আবার চটি বই, অল্প দামের বই দেখলে ভাববে লেখক ফাঁকি দিয়েছেন। এইসব বেড়াজালের মধ্যে থেকে বেরোবার কোনো চেষ্টা দেখা যাচ্ছে না।

মাঝখানে বাংলাদেশের ঢেউ উঠেছিল। দু'চার বছর প্রচুর বই গিয়েছে সেখানে। তারপর যেই বাংলাদেশি রাইটাররা বাজারটা দখল করে নিল, অমনি কলেজস্ট্রিট মাথায় হাত দিয়ে বসল। এখন তাঁদের ভয়, যেটুকু বিক্রি এই বাংলায় আছে তা যেন বাংলাদেশি পাইরেটরা চোরাগোপ্তায় বই পাঠিয়ে দখল করে না নেয়।

অথচ দেখুন, বিহার, আসাম, ইউ.পি'র বাঙালিরা বই কিনতে চাইলে তাঁদের শহরের দোকানে বাংলা বই পান না। কলকাতায় টাকা পাঠিয়ে বই সংগ্রহ করার মতো সময় তাঁদের নেই। তাছাড়া কোন বই কখন বের হচ্ছে সে খবরও তাঁরা পান না। এঁদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ। এদিকে মালয়েশিয়া, ওদিকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রচুর বাঙালির বাস। ইংল্যান্ড-আমেরিকায় তো কথাই নেই। সেখানকার পশ্চিমবাংলার বাঙালিরা হয়তো তেমন বাংলা বই পড়েন না, কিন্তু বাংলাদেশের বাঙালিদের পড়ার আগ্রহ খুব। একমাত্র আনন্দ পাবলিশার্স ছাড়া কেউ পৌঁছয়নি এঁদের কাছে। গিল্ডের প্রাক্তন প্রধান

বিমল ধর মশাই বই নিয়ে ওসব দেশে বিক্রি করেছেন নিজের উদ্যোগে। এটুকুই। নিউ ইয়র্কে এই মুহূর্তে গোটা পাঁচেক বাংলা বই-এর দোকান চলছে। সব বাংলাদেশের লেখকের বই পাওয়া যাচ্ছে সেখানে। তাঁদের অনুযোগ, কলকাতার প্রকাশকদের সঙ্গে কাজ করতে চাই, কিন্তু সাড়া পাচ্ছি না।

অর্থাৎ নতুন বাজার তৈরি করতে না পারলে, ব্যবসায় নতুন ধারা যোগ করতে না পারলে বই-এর বিক্রি কমতে বাধ্য। ফলে নতুন লেখকদের সুযোগ দিতে ভয় পাবেন প্রকাশকরা। শুধু বইমেলার ওপর নির্ভর করে যে বেঁচে থাকা যায় না একথা ওঁরা এখনও বুঝতে পারছেন না।

সবচেয়ে হাস্যকর অবস্থা, কিছুটা বেদনাদায়কও, ক্যালকাটা বুক সেলার্স গিল্ডের। এঁরা প্রচুর খরচ করে বইমেলা করেন। অনেক টাকা ওঠে। কিন্তু বইব্যবসা আধুনিকীকরণের ব্যাপারে এঁদের কোনো মাথাব্যথা নেই। লক্ষ লক্ষ লোক আসে যে বইমেলায়, তার উদ্যোক্তাদের এই উদাসীনতা ক্ষমা করা যায় না। অথচ বহু বছর ধরে এঁদের কাছে একটি প্রস্তাব রেখে চলেছি। প্রস্তাবটি হল, এই মেলায় ঘোষণা করুন নবীন লেখকদের কাছে নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যায় নতুন উপন্যাসের জন্যে। তিরিশে জুনের মধ্যে সেটি গিল্ডের অফিসে জমা দিতে হবে। গিল্ড একটি কমিটি ঠিক করে দেবে, যারা পাণ্ডুলিপি পড়ে শ্রেষ্ঠ দুটি উপন্যাস বেছে দেবে। গিল্ড সেই দুটো উপন্যাস ছাপবে এবং পরের বইমেলার উদ্বোধনের দিনে সেই বই প্রকাশ করা হবে। এর ফলে দু'জন নবীন লেখক যে প্রচার পাবেন তা সহজেই অনুমেয়। পত্রিকার ওপর নির্ভর না করে গিল্ড নবীন এবং বলিষ্ঠ লেখক আবিষ্কারে এই সাহায্যটা করতেই পারেন। নইলে আজ থেকে কুড়ি বছর পরে যে বইমেলা হবে সেখানে পাঠকরা আসবেন মৃত লেখকদের বই কিনতে। লোকে যেমন মিউজিয়াম দেখতে যায়।

সেপ্টেম্বর ২০০০

সমালোচনা সাহিত্যিক

গত শনিবার সকাল থেকে অন্তত একশোটি টেলিফোন পেয়েছি। প্রত্যেকেই জানতে চেয়েছেন এমনটা কেন হল? শনিবার আনন্দবাজারে শ্রী রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 'কইতে কথা বাধে'-র যে দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছেন তাতে তিনি প্রায় সব লেখকদের কথা বলেছেন, শুধু তসলিমা নাসরিন বাদ। অথচ এঁদের মতে তসলিমার ব্যাপারে আমি ওই বইতে যা লিখেছি তা এখনও পর্যন্ত কেউ কাগজে-কলমে বলেননি, অতএব ওঁর ক্ষেত্রে 'কইতে কথা বাধে' নামকরণ সঠিক। তাহলে শ্রীযুক্ত রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কেন পাঠকদের জানালেন না আমি তসলিমার প্রসঙ্গে আবার আমার বক্তব্য রেখেছি!

আমি জ্যোতিষী নই, রঞ্জনের মনে কী ছিল তা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। রঞ্জন খুব ভদ্র মানুষ, আমার সঙ্গে দেখা হলেই হেসে কথা বলেন। আমি লক্ষ্য করেছি 'সাদাকে সাদা কালোকে কালো' বলার ক্ষমতা তাঁর আছে। তাহলে যে বইটির তিনি সমালোচনা করেছেন তার পুরোটা কি ওঁর পড়া হয়নি! এটা আমি কল্পনা করতে পারি না। অন্তত উনি সেই শ্রেণীর মানুষ নন, যাঁরা না পড়ে সমালোচনা করেন। এক্ষেত্রে আমার বিশ্বাস, প্রকাশক যে বইটি সমালোচনার জন্যে পাঠিয়েছিলেন সেই বইটিতে তসলিমা সম্পর্কিত লেখার ছাপা পাতাগুলো ছিল না। হয়তো বাইন্ডার ওই ফর্মাটা বইতে জুড়তে ভুলে গিয়েছিলেন। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সময় সম্পাদক যে লেখিকার প্রসঙ্গে আমার মন্তব্য অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে প্রকাশ করেছিলেন টীকা-টিপ্পনি জুড়ে, সেটা যদি রঞ্জন বইতে না পান, তো কী করে তার উল্লেখ করবেন?

গত কুড়ি বছর ধরে আমি আমার প্রকাশকদের অনুরোধ করে এসেছি যে তাঁরা যেন আমার লেখা কোনো বই সমালোচনার জন্যে কোনো পত্রিকায় না পাঠান। তবু মাঝে মাঝে দেখি আমার বই-এর দায়সারা সমালোচনা ছাপা হচ্ছে। রঞ্জন অবশ্য অনেকটা জায়গা আমাকে দিয়েছেন।

প্রশ্ন আসতে পারে, নিজের লেখার সমালোচনা দেখতে আমি কেন ভয় পাই? আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি কেউ দেখিয়ে দিলে কেন সহ্য করতে পারি না? মুশকিল হল, কেউ তো সেই কাজটা করেন না। কুড়ি বছর আগে আমি 'উত্তরাধিকার' লিখেছিলাম। একটি বিখ্যাত কাগজে সমালোচক লিখলেন, নবীন লেখক সমরেশ মজুমদার বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র অনুসরণে নিজের বাল্যকালের অভিজ্ঞতা লিখেছেন ওই উপন্যাসে। অপুর আদলে হরি চরিত্রটি গড়েছেন। পুরোটাই কাঁচা হাতের অসফল লেখা। 'উত্তরাধিকার' 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়েছিল। কুড়ি বছরে পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। এখনও বছরে দু'হাজার কপি বিক্রি হয়। তাহলে যেসব পাঠক বইটি কেনেন, তাঁরা মূর্খ? কিছু অন্তঃসারহীন বই হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে প্রচুর বিক্রি হয়, কিন্তু বছর পাঁচেক বাদে তাদের হদিশ পাওয়া যায় না। সেসব লেখকরাও হারিয়ে যান। কিন্তু কুড়ি বছর তো অল্প সময় নয়। আমার ট্রিলজির প্রথম বই 'উত্তরাধিকার' সম্পর্কে সেই একই সমালোচক গত বছর যে মন্তব্য কাগজে-কলমে করেছেন তা আরও চমকপ্রদ। তিনি লিখেছেন বাংলা সাহিত্যের

প্রথম পঞ্চাশটি উপন্যাসের মধ্যে 'উত্তরাধিকার' অবশ্যই থাকবে। ভাবুন ব্যাপারটা। আমার সৌভাগ্য, পাঠকরা কুড়ি বছর আগে ওঁর সমালোচনা পড়ে মুখ ফিরিয়ে নেননি। নিলে কী অবস্থা হত? তাই আমি চাই না, কাগজে আমার বই-এর কোনো সমালোচনা বের হোক।

ধরুন, 'দেশ' পত্রিকায় (উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলছি) সুনীল গাঙ্গুলির কোনো বই-এর সমালোচনা লিখতে দেওয়া হল কাউকে। উপন্যাসটি ওঁর চাপে পড়ে লেখা, পড়তে ভালো লাগে, 'আত্মপ্রকাশ' 'আমিই সে', 'সেই সময়'-এর সমগোত্রীয় নয়। সমালোচকের যদি উপন্যাসটি পড়ে খারাপ লাগে তবু তিনি সেকথা লিখতে পারবেন না কারণ সুনীল গাঙ্গুলি 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সুনীলদার কথা ছেড়ে দিন, হর্ষ দত্ত বা আবুল বাশারের বই-এর কঠোর সমালোচনা 'দেশ' পত্রিকায় লিখতে পারছেন না কেউ। এমন নয়, হর্ষ বা বাশার ওঁদের নিষেধ করেছেন; এ ব্যাপারে ওঁরা কোনো প্রভাব খাটাবার কথা ভাবতেই পারেন না। কিন্তু সমালোচকের আঙুল আড়ষ্ট হয়। খারাপ লিখলে যদি ভবিষ্যতে আর সমালোচনার দায়িত্ব তাঁকে না দেওয়া হয়! এই লোকটির হাতে আমার বই যদি পড়ে তাহলে ওঁর প্রতি আস্থা কি রাখা সম্ভব? এটা শুধু 'দেশ' পত্রিকা নয়, যে-কোনো পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো ঔপন্যাসিকের বই-এর বিরূপ আলোচনা কেউ করতে পারবেন না, যদি সেই কাগজে লেখার ব্যাপারে মোহ থাকে।

আচ্ছা, কারা সমালোচনা করেন? যাঁরা করেন তাঁরা শব্দটার কথা ভাবেন? সমালোচনা মানে সমান আলোচনা। অর্থাৎ সমালোচককে হতে হবে নিরপেক্ষ। ভালো এবং মন্দ দুটোই সমানভাবে বলতে হবে। এখন যদি মন্দই সবটা হয়, কী দরকার তাকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার? উপেক্ষা করলেই তো হয়।

লক্ষ্য করছি, গত পঁচিশ বছরে প্রত্যেক পত্রিকায় একটা চক্র তৈরি হয়েছে। এই চক্রগুলো আলাদা আলাদা, কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারে তাঁদের খুব মিল আছে। এই চক্রের সমালোচকদের বেশিরভাগই অধ্যাপনা করে থাকেন। যেন অধ্যাপক মাত্রই ভালো বোঝেন। সমালোচনা করে বিখ্যাত হতে চান তাঁরা। যেন তিনি ভালো না বললে কোনো লেখক ভালো হবেন না। লক্ষ্য করবেন, এঁরা সেইসব লেখককে খোঁজেন যাঁদের ভালো বললে কোনো কৈফিয়ত দিতে হয় না। সেই কারণে এঁরা কমলকুমার, অমিয়ভূষণ মজুমদার সম্পর্কে লিখতে গিয়ে শব্দ খুঁজে পান না। দেবেশ রায় বা মহাশ্বেতা দেবী সম্পর্কে শব্দ প্রয়োগ করার সময় বেশ সতর্ক থাকেন। পরবর্তী পর্যায়ে এঁরা নবারুণ ভট্টাচার্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তেমন সাফল্য পাননি।

আশাপূর্ণা দেবী যখন বেঁচেছিলেন এইসব সমালোচক তাঁকে উপেক্ষা করেছেন। প্রচুর লেখেন মহিলা। মেয়েলি সেসব লেখালেখি নেহাতই গপ্পো, এইরকম মনোভাব ছিল। যেই তিনি 'জ্ঞানপীঠ' পেয়ে গেলেন অমনি তাঁদের গলা শুকিয়ে গেল। তাঁরা থুতু গিলতে লাগলেন। এবং এও লক্ষ্য করেছি, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সমীহ করে কথাবার্তা বলা হচ্ছে। বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের কাছাকাছি পৌঁছে দিতে পারলে দায় চুকে যায়।

সমালোচকদের রাগ সেইসব লেখকদের ওপর, যাঁদের বই বেশি বিক্রি হয়। যেন বেশি বিক্রি মানে ওই বই মনোরঞ্জনের জন্যে, সাহিত্যমূল্য শূন্য। এরকম লেখকের বই হাতে পেলে তুমুল গালাগালি দিয়ে ওঁদের যেন যৌনতৃপ্তি হয়। যে বই গত পঁচিশ পঞ্চাশ বছর ধরে সমান জনপ্রিয় তার লেখক তো অনেকগুলো প্রজন্মকে খুশি করেছেন। এটা কম কথা? আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এইসব সমালোচকদের প্রাথমিক বাসনা ছিল গল্প-উপন্যাস লেখার। অনেকেই লিখেছেন, বই হয়ে বেরিয়েছে সেগুলো। কিন্তু দান করেও শেষ করতে পারেননি তাঁরা। নিজেদের অক্ষমতা তাঁদের কষ্ট দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে অন্যের সাফল্য তাঁদের ঈর্ষান্বিত করেছে। এঁরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হতে চেয়েছিলেন, কারণ ওই মানুষটি অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক হিসেবে সমান সম্মান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মাস্টারমশাই-এর ক্ষমতার একাংশ এঁদের না থাকায় এঁরা ছিদ্র সন্ধানে নেমে

গেলেন। অধ্যাপনা তাঁদের বড় পত্রিকায় পৌঁছানোর সুযোগ করে দিল। সমালোচক হিসাবে খ্যাতি বাড়তে লাগল উন্নাসিকতার কারণে। সাগরময় ঘোষ একবার বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বই-এর নামটা মুছে দিয়ে ওঁকে দিলে কী ভয়ংকর কাণ্ড হবে ভাবো তো?

শেষ কথা কে বলবে? পাঠক, যিনি পয়সা দিয়ে বই কেনেন, নাকি সমালোচক, যিনি বিনা পয়সায় বই পেয়ে একপাতা লিখে কাগজ থেকে টাকা পান? একহাঁড়ি মিষ্টির সঙ্গে নিজের সদ্য প্রকাশিত বই সমালোচকের বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসলে শেষ কথা বলার মালিক বলে নিজেকে যিনি মনে করেন, তিনি দুটো লাইন লিখে দেবেন; দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

কিন্তু যাঁরা বই কেনেন, তাঁরা সমালোচনা পড়েন না। পড়লেও এখন আর প্রভাবিত হন না। এটুকুই স্বস্তির।

নভেম্বর ২০০০

তুমি তো জানো না কিছু

ছেলেবেলাটা কেটেছিল জলপাইগুড়িতে। লিখতে গিয়েই খেয়াল হল, সেই ছেলেবেলা কি আমার কেটেছে? অনেকেরই কাটে না। ছেলেবেলায় যাকে ছেলেমানুষি বলা হয়, তা অনেকেই পরিণত বয়সে করে যান। নিজের অজান্তেই করে থাকেন। মাঝে মাঝে বিব্রত হলেও ভাবি, মন্দ কি!

আমি প্রথম প্রেমপত্র লিখেছিলাম চৌদ্দ বছর নয় মাস বয়সে। তখন বাংলা সাহিত্য গোগ্রাসে গিলছি। 'শেষের কবিতা' মুখস্থ। 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ীকে দিনের বেলায় স্বপ্নে দেখছি। সন্ধ্যা মুখার্জীর 'হয়তো কিছুই নাহি পাবো' পাঁজরায় এঁটে বসেছে। এখন কোনো চৌদ্দ-প্লাস ছেলের দিকে তাকালে কীরকম নির্বোধ বলে মনে হয়। সে খুব দুর্ভাগা, 'শেষের কবিতা' পড়ে লাইন মুখস্থ করেনি।

কিন্তু ওই সময় আমি কোনো প্রেমিকাকে পাইনি। হাফপ্যান্ট পরা, দাদুর শাসনে থাকা কোনো কিশোরকে সম্মান দিতে চায়নি জলপাইগুড়ির কিশোরীরা। অথচ আমার সহপাঠী গোবিন্দকে দিত। প্রেমের ব্যাপারে অসম্ভব করিতকর্মা ছিল সে। প্রথম প্রেমপত্র পেয়েই চলে এসেছিল সে। অনুরোধ করেছিল উত্তরটা লিখে দিতে। প্রথমত, তার হাতের লেখা খুব খারাপ। দ্বিতীয়ত, ভাষাটাষা একদম আসে না। এখনও মনে আছে, সেই চিঠির সম্বোধন ছিল এইরকম, 'ওগো আমার প্রাণ পাপিয়া'। এই বয়সেই কথাগুলো পছন্দ হয়নি, কীরকম গ্রাম্য-গ্রাম্য মনে হয়েছিল। গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তোর প্রেমিকাকে কীরকম দেখতে? সে উদ্ভাসিত মুখে বলেছিল, নার্গিসের মতো।

দিনরাত ভেবে ভেবে দাদুর নজর এড়িয়ে উত্তরটা লিখেছিলাম। স্বপন নায়কের মতো সেটা পৌঁছে দিয়েছিল বাড়ির কাজের মেয়ে মারফত। সেই চিঠির জবাব আসেনি। কিন্তু পরের সপ্তাহে গোবিন্দ নিয়ে এল আর একটি মেয়ের চিঠি। সে লিখেছে—আমার গবু। এই চিঠির উত্তর আমি লিখতে চাইনি। কেবলই মনে হচ্ছিল, দ্বিতীয় চিঠির উত্তর লিখলে প্রথম চিঠির মেয়েটিকে অসম্মান করা হবে। হেসে গোবিন্দ বলেছিল, 'ভ্যাট! তুই প্রেম করছিস না আমি? তুই ভেবে নে গল্প লিখছিস। যেমন করে লেখকরা লেখে।'

বিধাতার মনের বাসনা কী ছিল জানি না। একটি মেয়ে, যাকে আমি চোখে দেখিনি বা দূর থেকে জানলায় দু-একবার দেখেছি, তার উদ্দেশ্যে প্রেমপত্র লিখতে হয়েছে আমাকে। এইরকম লেখালেখিতে মনে জোর হল। ভালো ভালো লাইন চিঠিতে জুড়ে দেব বলে প্রচুর বই পড়তে হত। উদগ্রীব হয়ে থাকতাম চিঠির উত্তরে কী লিখছে তা পড়ার জন্য। যে লিখছে সে আমাকে জানে না। অনেক পরে জীবনানন্দ পড়তে গিয়ে আবিষ্কার করলাম—'তুমি তো জানো না কিছু, না জানিলে,—তবুও আমার সকল গান তোমারে লক্ষ্য করে'।

এখন ভাবি, একদা পাঠক, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, তিনি আমার লেখা পড়বেন

বলে আমি লিখছি, এই কাণ্ডটি শুরু হয়েছিল সেই বয়স থেকেই। গোবিন্দর কাছে এই কারণে আমি কৃতজ্ঞ।

এই বছর আনন্দবাজারের শারদীয়ায় একটি উপন্যাস লিখেছিলাম। তার বিষয় ছিল তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বিচ্ছিন্ন, যোগাযোগ না-থাকা চার বন্ধু হঠাৎ একত্রিত হয়ে তাদের কৈশোরের শহরে তিনরাত কাটাতে গেছে। সেখানে গিয়ে স্মৃতিতে তাদের কৈশোরের নায়িকারাও ছিল, যাদের সঙ্গে কখনও কথা বলার সুযোগ ঘটেনি। পঁয়ত্রিশ বছর পরে তাদের এই শহরে থাকার কথাও নয়, লিখতে বেশ ভালো লেগেছিল।

সেদিন একটি মেয়ে ফোন করে দেখা করতে চাইল। আসতে বললাম। এল। বেশ মিষ্টি দেখতে। বছর চব্বিশের সুন্দরী। আমার লেখা তার ভালো লাগে বলে দেখা করতে এসেছে। কথায় কথায় বলল, 'আপনি যখন জলপাইগুড়ির পটভূমিকায় লেখেন তখন আমার খুব ভালো লাগে।'

বললাম, 'সেকী! ওটা তো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। তুমি জলপাইগুড়িতে গিয়েছ?'

'না। সুযোগ পাইনি। আপনার এই লেখা পড়ে ঠিক করেছি বড়দিনের সময় যাবই।' মেয়েটি হাসল। সেখানে গেলে কোথায় উঠবে, জানতে চাইলে, যা জানি বললাম। যাওয়ার আগে সে ব্যাগ থেকে একটি ছবি বের করল। বেশ পুরনো, একটু বিবর্ণ হয়েছে। দুই বিনুনি ঝুলিয়ে এক কিশোরী লজ্জা-লজ্জা চোখে তাকাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কার ছবি?'

'বলুন তো কার?' সে হাসল।

'তোমার ছবি তো হতেই পারে না।'

'কেন পারে না?'

'এই ছবির বয়স তোমার থেকে অনেক বেশি।'

'এই মেয়েকে আপনি কোথাও দ্যাখেননি?'

'বিশ্বাস করো, মনে করতে পারছি না।'

'জলপাইগুড়ির মেয়ে।'

'তাই?'

'আপনি যখন ক্লাস টেনে পড়তেন, এ তখন এইটে পড়ত।'

'আচ্ছা?'

'এর বাড়ি ছিল আদরপাড়ায়। আপনাদের সাইকেল এর বাড়ির সামনে এলেই স্লো হয়ে যেত আর বেল বাজত।'

তবু আমি মনে করতে পারছিলাম না, আদরপাড়ায় কে কে খুব সুন্দরী ছিল। সেভেন-এইট-নাইনের সুন্দরী? স্মিতা? অনিতা? এই দু'জনের কেউ?

'আপনার এক বন্ধুর নাম গোবিন্দ, তাই না?'

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। আমি অর্জুন হতে চাই, এইরকম একটা লাইন লিখেছিলাম গোবিন্দর হয়ে। সেই মেয়েটির নাম ছিল চিত্রাঙ্গদা। আদরপাড়ায় বাড়ি। যেহেতু তাকে গোবিন্দ প্রেমপত্র আমাকে দিয়ে লিখিয়ে পাঠাত, তাই ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের দরজা-জানলার দিকে তাকানোর অধিকার ছিল না। আমরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে বেল বাজাতাম। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা প্রেমপত্রের কোনো জবাব দেয়নি, তাই দ্বিতীয় চিঠির শেষে লিখেছিলাম, 'ভালো থেকো, হে বন্ধু বিদায়'।

'তুমি একে চিনলে কী করে?'

'আরও প্রশ্ন করুন,—এত কথা জানলে কী করে?'

'তা তো বটেই।'

'আপনি চিনেছেন?'

'চিত্রাঙ্গদা, তাই না?' আমি তখনও ধোঁয়াশায়।

'হ্যাঁ। এই তিনি আমার মা।'

'সর্বনাশ।'

'সর্বনাশ কেন?'

'তোমার মাকে কখনও ভালো করে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তখন তো এই ছবির বয় থাকার কথা। কিন্তু তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছ।'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, ছবিটি ব্যাগে পুরল। তারপর বলল, 'আপনারা কিন্তু মাকে বোকা বানা পারেননি।'

'কীরকম?'

'গোবিন্দ নামের ছেলেটিকে মা একদম পছন্দ করত না।'

'ও!'

'গোবিন্দর বোন মায়ের সঙ্গে পড়ত। তাকে দিয়ে গোবিন্দর হাতের লেখা আনিয়েছিল মায়ের সন্দেহ হয়েছিল, গোবিন্দর মতো ছেলে নাকি অমন চিঠি লিখতেই পারে না। হাতের লে মিলিয়ে মা নিঃসন্দেহ হয়েছিল, তার ধারণাই ঠিক। তাই উত্তর দেয়নি।'

'তোমার মা কি জানত—গোবিন্দর হয়ে কে চিঠি লিখেছিল?'

'না। তখন তো সেটা জানার কোনো উপায় ছিল না!'

'উনি এখন কেমন আছেন?'

'ভালো। এখন মা শাশুড়ি। দাদার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার বাবাও খুব ভালো।'

আমি হঠাৎ স্বস্তি পেলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলল, 'মা আপনার সব বই পড়ে তখনও না পারলেও এখন কিন্তু উনি জানেন, কে দুটো চিঠি লিখেছিল।'

আমাকে এলোমেলো করে দিয়ে মেয়েটি চলে গেল।

ডিসেম্বর ২০০০

যদি অতিক্রম করেন কোনো লেখক, তাহলে তাঁকে আর কোন যুক্তিতে পেছনে ফেলা যাবে?

এখন এই মুহূর্তে মাত্র তিনজন লেখকের বই পেতে যে-কোনো প্রকাশক উদ্‌গ্রীব হবেন। সুনীলদা, বুদ্ধদেবদা এবং শীর্ষেন্দুদা। প্রায় তিরিশ থেকে চৌত্রিশ বছর ধরে এঁরা সমান জনপ্রিয়। ঢাকায় এঁদের বই এক ডজন প্রকাশক একসঙ্গে পাইরেসি করে। এখানকার অনেক লেখকদের সেই ভয় নেই। তাদের বই পাইরেসি না। কুমারীত্ব বজায় থাকে।

সেদিন একজন মহিলা এসেছিলেন প্রকাশকের কাছে। সম্ভবত হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে। তাঁর বাবার একটি বই যাতে প্রকাশক ছাপেন, যা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, তার অনুরোধ নিয়ে। এটা আমাদের লজ্জা। আমার মেয়ে যেন কখনও এই প্রস্তাব নিয়ে কোনো প্রকাশকের কাছে না যায়।

পুনশ্চ ।। এই লেখাটি পত্রিকার দপ্তরে পাঠানোর আগে আমার এক বন্ধু পড়ে বললেন, 'বিনয় করেছেন খুব। ওই তিনজনের সঙ্গে নিজের নাম লেখেননি কেন? এটা নিছক রাবড়ি বদমায়েশি।'

কী বলি! বন্ধু জানেন না, প্রকাশকরা ইদানীং বই বিক্রির যে স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন তা যে ভীতিপ্রদ!!

জানুয়ারি ২০০১

আমরা কিছুই ফেলে দিতে পারি না। মুদির দোকান থেকে জিনিসপত্র দেওয়া হয় যে পলিথি প্যাকেটে, সেটা যত্ন করে রেখে দিই কাজে লাগাব বলে। এই যে কথাটা, 'জীবনের ধন কি যাবে না ফেলা', আমরা চমৎকার আঁকড়ে ধরেছি। ফলে আমাদের আবাস ভরে উঠছে আবর্জ অতএব বই ফেলে দেব, এ কখনও হয়?

আমার মফস্‌সল শহরে তো বটেই, এই কলকাতায় এসে বহুকাল পরে শুনেছিলাম বিদে স্টেশন থেকে ট্রেনে সময় কাটানোর জন্যে থ্রিলার কেনেন। ট্রেনে পড়ে, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে ও বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে যান। তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মের জীবনে ওই বইটির কোনো প্রয়ে নেই। ভেবে পাচ্ছিলাম না এত নির্লিপ্ত ওঁরা কী করে হলেন। তারপর থেকে ফ্রি স্কুল স্ট্রি ফুটপাতে থ্রিলার কিনতে গেলেই মনে হত এই বইটা নিশ্চয়ই ইউরোপ আমেরিকার কোনো সেঁ ফেলে যাওয়া বই। কুড়িয়ে নিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে কেউ তৃতীয় বিশ্বের দেশে ব্যবসা করতে। এই বাতিল বইগুলো কিনে নিয়ে আমরা আমাদের বই-এর আলমারি বোঝাই করছি।

শুধু থ্রিলার কেন, যে বই পড়ে পছন্দ হয় না, সেগুলোকে পাশ্চাত্যের শিক্ষিত পাঠকরা বা রাখেন না। পরিচিতি পাওয়ার পর আমাকে অনেকেই তাঁদের সযত্নে লেখা একমাত্র বই উ দেন। বেশ কাব্য করে তাতে আমার উদ্দেশ্যে দু'কলম লেখেন, অভিমত চান। বাংলাদেশে তো প্রতিবারে গোটা পঞ্চাশেক বই হাত পেতে নিতে হয়। আর এসব বই-এর লেখকদের যথেষ্ট সহানুভূতি সত্ত্বেও দেখেছি, গোটা দুই বই পড়তে ভালো লাগে। একটাকে রাখা যায়। প্রথম আমি পাড়ার লাইব্রেরিতে ওই বইগুলো দিয়ে দিতাম। এখন তারাও নিতে চায় না। পাঠকরা কয়েক পাতা পড়ে ওই বইগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যান।

আমি উন্নাসিক নই। কিন্তু আমারও মনে হয়, কলেজস্ট্রিট থেকে প্রতি বছর যত বই বে তার পঁচানব্বই ভাগ বাড়িতে রাখা যায় না। এর মধ্যে আমার বইও আছে। যে সব আঁতেল উপন্যাস বলতে নাক কোঁচকানো অথবা আমাদের শ্রদ্ধেয় সমালোচকরা যে দু'চারজনকে নিয়ে তোল্লা দেন আর বাকিদের শূকরছানা বলেন, তাঁদের মতের সঙ্গে না মিলেও বলছি, বাজে বই-এর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ছাপার খরচ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাড়ছে। কারণ প্র লেখক লেখার সময় মনে করেন, তাঁর ভেতর প্রতিভা টগবগ করছে। পাঠক, যাঁরা টাকা বই কেনেন, তাঁরা কিন্তু খুব সহজেই নীলবর্ণ শেয়ালদের ধরে ফেলেন।

লক্ষ্য করবেন, কোনো কোনো লেখক গত পঁয়ত্রিশ-ত্রিশ বছর ধরে 'দেশ' 'আনন্দবাজার' ই কাগজে গল্প লিখে যাচ্ছেন। চেষ্টা করে তাঁদের দু-চারটে বইও বাজারে করতে পেরেছিলেন। পাঠকরা এতদিন লেখা সত্ত্বেও তাঁদের নাম জানেন না। বই বিক্রি স্বাভাবিকভাবেই হয় না। এ তরুণ প্রকাশক নতুন প্রকাশনা খুলে আমার কাছে এসেছিলেন বই-এর আশায়। জিজ্ঞাসা করো কী বই ছেপেছেন? প্রথমে বলতে চাইছিলেন না, তারপর ওই দীর্ঘকাল ধরে গল্প লিখে

একজনের বই দেখালেন। জিজ্ঞাসা করলাম, কত বিক্রি হয়েছে? তিনি বললেন, আটাশ কপি, দশ মাসে। কেন ছাপলেন? বললেন, 'ওঁর নাম ছোটবেলা থেকে মাঝেমাঝে কাগজে দেখে এসেছি। ভাবলাম বই ছাপলে বিক্রি হবে। ওঁকে অ্যাডভান্স টাকা দিলাম, কাগজে বিজ্ঞাপনও দিলাম। কিন্তু এখন বাইন্ডার তাগাদা দিচ্ছে ফর্মা নিয়ে যেতে।'

এই লেখককে প্রায়ই টিভিতে, বাংলা একাডেমিতে বক্তৃতা করতে দেখি। বাংলা সাহিত্য নিয়ে কথা বলেন গম্ভীর মুখে।

আমার কৈশোর কেটেছিল জলপাইগুড়ির বাযুপাড়া লাইব্রেরির অভিভাবকত্বে। এখনও মনে আছে, বরেন বসুর 'রঙরুট' আর অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস' পড়ার পর ওই বয়সেই উত্তেজিত হয়েছিলাম। কেবলই মনে হয়েছে, ওই বই দুটো যদি আমার টেবিলে থাকত তাহলে ঘুমাতে যাওয়ার আগে রোজ একবার দেখে নিতে পারতাম। তখন হাতখরচের টাকা জমিয়ে 'পথের পাঁচালী', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' কিনে ফেলেছি। 'সাহেব বিবি গোলাম', 'নীলাঙ্গুরীয়', 'দেশে বিদেশে', 'দেবযান' কেনার বাসনা আছে। কিন্তু জলপাইগুড়ির কোনো দোকানে 'রঙরুট' অথবা 'তিতাস একটি নদীর নাম' নেই। শেষপর্যন্ত ঠিক করলাম বইদুটো চুরি করব। চুরি করে তার যা দাম তা লাইব্রেরির বাক্সে ফেলে দেব। সেই টাকা দিয়ে ওঁরা আবার কলকাতা থেকে বই আনিয়ে নেবেন। এই চুরির জন্যে কত উত্তেজনা নিয়ে দিনের পর দিন লাইব্রেরিতে গিয়েছি। বইতে হাতও দিয়েছি, কিন্তু তখনই লাইব্রেরিয়ান সুনীলদার চোখ আমার ওপর পড়ায় হাত সরিয়ে নিতে হয়েছে। কলকাতায় পড়তে এসে দোকানে খোঁজ নিয়ে শুনেছি বইদুটো আউট অফ প্রিন্ট। বছরখানেক আগে একটি সাহিত্যসভায় আমন্ত্রিত হয়ে গৌহাটিতে গিয়ে যে বাড়িতে উঠেছিলাম তার বই-এর আলমারিতে বইদুটোকে দেখতে পেয়ে রোমাঞ্চিত হলাম। চুরি করতে ইচ্ছে না হওয়ায় গৃহকর্তাকে অভিলাষ জানালাম। তিনি বললেন, 'আপনাকে 'না' বলতে খারাপ লাগছে। কিন্তু বইদুটি আমার স্ত্রীর দেওয়া উপহার। প্রথম দুই বিবাহবার্ষিকীতে। তিনি আজ নেই। খুলে দেখুন, কী লিখেছিলেন।'

দেখলাম। মহিলা লিখেছেন, 'এম.এ. পাশ-করা একটি অশিক্ষিত বঙ্গসন্তানকে মনে করিয়ে দিতে যে তাঁর মাতৃভাষায় এমন বই লেখা হয়েছে।'

এরপরে নেওয়া যায় না। এখন কলকাতায় 'তিতাস' পাওয়া যাচ্ছে। 'রঙরুট' কেউ ছেপেছেন কি না জানি না।

বইমেলা আসছে। অজস্র বই-এর প্রদর্শনী চলবে ময়দানে। লক্ষ লক্ষ মানুষ আসবেন। নেড়েচেড়ে সেইসব বই দেখবেন। কয়েকশো লেখক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবেন তাঁর বই পাঠকরা তুলে দেখছেন কি না, কিনছেন কি না।

মেলা শেষে দুরু দুরু বুকে প্রকাশকের কাছে যাবেন। ভালো খবরে মেজাজ খুশ হবে। কিন্তু অধিকাংশই গম্ভীর মুখে বেরিয়ে আসবেন পথে। মনে অভিযোগ ছোবল মারবে, প্রকাশক ঠিকঠাক প্রচার করেননি; স্টলের সামনের দিকে বইটিকে সাজিয়ে রাখা হয়নি।

আর তারপরে শেষ কথা, বাঙালি পাঠক বুঝল না তাঁকে। ভালো জিনিসের কদর কোনোকালেই যথাসময়ে হয় না। 'পথের পাঁচালী' ছবি তো তার উদাহরণ। পুরস্কৃত হওয়ার পর লাফিয়ে পড়েছে পাবলিক। তিনি ভুলে যেতে চাইবেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের প্রচুর ছবি বিদেশে পুরস্কৃত হচ্ছে প্রতিবছর কিন্তু একমাত্র নন্দনে প্রদর্শিত হয়েও তারা দর্শকদের দেখতে পায় না। নব্যেন্দু চ্যাটার্জী, ঋতুপর্ণ ঘোষ, গৌতম ঘোষের প্রতিভার কদর বাঙালি দর্শক দিতে শেখেনি। সাহিত্যে কমলকুমার মজুমদারের বইই বা কত বিক্রি হয়েছে?

এঁদের সান্ত্বনা এখানেই।

ফেব্রুয়ারি ২০০১

বিকৃত করিয়া

ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে কাতুমাসি আসতেন। ওঁকে আমার মা-ও ওই নামেই ডাব চা-বাগানের কেউ ওঁর অন্য নাম জানতেন না। ওঁর ছেলের নাম ছিল কার্তিক, অতএব তিনি কাতু ছেলের সংসারে কুটোটি নাড়তে হত না তাঁকে। কোনোমতে দুপুরের খাওয়া পর্যন্ত তিনি ব থাকতেন। তারপরই বেরিয়ে পড়তেন। এ-বাড়ি ও-বাড়ি। তখন ছেলেরা কাজে, মেয়ের খালি হওয়ায় জিরোবার কথা ভাবছে। কিন্তু কাতুমাসিকে দেখলেই সব আলস্য উধাও। কা একা কথা বলে যাবেন, শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবেন।

আমি ওঁর যে চেহারা মনে করতে পারছি তাতে মেদের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নেই। ছোট সেমিজ আর থানে মোড়া শরীর। মাথার চুলে কদমছাঁট। মাঝখানে বসে মাকে বলতেন গো সুন্দরী, একটা পান দাও, খয়ের ছাড়া। বিধবাদের খয়ের খেতে নেই।'

এক পিসি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন? খয়ের কি আমিষ?'

কাতুমাসি মাথা দোলালেন, 'যাও না, বিষ্টু ঘোষের বউকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো!'

মা পান সেজে হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার বউ আবার কী করল?'

কাতুমাসি পান মুখে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন, 'খয়ের খেয়ে মুখ লাল করেছে।'

এটা কীরকমের অপরাধ তা আমি বুঝতে পারিনি কিন্তু পিসি আমার দিকে তাকিয়ে পাকালেন, 'এ্যাই তুই এখানে কেন? যা এখান থেকে!'

অতএব চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। তখন আমার বয়স নয়, 'দস্যু মোহন' পড়ে ে লুকিয়ে লুকিয়ে। মোহন ও রমার প্রেম অস্পষ্ট বুঝছি। সেই রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি নিয়ে মা বাবাকে বললেন, 'শুনেছ পারুলের কাণ্ড?'

'কে পারুল?'

'ওঃ, বিষ্টু ঘোষের বউ পারুল।'

'কী করেছে সে?'

'অজয় মাস্টারের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল বাপের বাড়ি গিয়ে। অজয় ওর ছেলেকে ' রোজ বিকেলে যায়। তখন নাকি—ছি ছি।'

বাবা বলেছিলেন, 'শুনলে কোথায়?'

'কাতুমাসি বলছিলেন।'

'ওঃ! বুড়ি শকুন নাকি? আকাশে ঘুরে ভাগাড় খুঁজে বেড়ায়! যত্তসব।'

এই কাতুমাসিকে আমি জীবনভর নানান চেহারায় দেখে এসেছি। কাতুমাসি কখনও কার করতেন না। চর্চা করতেন। ঘটনাটি বলে চুপ করে যেতেন, মন্তব্য কখনও নয়। যারা শুনত করত তারা। অর্থাৎ পরচর্চা থেকেই পরনিন্দার জন্ম। পরচর্চা সবাই করতে পারেন না, নিন্দ ঝোঁক এসে যায়।

ছেলেবেলা থেকেই শুনতাম এক বাঙালি আর এক বাঙালিকে দেখলেই তৃতীয়জন যে অনুপস্থিত, তার মুন্ডু চিবোয়। অর্থাৎ পরদিন্দা করে। কিন্তু যদি একজন বলত, 'শুনেছো, অমুকের মেয়ে পড়াশোনায় কী ভালো হয়েছে, ছেলেদের দিকে ভুলেও তাকায় না, আহা,' তাহলে তো কথাগুলোকে পরনিন্দা বলা যাবে না, পরচর্চাই বলতে হবে। কিংবা শুধুই স্টেটমেন্ট, যা ঘটেছে তার বিবরণ দিতে ক'জন বাঙালি সক্ষম হন? সেই বিবরণে নিজস্ব ভাবনা ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় ঢুকতে ঢুকতে এমন চেহারা দাঁড়ায়, যার সঙ্গে মূল ঘটনার মিল খুবই সামান্য।

পরচর্চার চেহারাটা এখন পালটে গেছে। দুজন বিবাহিত পুরুষ আড্ডায় বসলে সচরাচর স্ত্রীর কথা তোলেন না। অথবা তাঁদের যে স্ত্রী আছে সেটা ভুলে যেতে চান। দুজন বিবাহিতা মহিলা একত্রিত হলে আগে স্বামীদের মুন্ডুপাত করা হত। কিন্তু এখন ভাবখানা এমন, স্বামীদের নিয়ে আলোচনা মানে সময় নষ্ট করা, তার চেয়ে দুজন চেনেন অথবা নাইবা চিনলেন এমন মেয়েকে নিয়ে কথা বলতে বড় সুখ, যদি তার জীবনযাপনে একটু কালো ছিটে থাকে।

ছেলেবেলায় একটি ছড়া প্রায়ই বন্ধুদের মুখে শুনতাম—'বিকৃত করিয়া মুখ, চুলকাইতে বড় সুখ'। পরচর্চা সম্পর্কে এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কিছু হতে পারে বলে মনে হয় না।

মানুষ কেন পরচর্চায় মজে যেতে ভালোবাসে? বাংলায় পরচর্চা আর পরনিন্দার পার্থক্যটা তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। আর পাচ্ছে না, তার কারণ হল এটা যাঁদের ভালোবাসার বিষয় তাঁরা হীনম্মন্যতায় ভোগেন। আমি পারছি না অথচ ও পারছে, এ থেকে একটা জ্বালা তৈরি হয়। আমি থোড়-বড়ির জীবন কাটাচ্ছি। একঘেয়ে বউ, মোটাবুদ্ধির ছেলে নিয়ে সংসার করছি আর ও বউ-ছেলেকে সামলে আজ এই মেয়ে, কাল ওই মেয়ের সঙ্গে দিব্যি ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে! কেন করবে? এই প্রশ্নটা করার সাহস নেই। তাই আরও রসিয়ে কেচ্ছার গল্প বলে লোকটাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে খুব ভালো লাগে।

আমি সংসার সামলাতে হিমসিম খাচ্ছি আর পাশের বাড়ির লোকটা একই মাইনে পেয়ে দু'হাতে টাকা ছড়াচ্ছে, এটা আমার সহ্য হওয়ার কথা নয়। ও যে চেয়ারে বসে, সেখানে অবিরত ঘুষের টাকা আসছে, আমারটা মরুভূমি। তাই ঘুষের বিরুদ্ধে আমি কথা বলতে গিয়ে ওর সম্পর্কে নানান কথা বানিয়ে বলতেই পারি।

কিংবা কোনো স্বার্থ নেই। আমি লিখছি। মাঝেমধ্যে কাগজে ছাপা হয় কিন্তু প্রকাশকরা এগিয়ে এসে বই ছাপেন না। নিজের পয়সায় ছাপিয়েছিলাম, পাঁচ কপি ভুল করে কিনে নিয়ে গিয়েছিল পাঁচটি বইমেলা থেকে। আমার তো মনেই হবে, বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার বুর্জোয়া লেখক। ফলে বুদ্ধদেববাবু কবে মাল খেয়ে কী কেচ্ছা করেছেন, সমরেশ মজুমদারকে শ্যামবাজারের ফুটপাতে উপুড় হয়ে মাঝরাতে শুয়ে থাকতে দেখা গেছে বললে কীরকম অপার্থিব আনন্দে মন ভরে যায়।

কথিত আছে, সুনীলদা পরচর্চা বা পরনিন্দা করেন না। এই ব্যাপারটা ওঁর ভক্তরা এমন পর্যায়ে প্রচার করেছে যে সবচেয়ে বড় অসুবিধে সুনীলদারই হয়। দৃশ্যটা কল্পনা করুন, প্রায় গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর প্রমুখ মহাজ্ঞানীদের মুখে অভিব্যক্তি একত্রিত করে সুনীলদা বসে আছেন এবং তাঁকে ঘিরে বসে স্তাবকরা বলে যাচ্ছে—'জানেন অমুক আপনার বিরুদ্ধে এই বলেছে, তমুক 'পত্রপাঠে' এই লিখেছিল, সম্পাদক তার অনেকটাই বাদ দিয়েছে যাতে গোলমাল না হয়, সোমুক মাল খেয়ে আপনাকে যাচ্ছেতাই বলেছে।' আর সুনীলদা সেই অভিব্যক্তি বজায় রেখে বলে চলেছেন, 'ছেড়ে দাও, অন্য কথা বলো।'

এবার অন্য কথা শুরু হলে স্তাবকবৃন্দ সুনীলদাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আলোচনা করবে, 'দেখলি কী বড় মন, কখনও কারও নিন্দা করেন না। এ না হলে এত উঁচুতে উঠতে পারে।' কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে সুনীলদার পয়সায় কেনা মদ পেটে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলবে, 'এটা ভান, বুঝলি। আমাদের

সামনে মুখ খুলল না। কিন্তু সব শুনে নিল। এবার অমুক তমুক এবং সোমুককে এ্যাইসা টাইট দেবে যে ওরাও বুঝতে পারবে না কে দিল!'

এই দু'মুখো মানুষদের সংখ্যা বড় বেশি।

কিন্তু যিনি কানপাতলা মানুষ, সমস্যা হয় তাঁকে নিয়ে। তাঁর কাছে পরচর্চা বা নিন্দা করতে গিয়ে ভক্তরা যদি ওই একই তথ্য জানায় তাহলে ক'দিন তাঁর মাথার ঠিক থাকে না। যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই মনের জ্বালা উগরে দিচ্ছেন। তাঁর যে শত্রু বৃদ্ধি করার জন্য স্তাবকদের এ চক্রান্ত, সেটা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করেন না।

পরচর্চা শব্দটি যখন খুব আরামদায়ক তখন নিজচর্চা শব্দটির কথা ভাবা যেতে পারে। এ মোটেই সুখকর নয়। কিন্তু যদি কেউ করতে পারেন তাহলে অন্তত তাঁকে নিয়ে পরচর্চা হবে না। আমাদের দেশে নিজেকে নিয়ে যে লেখা বের হয় তার নিরানব্বই ভাগ বেশ রেখেঢেকে বলা। আবার সম্প্রতি কেউ কেউ বেশি খোলাখুলি বলতে চেয়েছেন বাণিজ্য হবে ভেবে। সেখানে নিজেকে সতী সাজাবার একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা আছে। সেটা পাঠক বুঝতে পেরে পরচর্চা তাঁর ক্ষেত্রে চালিয়েই যায়। কিন্তু আমরা দুই বন্ধু এক বান্ধবীকে মাঝখানে বসিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছুটন্ত ট্যাক্সিতে তার দু'গালে দু'জন চুমু খেয়েছি বা সোনাগাছিতে গিয়েছি মদ খাওয়ার জায়গা না পেয়ে, বাংলা ভাষায় এমন লেখা কেউ লিখেছেন বলে জানি না। এটাই হল সত্যিকারের নিজচর্চা। নিজেকে নিয়ে বলতে গিয়ে কোনো লুকোছাপা করা হয়নি। নিজের সম্পর্কে কেউ যদি সব বলে দেন তাহলে তাঁকে নিয়ে পরচর্চা হলেও সেটা কীরকম আলুনি-আলুনি লাগে।

মার্চ ২০০১

নাটুকেপনা

বাঙালির জীবনে নাটক নেই। দুইনম্বরি কাজ বা কথা বলা, আর যাই হোক নাটক নয়। একবার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম আমরা। কলকাতার কয়েকজন লেখক প্রকাশক একসঙ্গে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম আমাদের বই-এর পাইরেট সংস্করণ যা ঢাকা থেকে বের হচ্ছে, তা বন্ধ করতে। জাল এবং আসল বই দেখেটেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'একটা কথা মানতেই হবে, বাঙালি সুন্দর নকল করতে পারে।' অর্থাৎ বাঙালি দু'নম্বরি কাজে সিদ্ধহস্ত। আমরা হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলাম।

আমার এক বন্ধু প্রচুর ইংরেজি উপন্যাস পড়ত, ছবি দেখত। পাশটাশ করার পর সে এক সুন্দরীর প্রেমে পড়ল। একটু নিভৃতে দেখা হতেই সে এক পা মুড়ে একটু নিচু হয়ে সৌজন্য প্রকাশ করতেই মেয়েটি লাফ দিয়ে সরে গেল, 'এম্মা একি করছেন, একি করছেন!' বন্ধুবর একটু ঘাবড়ে গিয়ে দু-চারটে নিরামিষ কথাবার্তা বলার পর বিদায় নেওয়ার সময় সুন্দরীর হাত তুলে ধরে ঠোঁট ছোঁয়াতে যেতেই সুন্দরী ফোঁস করে উঠল, 'ও, এই আপনার মতলব! প্রথমেই শরীরের দিকে চোখ পড়েছে আপনার? ছিঃ।'

হতাশ বন্ধুবর পরে আমাকে বলেছিল, 'আমি যে ওকে সম্মান জানাতে চেয়েছিলাম, তা ও বুঝল না কেন?'

অবশ্যই সেই সুন্দরী অন্যত্র বাসা খুঁজে নিয়েছিলেন।

এই যে বাঙালির বিয়ে, টোপর পরে বিয়ে করতে যাওয়া থেকে বউ নিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত তো সবকিছুই নাটকের মতো পরপর ঘটে থাকে। এই নাটকে বাপ-মাও অভিনয় করেছে, ছেলে, ছেলের বউও। সংলাপ এবং মন্ত্রও প্রায়ই এক। মেয়েরা চোখ ফোটার পর থেকেই এর-ওর বিয়ে দেখতে দেখতে দৃশ্যগুলোতে চমৎকার অভ্যস্ত হয়ে গেলেও সংকোচের ভান করে থাকে। সাতবছর প্রেমের পর মালাবদলের সময় মেয়েটি যে লজ্জায় মুখ তুলতে পারে না, সেটা কি নাটক? নাকি প্রেমিকের স্ত্রী হওয়ার পর পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় যে ডুকরে কান্না, সেটা সত্যি? আটদিন বাদে সেই মেয়ে যখন ফিরে আসে হাসতে হাসতে, তখন কান্নাটা কোথায় যায়? মুশকিল হল, এইসব দৃশ্য এতবার অভিনীত হয়ে গিয়েছে যে আর কোনো আকর্ষণ নেই। একটা নাটক যদি মঞ্চে বারবার দেখা যায় তাহলে যেমন জোলো হয়ে যায়।

আমি যা নই তা দেখানোর চেষ্টা কি নাটক করা? তাকে সাদা বাংলায় তো চালবাজি বলা হয়ে থাকে।

'তোমার জন্যে আমি হাজার মাইল হাঁটতে পারি।' ছেলেটি বলল।

মেয়েটি ঠোঁট বেঁকালো,—'ঢঙ'!

কয়েকদিন বাদে চব্বিশ ঘণ্টার হরতাল। গাড়ি চলছে না, পথ ফাঁকা। ছেলেটি থাকে বেলঘরিয়ায়,

মেয়েটি গড়িয়ায়। বিকেলবেলায় মেয়েটি জানলা দিয়ে দেখতে পেল ছেলেটি সামনের রাং দাঁড়িয়ে। মেয়েটি আঁতকে উঠল। দ্রুত নিচে নেমে জিজ্ঞেস করল, 'এলে কী করে?'

'এ তো কিছুই নয়, বেলঘরিয়া থেকে গড়িয়া। আমি তোমার জন্য হাজার মাইল হাঁটতে পা ছেলেটি গাঢ় গলায় বলল।

এরপর মেয়েটি আর 'ঢঙ' বলতে পারেনি। বিজয়ী ছেলেটি ফিরে গেল মাসির বাড়িতে, যেখ সে গতরাত কাটিয়েছিল। মেয়েটির বাড়ি থেকে তার মাসির বাড়ি দশ মিনিটের হাঁটাপথ, মে সে খবর জানে না। তাহলে এইটে কি নাটক?

এক ভদ্রমহিলা চমৎকার বলেছেন—'বিয়ের আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে ও আধঘণ্টা অ পৌঁছে ঘড়ি দেখত। গঙ্গার ধারে গড়ের মাঠে নিয়ে যেত। কত স্বপ্নের কথা বলত। রেস্টুরে খাওয়াত। বিয়ের পর সেসব কোথায় মিলিয়ে গেল। বললে বলে,—দূর, গড়ের মাঠে কেউ যা এখন কোথাও যাওয়ার জন্যে বাইরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে ও আধঘণ্টা পরে আসে। আমি আর হাতছাড়া হব না, এটা জেনে গেছে।'

বাঙালির জীবনে যদি নাটক কোথাও থাকে তাহলে এখানেই তার শুরু। দুজনের মানসিক ব্যব যত বাড়বে তত ভান করবে—কিছুই হয়নি। মহিলা প্রথমদিকে কান্নাকাটি করবেন, তারপর উদা হবেন। এবং এরপর মিথ্যে বলা শুরু হবে। এ ওকে মিথ্যে বলছে, ও একে। এই যে লুকোচু দুজনে জেনেও না-জানার ভান করে বসে আছে সন্তানের মুখ চেয়ে অথবা পরিবারের কাঠামোটা ঠিক রাখার জন্যে, এটাই তো নাটক।

কিন্তু নাটক আর নাটুকেপনা কি এক? নাটুকেপনার মধ্যে একটু ন্যাকামির ফোড়ন আছে। যে এক বন্ধু বাড়িতে এল। রাতটা থাকবে কোনো কারণে। সন্ধের পর গৃহস্বামী বলল, 'এসো দুইপাত্র খাওয়া যাক।' অতিথি বন্ধু আঁতকে উঠলেন,—'না না। ওসব আমার চলে না। তুমি খা বরং বউঠান, আমাকে এক কাপ চা দিন।' গৃহকর্ত্রী আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকাবেন; ভাবখ এমন, দেখেছ, তোমার থেকে কত ভালো!

পরদিন যখন অতিথি বিদায় নিলেন তখন গৃহকর্ত্রী হতবাক। দেখলেন অতিথির ঘর গোছা এমনকী অ্যাশট্রেটাও ধুয়েমুছে রেখে গেছেন অতিথি। সেটি স্বামীর নাকের ডগায় ধরে বললে 'দ্যাখো, দেখে শেখো। জীবনে তো নিজের বাড়ির অ্যাশট্রে পরিষ্কার করোনি।'

গৃহস্বামী নির্বাক। এই বন্ধু মেসে থাকেন। সেখানে গিয়ে তিনি ওর সঙ্গে মদ্যপান করেছে বন্ধুর ঘরে সিগারেট বোঝাই অ্যাশট্রে দেখে এসেছেন। কিন্তু কিছুই বলতে পারলেন না স্ত্রীকে বললেন, দেখা হওয়ার পর বললেন বন্ধুকে, 'কেন এই নাটুকেপনা?'

অতিথি বললেন, 'মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গেলে একটু নাটুকেপনা করতে হ বুঝলি!'

হ্যাঁ, এ অভিযোগ অনেক মহিলাই করেন—'জানেন, অন্য মেয়ে যখন ওর গাড়িতে ওঠে, দরজা খুলে দাঁড়ায় তাদের জন্যে, আর আমার বেলা হেঁড়ে গলায় বলে, উঠে পড়ো! অন্য মেয়ে হাতের রান্না নাকি অমৃত আর আমারটা—আপনাদের পুরুষ জাতটাকে দেখা হয়ে গেছে। এ নম্বরের বেইমান।'

বেইমান মানে দু'নম্বরি? সেই আগের জায়গায় ফিরে আসছি।

এক বন্ধু তার স্ত্রীকে বললেন, চলো, 'ক'দিন ছুটি আছে, বেড়িয়ে আসি।'

স্ত্রী উচ্ছ্বসিত, 'কোথায় যাবে গো? পুরী যাবে? জগন্নাথ দেখে আসি।'

'না না। এখান থেকে হাওড়ায় যাব। ট্রেন যা পাব, উঠে বসব। যে স্টেশন দেখে ভা লাগবে, নেমে পড়ব। যেখানে থাকার জায়গা পাব থাকব, যাকে বলে একেবারে আনপ্ল্যান্ড। তা থ্রিল হবে খুব।'

'না বাবা। ওভাবে আমি যেতে পারব না। কোথায় যাচ্ছি জানি না, রিজার্ভেশন না করে যাযাবরের মতো যেতে আমি পারব না।' বন্ধুপত্নী বলেছিল। অর্থাৎ তিনি নাটক চান না।

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে এসেছেন। এসেই পাড়ায় প্রাক্তন যেসব অবিবাহিত বন্ধু এখনও আছে তাদের ডেকে পাঠালেন একের পর এক। এরা সবাই তাঁর প্রেমপ্রার্থী ছিল একসময়ে, তিনি পাত্তা দেননি। তারা এলে চা-বিস্কুট খাইয়ে বকর বকর করে গেলেন—তাঁর স্বামী কত ভালো, মাটির মানুষ, কী যত্নে রেখেছেন—এইসব। এইসময় স্বামী তাঁকে ফেরত নিতে এসে এদের দেখলেন। কী কথা হয়েছে শোনেননি। এরা চলে যাওয়ার পর কৈফিয়ত তলব করলেন, 'এসব কী হচ্ছে?'

মুখ ঝাম্‌টে স্ত্রী বললেন, 'বেশ করেছি।'

হ্যাঁ, এটাও নাটক।

এক স্বামী নিয়েই তো মেয়েরা পাগল। এখন কলকাতায় তিন তিনটে স্বামীর ঘর করা মেয়ের দেখা অবশ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাদের জীবনে নিশ্চয়ই অনেক নাটক, যা সাধারণ মেয়েরা ভাবতে পারে না। তিন-তিনটে বিয়ে হওয়া মেয়ের দিকে একই সঙ্গে ঈর্ষা এবং অবহেলার চোখে তাকায় তারা। তা, এক ভদ্রলোকের কপালগুণে তিন মেয়ে এবং নয় জামাই। মেয়ের সঙ্গে ডিভোর্স হওয়ার পর জামাইদের সঙ্গে এঁর ভালো সম্পর্ক আছে। গোলমাল যা হওয়ার তা তো মেয়ের সঙ্গে হয়েছে, তাঁর সঙ্গে তো হয়নি। এক জামাইষষ্ঠীর দিনে তিনি নয় জামাইকে একসঙ্গে নেমন্তন্ন করলেন। তারা এল। হইহই করে দিনটা কেটেও গেল। সন্ধের মুখে, যাওয়ার সময় এলে, তিন মেয়ে বাপের কাছে আব্দার করল, ওরা রাতটা থেকে যাবে, শ্বশুরবাড়িতে যাবে না।

অবাক বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন রে?'

তিন মেয়েই বলল, 'আমি এখনকার স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাব আর বাকি দুজন একা একা ফিরবে, এটা ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে। বরং ওরা সবাই চলে যাক, আমি কাল একাই যাব। তখন আর কষ্ট হবে না। হাজার হোক ওই দুজন তো একসময় আমার স্বামী ছিল। আর কত দুঃখ সইবে?'

নাটুকেপনার এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আমার জানা নেই।

এপ্রিল ২০০১

রবীন্দ্র-অন

দৃশ্য : এক

সাগরদার কাছে গল্পটা শুনেছিলাম। সে সময় উঠতি এক দাড়িমুখো সমালোচক বেশ নাম করেছি পরিশীলিত ভাষায় গালাগালি করার জন্যে। চুল থেকে নখ পর্যন্ত তাঁর উন্নাসিকতা, বাংলা ভা কেউ লিখতে পারছেন না বলে রায় দিয়ে দিয়েছেন। তবু তাঁর পরিচিতি কফিহাউসের বাইরে ছড়ায় একদিন তাঁর সঙ্গে সাগরময় ঘোষের দেখা হয়ে গেল এয়ারপোর্টে। ভদ্রলোক নিজের দাড়ি আঙুল বুলিয়ে বললেন, 'আপনার কাগজে আমি লিখতে চাই।'

সাগরদা বললেন, 'বেশ তো!'

'কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে লিখব।'

শান্তিনিকেতনে মানুষ, রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য সাগরদা, তবু বললেন, 'বেশ তো!'

ভদ্রলোক অবাক হলেন। তাই লেখার উদ্দেশ্য নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, 'দেখুন, অন্যদের নি লিখলে ঠিক কিক্ হচ্ছে না। 'দেশ' পত্রিকা বড় কাগজ, ভালো প্ল্যাটফর্ম। আমি তাই ওই কাগ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখতে চাই, যা পাঠকরা হজম করতে পারবেন না।'

সাগরদা বলেছিলেন, 'বেশ তো। তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই; বলুন কতদিন? কবে যোগাযোগ করব?' ভদ্রলোক উৎসাহী হলেন।

'আমি যেদিন পৃথিবীতে থাকব না, সেদিন পর্যন্ত অনুগ্রহ করে অপেক্ষা করুন।'

দৃশ্য : দুই

একজন বিখ্যাত কবি লিখে ফেলেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথের বেশিরভাগ কবিতাকেই আর ক কবিতা বলে মনে হয় না। সঞ্চয়িতার অনেক কবিতাকেই স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যায়। তাঁর বক্তব্য পড়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকজন তরুণ কবি স্থির করলেন তাঁরা দু'হাজার দুই সালে সঞ্চয়িতা এডিট করে বাজারে ছাড়বেন। কাজ শুরু হওয়ার আগে তাঁর আলোচনা করতে গেলেন প্র কবির বাড়িতে। একটা গাইড লাইন চাই।

প্রবীণ কবি বললেন, 'দ্যাখো রবীন্দ্রনাথের কবিতার দিন শেষ, কিন্তু ওঁর গানগুলো বেঁচে থাব অনেককাল। আহা, কী গান সব!'

এক তরুণ কবি কিন্তু-কিন্তু করলেন, 'কিন্তু ওঁর গান তো বাণী নির্ভর।'

'বটেই তো বটেই তো!' মাথা নাড়লেন প্রবীণ।

'গীতাঞ্জলি আগে কবিতা হিসেবে লেখা হয়েছিল, পরে গান হয়েছে।'

'তাহলে গীতাঞ্জলি ইত্যাদিদের সংকলনে রাখব?'

'অবশ্যই।'
'পুনশ্চ-র কবিতাগুলো? কেউ কেউ বলছে 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাকে জয় মূলধন করেছে।'
'তো?'
'পুনশ্চ-র কবিতায় জীবনের গন্ধ আছে, মানে, অনেকেই বলে।'
'তো রেখে দাও।'
'বলাকা?'
'বাঃ, বলাকা-র তো দারুণ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।' প্রবীণ বললেন।
'তাহলে বলাকা রাখি?'
'বেশ, রেখে দাও।'
'অনু কবিতাগুলো? ওই যে, স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ...।'
'বেশ মজার, না? ইন্টারেস্টিং।'
'তাহলে রেখে দিই।'
'দাও'।

দিন সাতেক গবেষণার পর কবি-কমিটি রায় দিলেন, 'দু'হাজার দুই খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' নতুনভাবে সম্পাদিত হয়ে যখন প্রকাশিত হবে তখন তার নাম হবে 'কবিতা অমনিবাস'। একঘেয়ে মলাটের বদলে বিকাশ ভট্টাচার্য অথবা গণেশ পাইনকে দিয়ে গ্রন্থটির মলাট আঁকানো হবে। এছাড়া প্রতিটি কবিতার ভাবরূপ ফুটিয়ে তুলতে ওই দুই শিল্পীকে অনুরোধ করা হবে। ডিটিপি করলে কবিতা অমনিবাসের আয়তন অনেক কমে যাবে, ফলে দাম বাড়বে না।'

দৃশ্য : তিন

রবীন্দ্রসদন। আজ রবীন্দ্রনাথের লেখক জীবনের একশো তিরিশ বছর পূর্তি উৎসব। প্রেক্ষাগৃহ পরিপূর্ণ। বাইরেও মাইক দেওয়া হয়েছে। মঞ্চের বাঁদিকে বসে আছেন পঞ্চাশ, ষাট দশকের লেখক এবং কবিরা, যাঁরা একসময় আলোড়ন তুলেছিলেন, তরুণ তুরকি ছিলেন। এখন প্রায় জরাগ্রস্ত। ডানদিকে বসে আছেন সত্তর থেকে আজ পর্যন্ত নব্য তরুণ তুরকি কবিরা। মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ। বিয়ের আসরে বরের মতো মাথা নত করে আছেন।

অনুষ্ঠান শুরু হল। ঘোষক বললেন, 'আজকের এই সন্ধ্যায় একটি অভিনব অনুষ্ঠান হতে চলেছে। আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালি লেখকের লেখালেখি একশো তিরিশ বছর ধরে চলেনি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, লিখিয়ে নিচ্ছেন। উনিশশো একচল্লিশ পর্যন্ত তিনি লিখেছেন আর তারপর থেকে আমরা তাঁকে নিয়ে লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছি। প্রকারান্তরে সেটা তো তাঁরই লেখা।'

প্রথমেই গান। গাইতে আসছেন বিখ্যাত শিল্পী স্বপ্ননীল চক্রবর্তী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। মাইকেল জ্যাকসনের পোশাক পরা স্বপ্ননীল মাইকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বললেন, 'আপনার গানপাখিকে একটা খাঁচায় বন্দি করে রেখে গিয়েছিলেন, আগামী বছর সেই পাখি মুক্তি পাচ্ছে। তারই আনন্দে এই গান শুনুন!'

কান-ফাটানো বাজনা, মাইক-হাতে শরীর বেঁকিয়ে স্বপ্ননীল গাইতে লাগল, 'খরবায়ু বয় বেগে ...' ঢেউ লাগল প্রেক্ষাগৃহে, নাচতে শুরু করল সবাই, রবীন্দ্রসদনের বাইরে ট্রাফিক জ্যাম, মাইকে সেই গান শুনে। গান শেষ হলে পঞ্চাশ দশকের লেখকদের প্রতিনিধি উঠলেন,—'শালা, যা লিখতে চাই, তা-ই আপনি লিখে গেছেন? এই একচেটিয়া পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে খালাসিটোলায় বসে আবিষ্কার করলাম—বস্তিজীবন, অভাবী মানুষের সংগ্রামী জীবন এবং নরনারীর শরীরের চাহিদার নগ্নরূপ লেখার সাহস আর অভিজ্ঞতা আপনার ছিল না। আপনার সঙ্গে টক্কর দিতে সেগুলোই হাতিয়ার করেছিলাম।'

তরুণ কবি উঠলেন, 'পাবলিক ওঁর বই কিনত একসময়, আলমারি সাজাবে বলে। একি ত কথা! অত শাস্ত্রসম্মত লেখা কেউ আজকাল পড়ে না। আজ শেক্সপিয়ারের লেখা রিমেক হ ম্যাকবেথের কত নতুন ইন্টারপ্রিটেশন হয়েছে। আমি রবীন্দ্রনাথকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। আর বছর যাক, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো রিরাইট করব, যাতে তিনি কাল অতিক্রম করতে পা

প্রেক্ষাগৃহ হাততালিতে ফেটে পড়লে পরদা নামল। কুমোরটুলির এক শিল্পী হাত বাড়ালে 'ভাড়াটা দিন। ওই মূর্তি নিয়ে আর এক জায়গায় যেতে হবে, বায়না নিয়েছি।'

দৃশ্য : চার

রবীন্দ্রনাথের 'পূজা' পর্ব তো বটেই, 'শ্যামা' বা 'চিত্রাঙ্গদা'র গান হলেই কিছু মহিলাকে মুখে চোখ বন্ধ করে বসে মাথা দোলাতে দেখতাম। ইদানীং সংখ্যাটা কমেছে। এঁদের বয়স থেকে আশির কোঠায়। ওরকম অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় এঁদের পরনে সাধারণত গরদের থাকে, বেশ শুদ্ধ-শুদ্ধ ভাব। শান্তিনিকেতনে এঁদের একসময় যাতায়াত ছিল, অনেকে থেকে সেখানে বেশ কিছুকাল। কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যেও এসেছেন। এরকম একজনের আমার কিছু কথাবার্তা হয়েছিল।

প্রবীণা ॥ গুরুদেব? (নিশ্বাস ফেলে) ওঁর কথা আর কি বলব।
আমি ॥ তবু— !
প্রবীণা ॥ এই যে আমার এই কাঁধটা দেখছ, এখানে হাত না রেখে তিনি হাঁটতেই পার না। দেখা হলেই বলতেন, ওরে তোর কাঁধটা দে!
আমি ॥ সেকি! একথা তো আর একজন বিখ্যাত দেবী, যিনি রবীন্দ্রনাথের কাছের মানুষ ছি তাঁর মুখে শুনেছি।
প্রবীণা ॥ ছাই ছিলেন। বানিয়ে বানিয়ে বললেই হল! গুরুদেব যেখানে যেতেন সেখানেই ত মতো লেগে থাকত। অসভ্য মেয়েমানুষ!
আমি ॥ গুরুদেব আপনাকে কোনো উপহার দিয়েছেন?
প্রবীণা ॥ মানে? (হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলেন) ওই হিরের আংটি? ছা ছা ছা মিথ্যে কথা! শান্তিনিকেতনের জন্যে সর্বস্ব দিয়েছেন যিনি, তাঁর পক্ষে একটা মেয়েকে কি হিরের আংটি দেওয়া সম্ভব! তবে হ্যাঁ, আমি না, এখনও ওই আর জামা কাচিনি।
আমি ॥ কোন শাড়ি?
প্রবাণী ॥ ওই যে, গুরুদেব যখন আমার কাঁধে হাত রাখতেন, তখন যা পরে থাক আলমারিতে রেখে দিয়েছি। মাঝে মাঝে বের করে দেখি।
আমি ॥ বাঃ।
প্রবীণা ॥ আর একটা কথা, তোমাকেই বলছি, পাঁচকান করো না যেন—!
আমি ॥ কানাকানি করব না, এটুকু বলতে পারি!
প্রবীণা ॥ সেই থেকে আমার এই কাঁধে কাউকে হাত দিতে দিইনি। এমনকী যাঁর সঙ্গে ত বিয়ে হয়েছিল, তাঁকেও নয়।

মে ২০০১

নামগান

লেখালেখি শুরু করে প্রতিষ্ঠা পেতে একজন লেখকের কত সময় লাগে? একজন শিল্পী ছবি এঁকে বিখ্যাত হন কতদিনের সাধনায়? প্রথম লেখায় বিখ্যাত হয়ে যাওয়া লেখকের সংখ্যা কত? এবং বিখ্যাত হয়ে যাওয়া সেই লেখক কতদিন টিকে থাকেন?

এইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা জানি। বলা হয়, লিখতে লিখতে লেখক। অর্থাৎ অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা এবং নিরন্তর নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা না থাকলে কেউ সফল লেখক হতে পারেন না। এই একই কথা অভিনয় বা সংগীতের ক্ষেত্রেও বলা যায়। উত্তমকুমার অভিনয় শুরু করার কতদিন পরে উত্তমকুমার হয়েছিলেন তা সবাই জানেন। 'পথিকে'র শম্ভু মিত্র এবং 'গ্যালিলির জীবনে'র শম্ভু মিত্রের মধ্যে কয়েক মাইলের ফারাক।

এই তথ্য আর খাটছে না সিনেমার ক্ষেত্রে। আগে মানা যেত। 'পথের পাঁচালী'র সত্যজিৎ আর 'চারুলতা'র সত্যজিৎ কি এক ব্যক্তি? কোনো উত্তরণ হয়নি? 'মহানগরে'র পরিচালক কি সে সময় 'আগন্তুকে'র কথা ভাবতে পারতেন? অথবা 'অরণ্যের দিনরাত্রি' তৈরির সময়ে 'শাখা প্রশাখা'? ওঁর ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি কী করে ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করেছেন। এবং এই কারণেই উনি বাংলা ছবির ইতিহাস থেকে কখনোই মুছে যাবেন না।

তথ্যটি খাটছে না গত পঁচিশ বছরে নব্য ভাবনার ছবি-করিয়েদের ব্যাপার-স্যাপার দেখে। সেই সত্যজিৎ, তপন সিংহ, অসিত সেন, তরুণ মজুমদারের বাংলা ছবির জগতে কিছু পরিচালক ছিলেন, যাঁরা মোটা গপ্পো ছবিতে বলতে ভালোবাসতেন। তারপরে কিছু পরিচালক এলেন যাঁরা যাত্রাধর্মী সিনেমা তৈরি করতে লাগলেন। আমরা বললাম, এঁরা বাংলা ছবির বারোটা বাজিয়ে দিল। তাতে অবশ্য এঁদের কোনো ক্ষতি হল না। প্রেক্ষাগৃহগুলোতে দর্শকের চেহারা বদলে গেল। নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষেরা বিনোদনের জন্যে প্রেক্ষাগৃহে যাচ্ছে হাসতে এবং কাঁদতে। তাদের সেটা করাতে বুদ্ধি খরচ করলে ছবি লাটে উঠবে। তাই ওইসব দর্শকদের জন্যই ছবি করতে হবে। করেও চলেছেন এঁরা। 'মায়াবিনী লেন' থেকে 'বংশধর' তারই নানামুখী প্রকাশ।

এঁদের নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই। বুক বাজিয়ে এঁরা বলবেন, আরে মশাই, আমরা ছবি করি বাঙালি দর্শকদের জন্য। প্রযোজক যে টাকা ঢালেন তা ফিরিয়ে দিই। অন্যের পয়সায় ফেস্টিভ্যালে যাই না, যে পয়সা দিচ্ছে তাকে মগে তুলে মই কেড়ে নিই না।

সেটাই বাংলা ছবির কাল হয়েছে। গত পঁচিশ বছরে ভালো ছবি তৈরি করার দাবি নিয়ে কিছু পরিচালক টালিগঞ্জে এসেছেন। তাঁরা দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য ছবি তৈরি করেন না। প্রত্যেকেই বেশ বড়সড় আদর্শ সামনে তুলে ধরেন। এঁদের নায়ক এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে পাঁচ মিনিট সময় নেয়। তিনটি সিগারেট নষ্ট করে। রেললাইনের ধারে ঝুপড়িতে বাস করা, না খেতে পেয়ে বমি করা মানুষেরা এঁদের নায়ক নায়িকা হয়।

মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে নদীর পাড়ে শুইয়ে গোটা ছবি তোলেন এঁরা। এইসব ছবি অনেক চে যদি প্রেক্ষাগৃহে পৌঁছয় তাহলে তার আয়ু এক সপ্তাহ হয় না। অতএব নন্দনে সেটা দেখাতে বন্ধুবান্ধবরা দেখে পিঠ চাপড়ান আর পরিচালক চেষ্টা করেন কোনোমতে প্যানোরামায় ছবিট ঢুকিয়ে দিতে। ঢুকেও যায়। তারপরে ফেস্টিভ্যাল, স্বদেশে ও বিদেশে। কাগজে দু-একটা ভা প্রাপ্তির খবর ছাপা হলে তিনি বিখ্যাত। তাঁর ছবি বাঙালি দর্শক দেখল না, কিন্তু তিনি একের এক ছবি বানিয়ে যেতে লাগলেন। টাকা জোগাবে সরকার অথবা এন.এফ.ডি.সি.। এছাড়া লে হয়ে আসবে কিছু অর্থবান, যারা ছবি নিয়ে বিদেশের ফেস্টিভ্যালে গিয়ে আন্তর্জাতিক রাইট বি করে টাকা তোলার স্বপ্ন দেখবে।

এই যে একটা ছবি করেই বিখ্যাত হয়ে যাওয়া, এর পিছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে খব কাগজগুলো। অন্য কোনো শিল্পমাধ্যমে এটা সম্ভব নয়। সত্যজিৎবাবুর পাশাপাশি যখন ঋত্বিক ঘটক নাম করা হয় তখন সমস্যা হয় না। 'অযান্ত্রিক', 'কোমল গান্ধার' তৈরি করার ক্ষমতা কার হ 'মেঘে ঢাকা তারা' দর্শকদের আলোড়িত করেনি?

কিন্তু মৃণাল সেন? ইনি 'নীল আকাশের নিচে' নামে যে ছবি তৈরি করেছিলেন তা দর্শক মন ভরিয়ে দিয়েছিল। 'ভুবন সোম'-এর মতো অনবদ্য ছবি ওঁর হাত থেকে বেরিয়েছিল। তারপ হঠাৎ জীবনমুখী হওয়ার বাসনায় তিনি একের পর এক যেসব ছবি তৈরি করতে লাগলেন, তা ছবির জগতের বড় আঁতেল হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও নাম শুনলে প্রযোজক পরিবেশক পালাতেন। কারণ, দর্শকরা হোর্ডিং-এ নাম দেখলে টিকিট কাটবে না। এবং এই পথ অনুস করতে লাগলেন তাঁরাই, যাঁরা রাতারাতি বিখ্যাত হতে চান। একটি ছবি দর্শকদের সামনে নাম এসেছিল। তবু ভালো ছবি করিয়ে হিসেবে প্রচারিত হয়ে যান নীতীশ মুখোপাধ্যায়। একই ব উৎপলেন্দু চক্রবর্তী সম্পর্কে প্রযোজ্য। যেই প্যানোরামার মাটি পায়ের তলা থেকে সরে অমনি হারিয়ে গেলেন। আচ্ছা, নব্যেন্দু চ্যাটার্জি, বুদ্ধদেব দাশগুপ্তেরা কি কখনও মন খারাপ ক না এই ভেবে যে, বাঙালি দর্শকেরা তাঁদের তৈরি ছবি দেখেন না! কষ্ট হয় না? অপর্ণা সেন কি এঁদের একটুও ঈর্ষা হয় না?

লিখতে লিখতে লেখক হয়। সেই লেখক ধীরে ধীরে নিজস্ব পাঠক তৈরি করেন। পাঠক সংখ্যা যত বাড়ে, তত লেখক খ্যাতিমান হন। তেমনি ছবি করতে করতে সত্যজিৎবাবু দর্শক তৈ করেছিলেন। কিন্তু এই হঠাৎ নবাবরা এখনও পর্যন্ত সেই দাবি করতে পারেন না।

আমি ভাবি উলটো কথা। এই একই বিষয় নিয়ে কোনো লেখক যদি উপন্যাস লিখতেন এ ছাপা হওয়ার পর যদি একটি-দুটির বেশি পাঠক না জুটত, বইগুলো দপ্তরিখানায় মুখ থুবড়ে প থাকত, তাহলে সে লেখকের কী দুর্দশা হত?

বন্ধুরা পিঠ চাপড়াতেন, সমালোচকরা বঙ্কিম পুরস্কারের সুপারিশ করতেন আর প্রকাশকরা তাঁ দেখলেই লুকিয়ে পড়তেন। শুধু লেখককে সান্ত্বনা জোগাতে বলা হত, ভালো লেখার মূল্য বোব মতো মানুষ চিরকালই থাকে না। কী করা যাবে!

জুন ২০০১

চাইলেই হওয়া যায় না

ছেলেবেলায় আমাদের পাড়ার এক দিদিমার মুখে মাঝে মাঝেই শুনতাম—'না বাপু, মেয়েছেলের অত মাথা গরম হওয়া ঠিক নয়। আমার বউমা তো কলকাতার মেয়ে, আদরে বড় হয়েছে। কথায় কথায় তার মেজাজ গরম হয়ে ওঠে। এবার ছেলে বিগড়ে গেলে আমায় কেউ দোষ দিয়ো না বাপু।'

আমি বুঝিনি, কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি, বৃদ্ধা অনেকগুলো সূত্র দিয়েছিলেন। প্রথম কথা, কলকাতার মেয়ে। দ্বিতীয়ত, আদরে বড় হয়েছে। আদরে বাঁদর হওয়ার কথা শুনেছি। বদমেজাজি হওয়া পরে দেখেছি। আমাদের মা-মাসিদের বদমেজাজি হতে কখনও দেখিনি। বাবা বা জ্যাঠাদের কারও কারও পান থেকে চুন খসলেই মেজাজ বেরিয়ে যেত—'রুটি কী করেছ? এ তো চামড়া।' বলে উঠে যেতেন পাত ফেলে। একটু মিষ্টি হলেই তরকারি ছুঁড়ে দিতেন। কখন তাঁদের মেজাজ গরম থাকে, সেই ভয়ে ওঁরা বাড়ি ফিরতেই আমরা কেঁচো হয়ে থাকতাম। কিন্তু মা-মাসিদের ব্যাপারটা ছিল উলটো। ভয়ে বাবাকে যা বলতে পারতাম না, মাকে তা উগরে দিয়েছি অনায়াসে।

আমাদের সময়ের মেয়েরা প্রথম যৌবনে বেশ শান্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে চোখ বন্ধ করে মাথা দোলাতেন, দুঃখ পেলে চোখ দিয়ে চুপচাপ জল বেরোত। গয়না বা শাড়ির জন্যে অনেকেই বায়না করতেন না। দু-একজন বড়লোকি কলকাতার মেয়ের কথা আলাদা। তা, তাঁরা তো রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'তেও ছিলেন। আমাদের ছেলেমেয়েরা কিন্তু আমাদের ভয় পেল না। ঘাড়ে-পিঠে চড়ত, বন্ধুর মতো কথা বলত। বরং মায়ের সঙ্গেই তাদের একটু দূরত্ব। যা ভয় পেত তা মাকেই। বাবাকে বলত, 'দেখো, মা যেন জানতে না পারে।' আর তাদের মায়েরা একটু বয়স বাড়লেই সংসারের হাল এমন শক্ত হাতে ধরতেন যে তাঁদের স্বামীরাও বাদ যেত না। পঞ্চাশের স্বামী চল্লিশের স্ত্রীকে সকালে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় বলে যেতে বাধ্য, কখন তিনি ফিরবেন! সময় না রাখতে পারলে ঝামেলার ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে যায়। সন্ধেবেলায় বাড়ি এসে যদি দেখেন স্ত্রী টিভি দেখছেন, তখন তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না। রাত্রে তিনি যদি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শোন তখন তাঁকে ছোঁয়া যাবে না।—'আঃ! কী জ্বালাচ্ছ! একটু শান্তিতে শোব, তারও উপায় নেই। আমি কি ওঘরে চলে যাব?'

স্বামী সাহস করে বলতে পারে না, 'তাই যাও,' কারণ তিনি যে কখনোই যাবেন না, এটা জানা কথা। স্বামীকে একা রেখে মেয়ের সঙ্গে শুলে আত্মীয়স্বজন বলাবলি করবে, ওদের ভাব নেই। এটা সহ্য করবেন না তিনি। অতএব স্বামীকে তাঁর ঘরেই শুতে হবে এবং তিনি যা অপছন্দ করেন তা করা চলবে না। করলেই মেজাজ ফোঁস করে ফণা তুলবে। এই মেজাজ যখন তীব্র হয় তখন ছেলে মেয়ে জামাই—কেউ বাদ যায় না। স্বামীকেই সবদিক সামলাতে হয় তখন। মেশিনগানের মতো চারপাশে গুলিবর্ষণ করে শেষ পর্যন্ত তাক করেন স্বামীকেই। তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় না করিয়ে তাঁর তৃপ্তি নেই।

এখানকার তরুণীরা এটা শুরু করেছে পনেরো-সতেরো থেকেই।—'বাবা, ডিস্টার্ব করো আমার মুড খারাপ। ... আমি কী করেছি মা? তুমি এই ঘরে তখন থেকে খুট্‌খাট্‌ করছে বে ও ঘরে যাও।'

এরকম বাক্য আমাদের পিতৃদেবরা শুনলে কী হত?

খেতে বসে—'ইস রাবিশ! এত বাজে মেনু কী করে করো! আমি উঠলাম।'

'সেকি! খেলি না তো!'

'বাইরে খেয়ে নেব।'

বিয়ে হল। মাসখানেকের মধ্যে তার তরুণ স্বামী যদি মনোমতো কাজ না করেন তাহলে তঁ শুনতে হবে, 'তোমার মতো স্টুপিড স্বামী আমি জীবনে দেখিনি। আমার বাবা যা করতে স পেত না, তা তুমি করো কোন সাহসে!'

অফিস থেকে বাড়ি এসে তরুণী স্ত্রী মেড-সার্ভেন্টের কাছে শুনলেন, শাশুড়ি ফোন করেছিে এ বাড়িতে আসবেন বলে। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মুখোমুখি হলেন তিনি— 'বিনা মাইনের ঝি ও নই। চাকরি করি, আমারও একটা মতামত আছে।'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' স্বামী তটস্থ।

'তোমার মা একবারও জানার প্রয়োজন মনে করলেন না আমার সুবিধে অসুবিধে আছে না! ফোন করে তিনি রায় দিয়েছেন শুক্রবারে আসবেন। হোয়াট ইজ দিস?'

'আসলে শনি-রবি তোমার তো ছুটি থাকে!'

'শনিবার সকালে ওয়াশিং মেশিন আছে। ডাস্টিং আছে। দুপুরে ক্লাবলাঞ্চ আছে। সন্ধেবে ব্যানার্জিদের পার্টিতে যেতে হবে। আর রবিবার আমার রেস্ট ডে। চুপচাপ শুয়ে থাকব। ডাে বলেছে শোনোনি?—ম্যাডাম, অন্তত একটা দিন কম্‌প্লিট রেস্ট নেবেন!'

'ও হ্যাঁ, তাই তো!'

'ফোন করো। বলে দাও, কবে আসবেন আমরা জানিয়ে দেব।'

স্বামী ফোন করলেন গলা নামিয়ে,—'মা ইয়ে হয়েছে। তুমি আসবে বলেছিলে, কিন্তু এই সং আমরা থাকছি না। তাছাড়া তোমার বউমার শরীরও ভালো নয়। না-না, সেসব নয়। এমনি-এ শরীর খারাপ। তোমাকে জানিয়ে দেব।'

ফোন রাখার পর স্ত্রীর জেরা,—'শরীর খারাপ—সেসব নয় মানে?'

'ওই আর কি! পুরোনো দিনের মানুষ যা ভাবে।'

'মাই গড! প্রেগন্যান্ট হওয়া মানে শরীর খারাপ হওয়া—এরকম প্রাগৈতিহাসিক ধারণাকে সাপোর্ট করলে? তুমি তোমার মাকে বলে দেবে, আমরা আগামী ছয় বছর ওসব নিয়ে ভ না। আর আমি কেন? আজকাল তো ছেলেরাও প্রেগন্যান্ট হচ্ছে। চিরকাল মেয়েরাই লোড ব আর তোমরা গায়ে হাওয়া দিয়ে বাবা হবে? ধারণা বদলাও।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' স্বামী শান্তি চাইছিলেন।

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় গল্প লিখতে এসে বাঙালি পাঠকের মন জয় করে একটি কারণে। সে আমাদের জ্যাঠা, বাবাদের বদমেজাজগুলো তার গল্পে ঠেসে দিয়ে 'শ্বেতপাথরের টেবিলে'র সেই বাবার গল্প ভাবুন। আহা, কী মেজাজ! বাড়ির সবাই তটস্থ থাকত। সে আজ কুড়ি বছর আগের কথা। আমাদের পাড়ার রমেনবাবু সঞ্জীবের গল্প পড়ে এবং উদ্বুদ্ধ হলেন। বাঙালি সব হারাচ্ছে। রাত্তিরে লক্ষ্মী ঘি সহকারে ময়দা খায় না, ধুতি বিদ্যাসাগরী চটি পরে না। বড় আপশোস তাঁর। তিনি ঠিক করলেন, সঞ্জীবের গল্পের চরিত্র হে

কলকাতায় তিন কামরায় ফ্ল্যাট তাঁর। সকালে ঘুম থেকে উঠলেন ঠিক পাঁচটায়। তখন অ ফুটব ফুটব করছে। উঠেই বজ্রকণ্ঠে হাঁক পাড়লেন, 'গেট আপ, গেট আপ!'

ঘুম ভেঙে স্ত্রী ধমকালেন, 'কী ছাগলের মতো চ্যাঁচাচ্ছ সাতসকালে!'

'হোয়াট? আমি ছাগল? ওঠো, ওঠো বলছি। এক মিনিট সময় দিলাম। উঠে মর্নিং ওয়াক করতে যাবে।' বলে পাশের ঘরে গিয়ে ছেলের ঘুম ভাঙানোর জন্যে দরজায় শব্দ করতে লাগলেন, 'গেট আপ, গেট আপ!' কিন্তু সেখানে থেকে কোনো সাড়া এল না। আবার ফিরে এলেন স্ত্রীর কাছে, 'উঠে পড়ো। মর্নিং ওয়াকে যাব।'

'যে চুলোয় যেতে চাও যাও, আমাকে ঘুমোতে দাও।' চোখ বন্ধ স্ত্রীর।

এখন কী করা যায়? মারধোর করা অসভ্যতা। একমগ জল গায়ে ঢেলে দেওয়া যায়। সেটাও শোভন নয়। অতএব রমেনবাবু একাই বেরিয়ে পড়লেন হাঁটতে। পার্কে যতীনবাবুদের সঙ্গে দেখা হল। সবাই মিলে একমত হলেন, বাঙালির দিন গিয়েছে। আহা, কী মেজাজ ছিল তাঁদের পূর্বপুরুষদের। যতীনবাবু পরামর্শ দিলেন, যতক্ষণ একা থাকতে পারেন ততক্ষণ ভালো থাকবেন। পারলে আরও আগে বেরিয়ে আসুন। রাত থাকতেই।'

ইচ্ছে করে এপাশ-ওপাশ ঘুরে বাড়ি ফিরলেন রমেনবাবু আটটা নাগাদ। তেনারা এখনও ঘুমোচ্ছেন। ভোরবেলায় কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়াতে রিনিউ করে নিচ্ছেন। তারপরেই তাঁর মাথায় হাত। সুধার মা কাজ করতে আসে সাড়ে ছ'টায়। তিনিই ওকে দরজা খুলে দেন প্রতিদিন। আজ যখন ছিলেন না, তখন নিশ্চয়ই সে ফিরে গেছে। হয়ে গেল। আজ সকালে চা খেতে হলে এদের ঘুম ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অফিসের রান্না কখন হবে ঈশ্বর জানেন। বাসনপত্র মাজবে কে? চিৎকার করে আবার মেজাজ দেখাতে গিয়েও থেমে গেলেন রমেনবাবু। ঠিক কনফিডেন্স পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ বড়লোক হলেই যেমন অভিজাত হওয়া যায় না, তেমনি বদমেজাজ দেখাতে গেলে অন্য ধাতুর দরকার হয়। চচ্চড়ি খাওয়া বাঙালির পক্ষে আর সিংহ হওয়া অসম্ভব।

আমার কাছে এসেছিলেন ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা, শুনেছি ইন্দিরা গান্ধী খুব বদমেজাজি ছিলেন। ঠিক?'

'বোধহয়।'

'ওঁর টাকা ছিল, ক্ষমতা ছিল, জওহরলালের মেয়ে, হতেই পারে।' বললেন রমেনবাবু, 'একটা কাগজে পড়লাম, মমতা ব্যানার্জিও নাকি বদমেজাজি। কিন্তু ওর টাকা নেই, বাবাও জওহরলাল নয়, তাহলে?'

'আপনি পুরুষ, মমতাকে নকল করে কী হবে?'

'না না, নকল করতে চাই না, ওসব করলে ওর মতো সব কুল হারিয়ে বসে থাকতে হবে। একা থাকতে আমি পারি না। এই বেশ, বুঝলেন, যেমন ছিলাম। আপনি সঞ্জীববাবুকে কাইন্ডলি বলবেন, উনি রামকৃষ্ণই লিখুন, ওসব গল্পে যেন ফিরে না যান।'

জুলাই ২০০১

বিদ্যে দাও, বুদ্ধি দাও, সেই সঙ্গে কপ

বিদ্যে আছে বুদ্ধি নেই, এমন মানুষ তো বিস্তর। প্রচুর পড়াশোনা করেছেন এমন অনেক অধ্ মাস্টারমশাই-এর দেখা পাওয়া সহজ, যাঁরা আখের গোছাতে পারেননি। আমার কাছে মাস্টারমশাই মাঝেমাঝে আসেন, যিনি পনেরো বছর আগে স্কুলের চাকরজীবন শেষ করেছেন এখনও পেনশনের কাগজপত্রই হাতে পাননি। দুই ছেলেকে নিজে পড়িয়েছেন। তারা স্কলা পেয়ে বিদেশে চলে গেছে। এখন মাসে হাজার টাকার মতো পান ছাত্র পড়িয়ে। তাতে এব খেয়ে থাকতে হয়। ওঁর ইংরেজি জ্ঞান প্রখর। স্টেটসম্যান অথবা টেলিগ্রাফের ইংরেজির ভুল করে সংশোধন করে দেন। কী করে নির্ভুল ইংরেজি লিখতে হবে, তার জন্য প্রবন্ধ লেখেন বয়সে আমাকে শিখিয়েছেন পরীক্ষায় স্টার পাওয়া মানে কেন আশি নম্বর পাওয়া। ওঁর পো অভাবের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু আর্থিক সাহায্য করতে চাইলে নেবেন না। দিনরাত ভালো ইং কীভাবে লেখা যায় তাই ভাবছেন। আমি অনুমান করি, বাড়িতে ইনি কারোর কাছ থেকে পান না। নির্বোধ মানুষের যা হয়।

আবার বুদ্ধি আছে, বিদ্যে নেই—এরকম লোক তো সর্বত্র ছড়িয়ে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ গিয়ে দেখুন, বিদ্যে নেই, তাতে বয়েই গেল, প্রচুর বুদ্ধিমান মানুষ পাঁচ বছরের জন্যে কী চেয়ারে বসার অধিকার পেয়েছেন। তিন বারে ক্লাশ এইট ক্লিয়ার করতে না-পারা একজন রাজনৈ কর্মী স্রেফ বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের জন্যে শেষ পর্যন্ত যে চেয়ারে গিয়ে বসেছেন, তার সামনে দাঁ গদগদ হয় প্রেসিডেন্সিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া, আই.এ.এস-এর প্রথম সারিতে থাকা একজন সেক্রেটারি। আমাদের পাড়ার পাহাড়িবাবু নাকি ব্যবসাজীবন শুরু করেছিলেন মুড়ি বিক্রি এখন এই শহরে অনেক অনেক কিছুর মালিক। ওঁর স্ত্রী-কন্যাদের বিদেশি দ্রব্য ছাড়া মন না। পাড়ায় যা কিছু হবে, উনি মোটা চাঁদা দিয়ে সভাপতি হবেনই। একটি বেকার লিটল ম্যাগাজি লেখককে রেখেছেন পার বক্তৃতা একশো টাকা দেবেন, এই কড়ারে। বক্তৃতাটা তাঁকে লিখে হয়। স্রেফ বুদ্ধি দিয়ে করে খাচ্ছেন।

এখন বাংলা ছবির অন্যতম যিনি নায়ক তিনি কলেজের মুখ দেখেননি। একজন সর্বভা নায়িকা, যিনি বাংলা ছবিতে অভিনয়ের জন্য প্রাইজ পান, তিনিও একই ব্রাকেটে রয়েছেন। কী এসে গেল! লোক রেখে ইংরেজি শেখার চেষ্টা করেছেন। ভুল উচ্চারণে যখন সেই ইং বলেন, তখন শেক্সপিয়ার সাহেবও কবরে চমকে চমকে ওঠেন, যদিও তাঁর তাঁবেদাররা ব ফাটাফাটি ইংলিশ। তা এসব তিনি পারছেন ঈশ্বর তাঁর ঘটে ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন বলেই

বিদ্যে এবং বুদ্ধি দুটোই যাঁর আছে তিনি কী হতে পারেন? হলফ করে বলতে পারি, কখ

ছাত্র পড়াবেন না। খুব নামকরা শিল্পপতি হবেন। আমেরিকায় গিয়ে ওদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে এদেশে এসে টাকা রোজগার করবেন। নয়তো ফিল্‌ম ডিরেক্টার হয়ে একের পর এক ফ্লপ ছবি তৈরি করেও পৃথিবীর বড় বড় ফিল্‌ম ফেস্টিভ্যালে বিচারক হয়ে ঘুরে বেড়াবেন। সমস্ত শরীরে, পোশাকে বিদ্যে ও বুদ্ধির ছাপ ফুটিয়ে তুলে বেস ভয়েসে প্রধান অতিথির ভাষণ দেবেন। প্রাইভেট প্রযোজকরা ওঁর ছায়া দেখলেই যদি পালিয়ে যায় তো যাক না, ন্যাশনাল ফিল্‌ম ডিভিশনের ঘাড়ে কাঁঠাল ভাঙতে এঁর দেরি হয় না। এ ছাড়া আরও অনেক প্রফেশন এঁদের জন্যে খোলা আছে। যেমন একটা চমৎকার মুখোশ সামনে রেখে দাউদ খানের মতো প্যারালাল সাম্রাজ্যের মালিক হতে সহজেই পারেন। কে না জানে, ঈশ্বরের বিদ্যে আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই! শয়তানের দুটোই আছে। সেই গপ্পোটা মনে পড়ল। স্বর্গ আর নরকের মাঝখানে একটা পাঁচিল ছিল। ঈশ্বর দেখতেন, প্রায়ই কেউ বা কারা সেই পাঁচিলের একটা অংশ ভেঙে দেয়। তিনি চেঁচিয়ে নরকে থাকা শয়তানকে ডেকে বলেন, 'আজ আমি সারিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এর পরে যদি পাঁচিল ভাঙে তাহলে তুমি সারাবে।' শয়তান রাজি হল।

দু'দিন বাদে টহল দিতে গিয়ে আবার ভাঙা পাঁচিল আবিষ্কার করলেন ঈশ্বর। তিনি শয়তানকে ডেকে এবার সারাতে বললে, সে অস্বীকার করল। ভগবান বললেন, 'তুমি চুক্তি ভঙ্গ করেছ, আমি তোমার বিরুদ্ধে মামলা করব।'

শয়তান বলল, 'পারবেন না।'

ঈশ্বর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

শয়তান বলল, 'আপনি তো কোনো উকিল পাবেন না। সব উকিল তো আমার এখানে আছে।'

কে না জানে, ওকালতি করতে হলে বিদ্যে এবং বুদ্ধি দুটোরই দরকার হয়।

আমরা যারা লেখালেখি করি তাদের অনেকেরই বই ভালো বিক্রি হয়। কিন্তু আমার আগে সমরেশ বসু ছাড়া কেউ লেখার টাকায় বেঁচে থাকার সাহস পাননি। যাঁরা চেষ্টা করতেন, তাঁরা দারুণ অর্থকষ্টে ভুগতেন। সমরেশদা কলকাতায় ফ্ল্যাট কিনেছেন, গাড়ি চড়তেন লেখার টাকায়। প্রকাশকদের কাছ থেকে টাকা পাওয়া নাকি কষ্টকর ছিল। আমার সৌভাগ্য, এখনও সেই অভিজ্ঞতা হয়নি। লিখি যখন, তখন একটু-আধটু বিদ্যে আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু বুদ্ধি? আগে, যে চাইত, বই দিতাম। তারা সত্যিই খুব গরিব প্রকাশক। নুন আনতে তাদের পান্তা ফুরাত। শেষ পর্যন্ত তিনজন প্রকাশকের কাছে নাড়া বেঁধেছি, যাঁরা টাকাপয়সা নিয়ে ঝামেলা করেন না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করি, আমার বই-এর বিজ্ঞাপন তেমন দেন না এই তিনজন। আনন্দ-র বাদলদাকে বলতে তিনি বললেন, 'বিজ্ঞাপন ছাড়াই যদি বই বিক্রি হয়, কী দরকার দেওয়ার!'

ঠিকই তো। এবার বইমেলার আগে দেখলাম আমার অগ্রজ এবং শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকের যাবতীয় বই যা বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে বেরিয়েছে একসঙ্গে প্রায় সব কাগজে বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। তিনি বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান বলে প্রকাশকদের ওপর আস্থা না রেখে নিজেই হাল ধরেছেন। নিশ্চয়ই প্রচুর বিক্রি হয়েছে তাঁর বই। কে না জানে, টাকায় টাকা আসে! আমার মাথায় এই বুদ্ধিটা আসেনি। কিন্তু দেখেও তো শেখা যায়। ভাবছিলাম সামনের বইমেলায় মহাজ্ঞানী মহাজনের দেখানো পথে হাঁটব। শিখতে তো কোনো লজ্জা নেই। কিন্তু মুশকিল করে দিল হুমায়ুন। হুমায়ুন আহমেদ। বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিল যখন, তখন নিশ্চয়ই বিদ্বান। ছোকরা উপন্যাস লেখে। বুদ্ধিমান বলে ওকে দেখে আমার কখনোই মনে হয়নি। তা সেই ছোকরা নাকি 'অন্যদিন' নামের প্রকাশনার কাছ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অগ্রিম নিয়েছে আগামী তিনবছরে যেসব উপন্যাস সে লিখবে তার জন্যে। বাঙালি লেখক বাংলা উপন্যাসের জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা অগ্রিম কী করে

পায়? কতটা বুদ্ধি আর বিদ্যের সংমিশ্রণ ঘটলে এমন হওয়া সম্ভব? পকেটের টাকায় সে হ
দিচ্ছে না। যতটা জানি 'অন্যদিনের' মালিক মাজাহারও খুব বেশি টাকা বিজ্ঞাপনে খরচ না
দ্বিগুণ লাভ করবে।

তাহলে? বিদ্যেবুদ্ধি যাই থাকুক না কেন, আসল কথা হল কপাল। কোনো একজন মা
ব্যবসায়ী বলেছিলেন, 'রবি ঠাকুরের ইনভেস্টমেন্ট কী মশাই? কালি, কলম আর কাগজ।
বিশ্বভারতী চলছে।'

আগামী তিন বছরে এ বাবদ হুমায়ুনের খরচ হবে বড়জোর তিনশো টাকা। তিনশো
পঞ্চাশ লক্ষ রোজগার করার কথা মাইক্রোসফ্‌ট কোম্পানির মালিক বিল গেট্‌সও ভাবতে
না।

আগস্ট ২০০১

দাদাগিরি-ভাইগিরি

আমার কোনো দাদা ছিল না। অতএব বাল্যকালে কাউকে দাদাগিরি করতে দেখিনি। যাঁদের দেখেছি, তাঁরা কাকাগিরি করতেন। এক কাকার অভ্যেস ছিল আমার চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তোলা। এতে নাকি আমার চুলের গোড়া শক্ত হওয়ার কথা। জানতে পেরে ঠাকুরদা তাঁর কাকাগিরি ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এখনও যে আমার টাক গজায়নি, সেটা ওই কারণে কিনা জানি না।

স্কুলে যে ডানপিটে ছেলেটি আমাদের নেতৃত্ব দিত, তাকে দাদা ভাবার কারণ ছিল না। কিন্তু তার আদেশ আমরা মেনে চলতাম। ছেলেটি যে দাদাগিরি করছে, তা মনেই আসত না। ওর পরিকল্পনামতো তিস্তার ধারে গিয়ে তরমুজ চুরি করে কখনও ধরা পড়িনি। স্কুলে শেষ ধাপে সন্ধের মুখে তিস্তার বাঁধে লুকিয়ে প্রেম করতে আসা যুগলদের দর্শন করার সাহস ও না থাকলে পেতাম না। আমরা ওর কথামতো চলি বলে নিশ্চয়ই ওর আনন্দ হত, কিন্তু তার বদলে আমাদের কাছ থেকে কিছু চাইত না। দাদা এবং দাদাগিরির মধ্যে পার্থক্যটা বুঝলাম টেনিদা পড়ে। দাদা হওয়ার সুবাদে যে অত্যাচার টেনিদা করত, তা আমার ওই বয়সে পছন্দ হত না। দাদা শব্দটির মধ্যে যে ছাতার আড়াল অনুভব করা যায়, তার বিপরীত অর্থ বহন করে দাদাগিরি।

কলেজে পড়তে এসে দাদাগিরির মুখোমুখি হলাম। ইলেকশনের আগে কলেজের বাইরের দাদা এসে ঠিক করে দিতেন কোন ক্লাশ থেকে কে নির্বাচনে দাঁড়াবে, জেতার পর কে কোন পোর্টফোলিও পাবে। যে ছেলেটি আমাদের বন্ধু, ভালো বক্তৃতা করত, ইউনিয়নের সম্পাদক হয়েছে, সেও মাথা নিচু করে পার্টির দাদার আদেশ মেনে নিত। কলেজ চলছে, হঠাৎ সেই দাদা এসে ডেকে বললেন, অমুক কলেজে এক ছাত্রকে কেউ মেরেছে। তোমরা সবাইকে নিয়ে তোমাদের কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসো। পড়া বন্ধ। দু-একজনের মৃদু প্রতিবাদে কাজ হয়নি, জলস্রোতের মতো ছেলেরা বেরিয়ে এসেছিল ক্লাশ থেকে।

মূল ক্ষমতা দেখানো ছাড়া সে-সময়ের দাদাগিরির অন্য কোনো কাম্য ছিল না। সে-সময়ের কলকাতায় 'মাস্তান' শব্দটা খুব একটা চালু ছিল না। ছিল 'গুন্ডা' শব্দটি। এখন এই শব্দটি প্রায় লোপ পেয়েছে। ভানু বোসদের লোকে যেমন ভয় পেত, তেমনই সমীহও করত। বউবাজারের গোপাল পাঁঠার কুখ্যাতি ছিল কিন্তু তিনি যখন আসামের নির্যাতিত বাঙালিদের পাশে ছুটে যাচ্ছিলেন তখন স্বয়ং বিধান রায় তাঁকে ফিরিয়ে আনেন বলে গল্প শুনেছি। রাম চ্যাটার্জির নাম একসময় যে অর্থে উচ্চারিত হত, পরবর্তীকালে এম এল এ বা মন্ত্রী হওয়ার পরেও সেটা একদম মুছে যায়নি। এইসব দাদারা যে দাদাগিরি করত তা স্পষ্ট চোখে দেখা যেত।

কিন্তু পরবর্তীকালে আর এক দাদাগিরি শুরু হল। যার হাতে ক্ষমতা, তার ইয়েসম্যান না হলে দরজা খুলবে না। বড় পত্রিকার গল্প-সম্পাদক সন্তুষ্ট না হলে বড় কাগজে গল্প ছাপা হবে না। অতএব তাঁকে তেল দিতেই হবে। দরকার হলে মানিকতলা বাজার থেকে জ্যান্ত পারশে কিনে

গড়িয়াহাটে সেটা দাদার বাড়িতে গিয়ে বলতে হবে, আমাদের পুকুরের পারশে এনে দিলাম।

অমুক তরুণ লেখক অমুক সম্পাদকের বাড়ির বাজার মন দিয়ে করে দিয়ে থাকেন, প্রায়ই শুনতে পেতাম। সম্পাদক হেঁটে যাচ্ছেন চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে অফিস থেকে বেরিয়ে পেছনে চলেছে তরুণ লেখক তাঁর ব্যাগ বহন করে।

সিনেমাতে অমুক নায়িকা অমুক পরিবেশকের সঙ্গে বাইরে যাননি, তাই কোনো নতুন ছবিতে অন্য পরিচালক তাঁকে নির্বাচিত করলে পরিবেশকের ফোন আসে—ওকে বাদ দিন। ছবি চলবে না। পরিবেশকের ক্ষমতা জানা থাকায় সঙ্গে সঙ্গে নায়িকা বাদ হয়ে যাবে।

আবার দাদা যদি এক পা হাঁটেন তবে ভাই দশ পা। লাদেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার গুঁড়িয়ে দিয়ে কী আনন্দ পেয়েছে জানি না, কিন্তু দুনিয়ার মানুষ তাকে ইতিহাসের নির্মম খুনি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু তারপর ওই খুনিকে খুঁজে বের করতে বুশ সাহেব দিনের পর আফগানিস্তানে বোমা ফেলছেন, প্রচুর নিরীহ, তালিবানদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানুষ মারা গিয়েছে সেই বোমার আঘাতে। এই লাদেন-বুশ লড়াই-এ দেখলাম টনি ব্লেয়ার অংশ নিলেন। লাট্টুর মতো তিন মহাদেশ ঘুরলেন। বুশ যা বলেন, ব্লেয়ার তার তিনগুণ বলা পছন্দ করেন। একসময় তাঁকে মনে হল বুশ সাহেবের একান্ত সচিব। ইংলন্ডের কাগজগুলো তাই লিখেছে, বুশের দাদাগিরির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্লেয়ার ভাইগিরি করছেন।

ক্রমশ বোঝা যাচ্ছে, দাদাগিরির পাশাপাশি ভাইগিরিও হয়ে উঠছে।

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০১

উদারতা না দুর্বলতা

ধর্ম নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করে আমি কখনোই তাদের দলে নই। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, ঘটনাচক্রে আমি একটি তথাকথিত হিন্দু পরিবারে জন্মেছি, অতএব হিন্দু, এই ঘটনাকেও মেনে নিতে আমার অস্বস্তি হয়। ভারতবর্ষের এই ভূখণ্ডে যতবার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লেগেছে, ততবারই ব্যাপারটাকে মূর্খদের মারামারি ছাড়া কিছু মনে হয়নি। আর একটি ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। সবসময় বলা এবং লেখা হয়, হিন্দু-মুসলমান। এটা ঢাকার কাগজেও দেখেছি। 'হিন্দু' শব্দটি ছোট বলে যদি আগে বসানো হয়, তাহলে এ ব্যাপারে দু-দেশের মানুষদের সহমত আছে বলতে হবে।

কিছুদিন আগে আমার অল্পবয়সি লেখকবন্ধুরা কলেজস্ট্রিটের একটি পত্রিকার দোকানে একটা কার্টুন এঁকে লিখেছিলেন, বাংলাদেশের দালাল। সেই কার্টুনের সঙ্গে অনেকে নাকি আমার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। দালাল, কোম্পানির দালাল, চীনের দালাল, সরকারের দালাল, গালাগাল দেওয়ার পক্ষে মন্দ নয়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দুর্বল রাষ্ট্রের দালাল বললে গালাগাল দেওয়া হয় কি না জানি না, তবে খারাপ তো লাগেই। বাংলাদেশে আমি প্রথম যাই আমাদের বন্ধু কমলের আমন্ত্রণে, সাতাশি সালে। তখনও বাংলা গল্প-উপন্যাস ব্যাপকভাবে ওদেশে রপ্তানি শুরু হয়নি। নব্বই সাল থেকে সেটা হল। আমি যতবার ওদেশে গিয়েছি তা কারও না কারও ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে। গিয়ে দেখেছি, পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কয়েক হাজার বই যা বিক্রি হয়, তার বহুগুণ ওখানে হয়েছে। পাঠকরা আমাদের সব লেখাই জানেন। এই পাঠকদের জন্যে লেখক হিসেবে একধরনের নরম অনুভূমি স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে। তারপর শুরু হল বই-পাইরেসি। পাইরেটদের দাপটে এদেশ থেকে বই রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেল। পাইরেসি-উৎসবে আমাদের বই আরও বেশি বিক্রি হতে লাগল, কিন্তু না লেখক, না মূর্খ প্রকাশক—একটিও পয়সা পেলেন না। আমরা প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারেননি।

এখন বই বিক্রির কথা ভাবি না। যেতে যেতে অনেকের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়ে গেছে, তা-ই আমার কাছে অনেক দামি। ওখানকার কাগজের সম্পাদকরা আমাদের লিখতে বলেন, আমরা লিখি। কারও বাড়িতে থাকার সময় বিন্দুমাত্র মনে হয় না বিদেশে আছি। মনে রাখতে হবে, এঁরা ধর্মসূত্রে মুসলমান। কিন্তু কখনোই ওঁদের আচরণে আমি কোনো বৈষম্য খুঁজে পাইনি। যেমন একটি খাওয়ার টেবিলের কথোপকথন—

'আপনি কি গোরু খাবেন? খান না, না?'

'না। অভ্যেস নেই। আপনি কি শুয়োর খান?'

'না। বুঝেছি। তাহলে গোরুটা টেবিল থেকে সরিয়ে দিই।'

যেটা বলতে চাইছি, বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে ধর্মান্ধতার প্রকাশ তেমনভাবে দেখতে আমি পাইনি। এই কথাটাই বারংবার বলতে চেয়েছি। এপার বাংলায় হিন্দু বাঙালিরা খুব সহজেই

বলেন, 'আমরা বাঙালি, ওরা মুসলমান।' ওঁরা যে বাঙালি, এই ভাবনা এঁদের মাথায় আসে না ওঁরা মুসলমান, এটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

এসব কথা যখন লিখেছি বা বলেছি তখন আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় ছিল। আওয়ামি লিগে অন্য ব্যাপারে যা যা বদনাম থাকুক না কেন, ধর্মের ব্যাপারে উদারতা তাঁরা দেখিয়েছেন। বাংলাদেশে অনেক হিন্দু নাগরিককে সে সময় প্রশ্ন করে জেনেছি, তাঁরা কোনো অসুবিধেয় নেই।

সাম্প্রতিক নির্বাচনে ক্ষমতা বদল হল। আওয়ামি লিগ গো-হারা হারল। বেগম জিয়ার নেতৃত্বে বি.এন.পি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। নির্বাচনের আগে তাঁরা যাঁদের সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন তাঁদের মধ্যে জামাত ছিল। জামাতের অস্তিত্ব হল ধর্মের নামে জিগির তোলা। যাঁরা মুসলমান ধর্মাবলম্বী, তাঁদের ক্ষেপিয়ে তুলে ইসলামি রাষ্ট্রের পত্তন করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে তাঁর বাঙালি বা বাংলাদেশি নন, স্রেফ মুসলমান। নির্বাচন বৈতরণী পার হতে বেগম জিয়া তাঁদের সঙ্গে নিয়েছিলেন। ভাবতেও পারেননি, নিজের দল একাই আওয়ামি লিগকে সরাতে পারে। মন্ত্রীত্বে আসার পর জামাত বলতে লাগল, তাঁদের সাহায্য ছাড়া বেগম জিয়া এভাবে জিততেন না। তারা অনেক বড় দপ্তর দাবি করেছিল, কিন্তু বেগম জিয়া সেটা নাকচ করে ছোটতে সন্তুষ্ট থাকতে বলেছেন এবং এর পরেই শুরু হল বাংলাদেশি হিন্দুদের ওপর অত্যাচার। প্রথম কথা, হিন্দুদের ধরে নেওয়া হয়েছে আওয়ামি লিগের সমর্থক। আওয়ামি লিগের যেসব নেতা অত্যাচারী ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে যেমন বি.এন.পি ব্যবস্থা নিচ্ছে, তেমনি জামাত হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করছে। সীমান্ত পেরিয়ে হিন্দুরা চলে আসছেন পশ্চিমবাংলায়। শুধু গরিব হিন্দু নয়, ধনী হিন্দুকেও নিঃস্ব হয়ে চলে আসতে হয়েছে। শুধু এপার বাংলার কাগজে, না বললে নয়, এমনভাবে খবর ছাপা হয়েছে। বেগম জিয়া কমিশন বসিয়েছেন ঘটনার সত্যতা জানতে।

একটি দেশের নাগরিকদের অন্য নাগরিকরা তাড়িয়ে দিচ্ছে, এটা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে ভাবা যেত, যদি না তাড়ানো মানুষগুলো আসায় আমাদের অর্থনীতির ওপর চাপ পড়ত। লক্ষ করেছি, যারা এসেছে তারা ভয় পেয়েছে, তাদের মেয়েদের ওপর অত্যাচার হবে বলে। এবার বাংলাদেশের হিন্দুদের পুজো বিঘ্নিত হয়েছে, শুনেছি প্রতিমাও ভাঙা হয়েছে। মাঝে মাঝে ভেবেছি যে দেশে এখনও দেড়কোটি হিন্দু, তারা একত্রিত হয়ে এর প্রতিবাদ কেন করেনি!

যে সময়ে হিন্দুদের তাড়ানো, পুজো নষ্ট করার কুকাজ চলছিল, সে সময় পশ্চিমবাংলার হিন্দুরা মহা সমারোহে পুজো উৎসব পালন করেছেন। এখান থেকে কোনো প্রতিবাদ সোচ্চার হয়নি। কিছু রাজনৈতিক দলের মুষ্টিমেয় কর্মী বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে গিয়ে চ্যাঁচামেচি করে কর্তব্য শেষ করেছেন মাত্র।

এই সময় আমি ধাক্কা খেলাম। শাহরিয়া কবির বাংলাদেশের সুপরিচিত লেখক। তিনি এদেশে এসেছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, নতুন সরকার আসার পর ওদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। এই বিবৃতি গুরুত্ব দিয়ে এখানকার সব কাগজ ছাপেনি। কিন্তু কবির যেই জিয়া এয়ারপোর্টে ফিরে গেলেন অমনি তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। এবং এখনও পর্যন্ত তিনি পুলিশ হেফাজতে আছেন, তাঁর ওপর প্রবল অত্যাচার হচ্ছে।

ঢাকার লেখক বুদ্ধিজীবীরা এই ঘটনার প্রতিবাদ করেননি ভয়ে। করলে তাঁদের একই দশা হবে। বস্তুত মুজিবের মৃত্যুর আগে থেকে আজ পর্যন্ত নিরানব্বই শতাংশ গল্প-উপন্যাসে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি নেই। লেখকদের লেখা পড়লে বোঝাই যাবে না, ঘটনার সময় কখন। কোনো রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কথা সচেতনভাবে লেখকরা লেখেন না। আজও তাঁরা চুপ করে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমরা কী করছি? এপার বাংলার লেখকরা? কবিরের ঘটনার কোনো প্রতিবাদ এপার বাংলার লেখকরা করেছেন বলে জানি না। এই মুহূর্তে আমি হিন্দু নই, কিন্তু কিছু নির্যাতিত মানুষের

পাশে দাঁড়ানোর জন্যে কবিরের বক্তব্য সমর্থন করতে যদি আমাকে হিন্দু হতে হয়, আমি রাজি আছি।

আমাদের এখানে কবিতা উৎসব বা বইমেলায় বাংলাদেশি কবি-লেখক প্রকাশকদের জামাই-আদরে ডেকে আনা হয়। খুব ভালো কথা। বইমেলায় তাঁদের বেশ বড় জায়গা দেওয়া হয়; কিন্তু তবু নাকি ওঁদের মন ভরে না। অনেকেই অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু একুশের বইমেলা দূরের কথা, ঢাকায় ডিসেম্বর মাসে যে বইমেলা হয়, সেখানে আমাদের গিল্ডের জন্যে ছোট্ট একটি স্টল বরাদ্দ করে আমন্ত্রণ জানানো হয় যাওয়ার জন্যে। শর্ত থাকে, অবিক্রিত বই ফেরত আনা যাবে না। ছোট ভাই-এর আবদার বড় ভাই যেমন সহ্য করে, আমাদের পাবলিশার্স গিল্ড তাই করে এসেছে এতকাল।

কিন্তু এবার বাংলাদেশের লেখক-কবি-প্রকাশকদের কাছে প্রশ্ন রাখার সময় এসেছে—আপনারা কেন শাহরিয়া কবিরের পাশে দাঁড়ালেন না? জামাই আদরের প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও বঙ্গ-উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েও কেন, কোন ভয়ে এবার এলেন না? বইমেলার সময়ে যদি বা আসেন, তাহলে আপনারা যেমন আমাদের মেলায় জায়গা দিয়েছেন, তার সমান জায়গা আমরা আপনাদের দেব না কেন?

একই সঙ্গে প্রশ্ন আমাদের কাছে। উদারতা যে কখনও দুর্বলতার নামান্তর, এটা কি খেয়ালে রেখেছেন?

জানুয়ারি ২০০২

প্যারাসাইট (

কয়েক সপ্তাহ আগে চন্দননগরে একটি গল্পপাঠের আসর বসেছিল। প্রয়াত শ্যামল গঙ্গোপা
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন সহ তরুণ গল্পকারদের গল্পপাঠ সেদিনের অনুষ্ঠানসূচিতে ছিল। শুনতে
এক তরুণ লেখক, যাঁর বয়স এখন পঞ্চাশ, বাজারি লেখকদের খুব গালাগাল করেছেন

ষাট সালের আগে এই ব্যাপারটা ছিল না। লিট্‌লম্যাগের দিন শুরু হতেই দেখেছি এসটাব্লিশ
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রবণতা তৈরি হল। প্রথমদিকে ব্যাপারটা সত্যি ভালো ছিল।
গল্প, সাজানো চরিত্র নিয়ে লেখালেখি যাঁরা ছাপেন এবং করেন তাঁদের প্রতি কোনো সমর্থন
উচিত নয়। পরে দাঁড়িয়ে গেল গালাগাল দেওয়ার জন্যে গালাগাল দেওয়া। কারও লেখা
হলেই তিনি সৎসাহিত্যের লেখক নয়, বাজারি লেখক, অতএব তাঁকে নিয়ে কোনো আ
নয়—এরকম ঘোষণা চলতে লাগল। মজার কথা হল, যাঁরা এই বিস্ফোভে অংশ নিলেন
পায়ের তলা থেকেই মাটি সরতে লাগল হু হু করে।

চন্দননগরের ঘটনাটা ব্যতিক্রম নয়। তবে ঘটনাটা শোনার পর আমি কলেজস্ট্রিটে
যেসব পঞ্চাশী তরুণ সেদিন অনুষ্ঠানে ছিলেন তাঁদের বই কলেজস্ট্রিটের এক প্রকাশক ছে
ঘটনাচক্রে তিনি আমারও প্রকাশক। তাঁর সঙ্গে আমার এরকম কথাবার্তা হল—

আমি ॥ তরুণ লেখক বলতে আপনি কী বোঝেন?

প্রকাশক ॥ এই যারা সবে লিখছে, চার-পাঁচ বছর, পঁয়ত্রিশের নিচে বয়স, তারাই ত

আমি ॥ এই বয়সের মধ্যে লিখে কি সাফল্য পাওয়া যায়?

প্রকাশক ॥ আগে তো তাই হত। সব বিখ্যাত লেখক, একমাত্র রাজশেখর বসু ছাড়া, পঁয়া
মধ্যেই বিখ্যাত হয়েছেন। এখনকার সুনীল, শীর্ষেন্দু তো তাই। আপনার
বেরিয়েছিল পঁচাত্তর সালে। তার মানে আপনি তখন বত্রিশ ছিলেন। তাই

আমি ॥ হ্যাঁ। তবে তারও আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের যুগের কথা
এমনকী আমাদের আগে শংকর লেখা শুরু করে বিখ্যাত হয়েছেন। ত্রিশের ম
তাহলে তারুণ্যের কাল কি বেড়ে গেছে? এখনকার পঞ্চাশের লেখকদের
আপনি তরুণ বলে চালাবেন?

প্রকাশক ॥ আসলে কী জানেন, এঁরা ত্রিশেও যে জায়গায় ছিলেন পঞ্চাশেও সেই জ
থেকে গেছেন। ফলে তখনও তরুণ বলতাম, এখনও অভ্যেসে বলে চ

আমি ॥ আপনি তো এঁদের বই ছেপেছেন। কেমন বিক্রি হয়?

প্রকাশক ॥ নাম না করেই বলছি। মোটামুটি লিট্‌লম্যাগে লেখেন, এমন অনেকেরই বই
ছেপেছি। কারও বই দু'বছরে হাজার কপি বিক্রি হলে খুব ভালো বিক্রি
অনেকেরই তা অবশ্য হয় না।

আমি ।। দু'বছরে হাজার কপি?

প্রকাশক ।। কিছু করার নেই। তার বেশি পাঠক ওঁদের চান না।

আমি ।। আপনার লাভ হয়?

প্রকাশক ।। আজকাল হাজার কপি বিক্রি হলে বই ছাপার খরচটা ওঠে। দু'বছরে খরচটা উঠলেই বাঁচি। টাকাটা ব্যাংকে রাখলে সুদ পেতাম, ওটা পাই না।

আমি ।। তাহলে ছাপেন কেন?

প্রকাশক ।। এসে অনুরোধ করেন ছাপার জন্যে। তাছাড়া ভেবে নিই, যাদের বই বেশি বিক্রি হয় তাদের লাভের টাকায় না হয় কিছু টাইটেল বাড়ানো যাক।

আমি ।। অর্থাৎ এঁদের অবস্থা আপনার কাছে প্যারাসাইটের মতো, বৃক্ষের ওপর নির্ভরশীল।

প্রকাশক ।। এত সত্যি কথা না বলাই ভালো।

এরপর আমি এই ধরনের তরুণ লেখকদের মুখোমুখি হতে চাইলাম, যাঁদের বই বাজারে পাওয়া যায় এবং যাঁরা বাজারি লেখকদের মুন্ডু চিবিয়ে খুব আনন্দ পান। শেষপর্যন্ত এক বিকেলে কফিহাউসে পেয়ে গেলাম একজনকে। তাঁর সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছিল তা এইরকম—

আমি ।। আপনি বাজারি লেখক বলতে কী মনে করেন?

তরুণ লেখক ।। যাঁরা জীবন থেকে দূরে সরে গিয়ে লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন, প্রচুর বিক্রি হয়, প্রচুর টাকা পান, তাঁদের বাজারি লেখক বলি।

আমি ।। যাঁরা জীবন নিয়ে লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন?

তরুণ লেখক ।। হতেই পারেন না।

আমি ।। ধরুন, আশাপূর্ণা দেবী।

তরুণ লেখক ।। উনি তো মেয়েদের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়ে জনপ্রিয় হয়েছেন।

আমি ।। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়?

তরুণ লেখক ।। কবিতার ক্ষেত্রে সুনীলদা সৎ। উপন্যাসে বাজারি। বর্তমান এড়িয়ে অতীতে পড়ে আছেন, কারণ অতীত খায় ভালো।

আমি ।। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়?

তরুণ লেখক ।। শীর্ষেন্দুদার বই আগে একদম বিক্রি হত না।

আমি ।। এখন তো হয়। বাংলাদেশে উনি খুব জনপ্রিয়।

তরুণ লেখক ।। হ্যাঁ উনিও ক্রমশ বাজারি হয়ে যাচ্ছেন।

আমি ।। বুদ্ধদেব গুহ?

তরুণ লেখক ।। উনি তো হট্ কেক। কিছু বলার নেই।

আমি ।। আমি?

তরুণ লেখক ।। নিজে জানেন না কী করেছেন? শরৎচন্দ্রের সেন্টিমেন্ট নিয়ে আধুনিক চেহারা দিয়ে তার সঙ্গে নকশাল বা সমসাময়িক প্রব্লেম ঢুকিয়ে এমন কক্‌টেল করেছেন যে তার সঙ্গে জীবনের কোনো মিল নেই। আপনার আর সুনীলদার লেখা নাকি গোগ্রাসে গেলে লোকে। এক নিশ্বাসে পড়ে! ড্রাগের মতো ব্যাপার। ছিঃ!

আমি ।। আপনার, আপনাদের লেখালেখি তো বই হয়ে বের হয়।

তরুণ লেখক ।। হ্যাঁ।

আমি ।। বিক্রি হয় কেমন?

তরুণ লেখক ।। দেখুন, আমি বা আমার বন্ধুরা আম-জনতার মুখ চেয়ে লিখি না। আমাদের যা ভাবনা তা স্বাধীনভাবে আমাদের মতো করে লিখি। সেই লেখা পাবলিক যদি না বোঝে না বুঝুক, কোনো কোনো পাঠক নিশ্চয়ই বোঝেন। তাঁরাই বই কেনেন।

তাছাড়া আমরা কী লিখছি তা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দে
দায়িত্ব প্রকাশকের। আমাদের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। বিজ্ঞাপন দিতে চান না

আমি ।। বিজ্ঞাপন দিতে টাকা লাগে। বই-এর জন্যে কাগজ কিনতে, ছাপতে টাকা হয়। দপ্তরিকেও টাকা না দিলে চলে না। এসব খরচ একজন প্রকাশক করেন ব জন্যে। আপনার বই নিয়েও উনি ব্যবসা করেন। এখন মুষ্টিমেয় কিছু আপনাদের বই কিনলে তো ওঁর ব্যবসার বারোটা বেজে যাবে।

তরুণ লেখক ।। তাই বলে আমি বাজারি লেখক হতে পারব না।

আমি ।। আপনার বই ঠিক আমাদের মতো রঙচঙে হয়ে যখন বাজারে বের হয় তো আপনিও বাজারিদের দলে পড়বেন। হ্যাঁ, আপনি যদি নিজের পয়সা ছেপে বিনামূল্যে তা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে চান তাহলে অবশ্যই ত বাজারি লেখক নন। সেটা করছেন না কেন? প্রকাশকদের কাছে যাচ্ছেন

তরুণ লেখক ।। পাগল! আমার অত পয়সা কোথায়?

আমি ।। তাহলে যাদের বই বিক্রি হয় তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় গিয়ে আপনারা ফলো অনে হারছেন। সেটাই আপনাদের ক্ষোভের কারণ। তাই তো?

তরুণ লেখক ।। কী যা-তা বলছেন! ওঁদের কোনো ক্লাস আছে, যে প্রতিযোগী ভাবব? এঁ কমলকুমার মজুমদার অথবা অমিয়ভূষণ মজুমদার, এঁদের ধারেকাছে আসতে প ওইসব বাজারি লেখকরা? কমলকুমার বা অমিয়ভূষণকে পাঠকরা বুঝতে পা বইও কম বিক্রি হত। তার মানে ওঁদের সাহিত্য খারাপ?

আমি ।। মোটেই নয়। তবে গবেষণা করে দেখা দরকার, কেন, কী কারণে ওঁদের পাঠকরা গ্রহণ করেনি বিপুলভাবে। আচ্ছা ধরুন আপনার কোনো বই বের হ মাত্র হইহই করে বিক্রি হয়ে গেল। প্রথম বছরেই দশটা এডিশন। আপনাকে তখন বাজারি লেখক বলা যাবে?

তরুণ লেখক ।। দূর। এরকম হবেই না।

আমি ।। যদি হয়ে যায়?

তরুণ লেখক ।। তাহলে বুঝতে হবে আমি কোথাও আপস করেছি।

আমি ।। তার মানে হল, আপোস করলেই আপনি দারুণ জনপ্রিয় হতে পারেন।

তরুণ লেখক ।। না— মানে—।

আমি ।। 'পথের পাঁচালী' পড়েছেন?

তরুণ লেখক ।। অবশ্যই!

আমি ।। বাজারি লেখা বলে মনে হয়?

তরুণ লেখক ।। না-না।

আমি ।। কত হাজার কপি বিক্রি হয়েছে এবং হচ্ছে জানেন?

তরুণ লেখক ।। ওগুলো ক্লাসিক। চিরকাল বিক্রি হবে। সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

আমি ।। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শংকর 'কত অজানারে' লিখেছিলেন। বইটি এখ সমানতালে বিক্রি হচ্ছে। পঞ্চাশ বছর সময়টাকে আপনার কীরকম মনে হ

তরুণ লেখক ।। কোনো সাহিত্যভ্যালু নেই। নতুন ধরনের বিষয় বলে পাবলিক কিনছে।

আমি ।। পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা কিনেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পৃথিবীতে নে এখন যাঁরা কিনছেন তখন তাঁদের অনেকেই জন্মাননি। তাহলে আপনি বলা পাবলিক একই আছে?

তরুণ লেখক ।। হ্যাঁ। অবশ্যই।

আমি ।। শেষ প্রশ্ন, আচ্ছা এই যে আপনাদের বই ছেপে প্রকাশকরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তাতে আপনাদের বিবেকে লাগে না?

আমার প্রশ্নটি শুনে পঞ্চাশ বছরের তরুণ লেখক টেবিল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

এর মাঝখানে আর একশ্রেণীর কিছু লেখক আছেন যাঁরা সাতেপাঁচে থাকেন না। কারও পেছনে লাগেন না। তরুণকালে হয়তো কোনো বড় সম্পাদককে সুন্দরবনের চিংড়ি খাইয়েছেন, এইমাত্র। এরকম কয়েকজনকে আমি চিনি, যাঁরা গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বড় কাগজে ছোট গল্প লিখে যাচ্ছেন অথচ কোনো প্রকাশক তাঁদের বই ছাপতে আগ্রহী নন। গত পঁয়ত্রিশ বছরে কোনো বড় কাগজের সম্পাদক তাঁদের কাছে উপন্যাস চাননি। এঁদের গল্প বছরে এক-দু'বার বড় কাগজে ছাপা হয়। নিজেদের ভালো লেখক মনে করেন এঁরা। কফিহাউসের টেবিলে গম্ভীর মুখে বসে থাকেন। অর্থাৎ জীবনে সাফল্য নেই। পঁয়ত্রিশ বছর আগে যেখানে ছিলেন আজও সেখানে রয়ে গেছেন।

যেহেতু লেখকদের অবসরের কোনো বয়েস নেই তাই অবসর নিতে পারছেন না। লেখক হিসেবে কেউ তাঁদের চেনে না। পাড়ায় গিয়ে খোঁজ করলে নাম শুনে মুদিওয়ালা বলবে, 'ও, নবীন মাস্টারের বাড়ি জানতে চান? ওই যে হলুদ বাড়িটা—।'

কলকাতার বাইরে গিয়ে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন শহরের বই-এর দোকানে ঘুরলে পাঠকদের পছন্দের একটা তালিকা পাওয়া যায়। বর্ধমানে গিয়েছিলাম বইমেলা উপলক্ষে। সেখানে দুটি মেয়ে বই কিনতে এসেছিল। কলেজে পড়ে। তাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম—

আমি ।। এখন যাঁরা লিখছেন তাঁদের মধ্যে কার কবিতা বেশি ভালো লাগে?

দু'জনে একসঙ্গে ।। জয় গোস্বামী।

আমি ।। আর কেউ না?

প্রথমজন ।। মন্দাক্রান্তা সেনও মাঝে মাঝে ভালো লেখেন।

আমি ।। ভালো লাগে কেন?

দ্বিতীয়জন ।। পড়লে হৃদয় ছুঁয়ে যায়। মনে হয় বন্ধুর মতো।

আমি ।। গল্পকার?

প্রথমজন ।। আপনাদের মধ্যে?

আমি ।। না না। তরুণদের মধ্যে।

প্রথমজন ।। কে তরুণ তা তো জানি না। এই তো, বাণী বসু তো বেশিদিন লিখছেন না। আমি ভাবতাম উনি খুব তরুণ। সুচিত্রা ভট্টাচার্যকেও তাই মনে হত। কিন্তু জানলাম বাণী বসু আপনার চেয়েও বয়সে বড় আর সুচিত্রা ভট্টাচার্য দিদিমা হয়ে গেছেন।

আমি ।। যাদের বয়স পঞ্চাশের নিচে, যাদের কাছে আমরা এখনও আশা করতে পারি!

দ্বিতীয়জন ।। (ফিক্ করে হেসে) আমার মায়ের বয়স বিয়াল্লিশ। মা বলে, বুড়ি হয়ে গেছি।

আমি ।। নিশ্চয়ই কথাটা ঠিক নয়?

প্রথমজন ।। তাহলে অভিজিত তরফদার আর সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়।

আমি ।। কেন?

দ্বিতীয়জন ।। বা রে! আমরা চোখের ওপর দেখলাম কয়েক বছর ধরে ওঁরা একটু একটু করে কী ভালো লিখছেন এখন।

আমি ।। লিট্‌লম্যাগে লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, এমন কার গল্প তোমাদের ভালো লাগে? (ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল। শেষ পর্যন্ত)

প্রথমজন ।। কেন? সুনীল গাঙ্গুলি, শক্তি চ্যাটার্জী।

আমি ।। কোন লিট্‌লম্যাগ?

দ্বিতীয়জন ।। কৃত্তিবাস।

আমি ।। তার পরে? তার পরে?

প্রথমজন ।। আপনি নাম বলুন, আমার মনে পড়ছে না। (আমি স্টলের একপাশে রাখা ও পঞ্চাশী লেখকদের বই দেখালাম)

দ্বিতীয়জন ।। খুব বোর হয়েছি পড়তে গিয়ে।

প্রথমজন ।। কী যে লেখে, ঠিক বুঝি না।

আমি ।। গল্প, মানে কাহিনী, পান না?

প্রথমজন ।। পাই, কিন্তু যেই দানা বেঁধে ওঠে, অমনি অন্যদিকে চলে যায়।

আমি ।। এটাই তো জীবনের নিয়ম। জীবন কি একটানা গল্প হয়ে বয়ে যায়?

দ্বিতীয়জন ।। অতশত জানি না। আমাকে টানে না।

যে যাই বলুক, একজন লেখকের লেখালেখির ক্ষেত্রে পাঠকই শেষ কথা। 'পাঠক নি বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে নিজেরই পতন ডেকে আনা হয়। তাছাড়া একজন বা দ ভুল করতে পারেন, হাজার হাজার পাঠক একই ভুল নিশ্চয়ই করবেন না। তাই বাজারে নেমেছেন তখন নিজেকে যাচাই করুন। কেন পাঠকসমাজ মুখ ফিরিয়ে আছেন? কোথায় আ অক্ষমতা!

ফেব্রুয়ারি ২০০২

কে কাকে ভোগ করে

এক

আমি ছেলেবেলায় বেলা কাকিমার খুব ভক্ত ছিলাম। বেলা কাকিমা, যাকে বলে ডানাকাটা সুন্দরী, তা নন, কিন্তু ওঁর দিকে তাকালে আমার খুব আনন্দ হত। বেলা কাকিমার বর রমেশকাকু খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কন্ট্রাক্টরি করতেন। এবং প্রতি শনিবার রাত্রে বেলা কাকিমাকে মারতেন। ঠিক রাত আটটা থেকে সওয়া আটটার মধ্যে শুরু হত প্রহারপর্ব। মার খেতে খেতে বেলা কাকিমা চিৎকার করে কাঁদতেন। কান্নাজড়ানো শব্দগুলো ছিল এইরকম—ওকে বাবারে, আমাকে মেরে ফেলল রে, ও মাগো, আমি মরে যাব গো আমাকে বাঁচাও বাঁচাও! এই একই সংলাপ প্রতি শনিবার রাত্রে শোনা যেত। শুনতে শুনতে রাগে দুঃখে আমি ক্ষেপে উঠতাম। মনে হত ছুটে গিয়ে রমেশকাকুকে এক ঘুষিতে মাটিতে ফেলে দিই। কিন্তু তখন আমার বারো বছর বয়স। ওই বয়সে কত কিছু করতে ইচ্ছে করে যা বাস্তবে করা যায় না। শুনেছিলাম পাড়ার অভিভাবকরা নাকি প্রথম দিকে রমেশকাকুকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ওই সময় বেলা কাকিমার গলাই সবাই শুনতে পেত কিন্তু রমেশকাকু একটি আওয়াজও করতেন না। রমেশকাকু গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, 'আমার স্ত্রীর একটু কান্নাকাটি করার অভ্যেস আছে, ও নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না। সপ্তাহে আধঘণ্টা কাঁদার স্বাধীনতা ওঁর নিশ্চয়ই আছে।'

পরদিনই সাজুগুজু করে সবাই বেলা কাকিমাকে স্বামীর সঙ্গে সিনেমায় যেতে দেখেছে। দোকানে গিয়ে দামি দামি শাড়ি কিনে রমেশকাকুর গায়ে গা মিশিয়ে বাড়ি ফিরছেন—এ দৃশ্য সবার দেখা। ফলে প্রতিবেশিনীরা ওঁকে এড়িয়ে চলত। আমি পারতাম না। আমাকে দেখলেই উনি বলতেন, 'এই যে, একটা উপকার করবে? লাইব্রেরি থেকে বইটা বদলে এনে দেবে?' নতুন কোন বই আনতে হবে তার নামও বলে দিতেন। আমার ক্ষেত্রে বড়দের বই পাওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু বেলা কাকিমার জন্যে যে বই আনতাম তা উলটে পালটে পড়ে নিতাম নির্জন জায়গায় গিয়ে। অনেকটাই বুঝতাম না। চরিত্রহীন উপন্যাসটি এনে যখন ওঁর হাতে দিয়েছিলাম তখন উনি হেসে বলেছিলেন, 'পড়ার ইচ্ছে আছে নাকি?' আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'এটা তো বড়দের বই।'

'কেন? তুমি কি খুব ছোট?'

ব্যস। নিজেকে বড় ভাবতে লাগলাম। একদিন জিজ্ঞাসা করেই ফেললাম, 'তুমি কাঁদো কেন?'

'আমাকে যে কাঁদায়, তাই।'

'তোমাকে কি খুব মারে?'

'খু-উ-ব।'

'তাহলে বাবা-মায়ের কাছে চলে যাও না কেন?'

'গিয়ে কি হবে?'

'মার খেতে হবে না।'

'তা ঠিক। তবে সেইসঙ্গে কেউ ভালোবাসবে না।'

'কেউ ভালোবাসলে তার সঙ্গে চলে যাবে?'

'দূর! যে ভালোবাসবে সেও তো মারবে। নতুন মার সহ্য করতে আর পারব না।' বেলা কাকি খিলখিল শব্দে হেসে উঠেছিলেন।

আমার সে বয়সে বেলা কাকিমা রহস্যময়ী ছিলেন। কোনোদিন বই পালটে গিয়ে দেখেছি উদাসি হয়ে আছেন। আমাকে কনুই দেখালেন। তার ওপর কালসিটে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। আ খুব রেগে গিয়ে বললাম, 'তুমি থানায় চলো, পুলিশকে সব বলবে।'

'তাহলে আমাকে খেতে দেবে কে?'

সেই বয়সে বুঝে গিয়েছিলাম—মেয়েদের সব আছে কিন্তু রোজগার করার ক্ষমতা না থাক কিছু করার নেই। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদির কথা মাথায় ঢোকেনি। এই যে আমার মা অনে কিছু করার ইচ্ছে হলেও করতে পারেন না, বাবার সে সমস্যা হয় না।

দুই

নরনারীর সম্পর্ক, বিশেষ করে যৌন অঙ্গ এবং তার ব্যবহার শেখাবার কোনো চেষ্টা ছিল না আমাদে স্কুলে। অভিভাবকরাও ছিলেন উদাসীন। যেন ব্যাপারটা কিছু নয়, তারা যেমন শিখে ফেলেছিলে আমরাও শিখে নেব। তা ওই বয়সে আমাদের ক্লাশের একটি জঙ্গি ছেলে, যার নাম সুজিত, এই বিষয়ে খুব পারদর্শী ছিল। তার পাড়ার বউদিদের কল্যাণে সে নাকি বেশ জ্ঞানী হয়ে উঠেছি সমবয়সি হলেও আমাদের ছেলেমানুষ ভাবতে তার কোনো দ্বিধা ছিল না। সুজিতও একটা ক প্রায়ই বলত, প্রকৃতি একটা ব্যাপারে ছেলেদের মেরে রেখেছে। ছেলেরা ইচ্ছে করলেও মা হ পারবে না।

ছেলেদের মা হওয়ার কী দরকার? তারা তো চিরকাল বাবা হয়। প্রশ্ন করলে সুজিত মুর্চা হাসত। বলত, 'মেয়েদের প্রকৃতি সব দিয়েছে কিন্তু বাবা হওয়ার ক্ষমতা দেয়নি।' এটাও তখ বুঝতাম না। দুটি মেয়ে এক সন্তানের বাবা-মা হতে পারে? হওয়ার কী দরকার? সুজিত বুঝিয়েছি 'ধর, মেয়েরা বলল, ছেলেদের চাই না। আমরা নিজেরাই কাফি! তো, কী হবে? আর যাই হো বাচ্চা হবে না। আবার মেয়েরা যদি কেটে পড়ে তাহলে ছেলেদেরও একই সমস্যা। দু'জনে মি গেলে তবে সৃষ্টি বাড়বে।' তখন মনে হয়েছিল, সত্যি, ছেলে এবং মেয়ে দু'জনেই খুব অসহায়

তিন

এখন মেয়েরা এমন সব কাজ করছেন যা বিশ বছর আগে চিন্তাও করা যেত না। একটি মে পঁচিশ বছর বয়সে লাখ টাকা মাইনে পাচ্ছে, এমন উদাহরণ প্রচুর। তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনত যত বেড়েছে তত ছেলেদের তৈরি করা নিয়মগুলো খসে গেছে।

কিন্তু কতকগুলো ব্যাপারে খটমটো লাগছে। কোনো মেয়ে নিজে এগিয়ে গিয়ে অচেনা ছেলে প্রেম নিবেদন করতে দ্বিধায় পড়ছে এখনও। ধরা যাক দ্বিধা কাটিয়ে উঠল। পরের দিন মেয়ে ছেলেটির হাত ধরে বলল না, 'তব করতল মোর করতলে হারা'। একটু নির্জনে পেয়ে টকা করে চুমু খেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা ছেলেটিকে বলতে পারল না, 'এই! রাগ করলে?'

কোনো দুর্দান্ত মেয়ে এইসব লজ্জা কাটিয়ে উঠে স্মার্ট গলায় যদি বলে, 'তোমার সঙ্গে বিবাহি

জীবন সুখের হবে কি না আমি বুঝতে পারছি না। তুমি সক্ষম তো?' ছেলেটি পালাবে। আবার মেয়েটি যদি খুলে কিছু না ব'লে প্রশ্রয় দেওয়ায় ছেলেটি যদি তাকে বিয়ের আগে বিছানায় নিয়ে যায়, মেয়েটি নিজেকে কি এখনও বউ বউ বলে ভাববে? নাকি বলবে, 'এটা হয়েই থাকে।'

চার

আজ সকালের ডাকে এক পাঠিকার চিঠি পেয়েছি। পুরুষজাতির ওপর তার ভীষণ রাগ। পুরুষ মানেই অসৎ, লম্পট। পুরুষ মানেই স্বার্থপর। একটি ছেলেকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল কিন্তু সে ওকে ভোগ করে অন্য মেয়ের সঙ্গে চলে গেছে। লিখেছে 'যদিও আপনি পুরুষ, তবু লেখক বলেই জানতে চাইছি, আমার কি প্রতিশোধ নেওয়া উচিত নয়?'

আমি ভাবতে বসলাম। এই যে ভোগ করার ব্যাপারটা, এটা কি ছেলেটি একাই করেছিল? সেই বসন্তবিলাসের সময়ে মেয়েটি কি একটুও আনন্দিত হয়নি? তাহলে কয়েক লক্ষ বছর ধরে মেয়েরা কেন বলে আসছে যে পুরুষরা ভোগ করে চলে যায়!

পাঁচ

চিঠির জবাব যদি এই রকম হয়—'প্রতিশোধ নিন। আপনিও আর একটি যুবককে ভোগ করে চলে আসুন। মরুক ব্যাটা হতাশায়!'

জানি না, এই সদুপদেশে মেয়েটি উদ্বুদ্ধ হবে কিনা!

মার্চ-এপ্রিল ২০০২

তেনারা আছেন, থাকে

ভদ্রলোক একগাল হেসে পাশে বসা সুন্দরীকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'আমার পরিবার

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা নিচু গলায় প্রতিবাদ করলেন, 'অদ্ভুত!'

ভদ্রলোক সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বললেন, 'মাই ওয়াইফ!'

ভদ্রমহিলা এবার আমার দিকে তাকালেন, 'উনি আমার স্বামী।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলালেন, 'ওই হল আর কি!'

ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, 'না। হল না। এক হয় না।'

বুঝলাম ভদ্রলোকের অস্তিত্ব বেশ বিপন্ন। এই আমার আমার করার অভ্যেসটা না পারা শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে না পারছেন ছাড়তে।

পৃথিবীতে যত লোক জন্মায় তার অধিকাংশই পেছনের দিকে থাকা পছন্দ করে। বরং লি বা জন্মমাত্র নেতা হন কেউ কেউ। এই নেতৃত্বকে সমালোচনা করার পেছনে একধরনের আ আছে। নিজের কিছু হারাচ্ছে না কিন্তু গালাগাল দিয়ে সুখ পাচ্ছি। নেতা হতে গেলে গালাগ খেতেই হবে। গান্ধীজির মতো বড় নেতা ভারতবর্ষে জন্মায়নি। অথচ ষাট দশক থেকে সিনেমাহ ডকুমেন্টারিতে গান্ধীজির ছবি দেখালেই তারস্বরে পাবলিক বিদ্রূপ করত। অনেক বৃদ্ধ বলে 'এই গান্ধীর জন্যে দেশটার বারোটা বেজে গেল। ব্রিটিশ আমলে বেশ ভালো ছিলাম আমর

কিন্তু কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের নেতা হওয়ার খুব শখ। যে-কোনো বিষয়ে কথা বলতে তাঁ জিভ সুড়সুড় করে। লোকে তাদের সামনে তোল্লা দেয়, পেছনে উপহাস। এঁদেরই বলা হয় গাঁ মানে না আপনি মোড়ল।

এখন সেই গাঁ নেই, মোড়লও নেই। যদি পঞ্চায়েত প্রধানকে মোড়ল বলা যায় তবে তাঁ ওই পদে আসতে হবে নির্বাচনের মাধ্যমে। ওই পদে বসতে হলে তাঁকে পেতে হয় সংখ্যাগরি রাজনৈতিক দলের সমর্থন। আর এখানেই তাঁর রক্ষাকবচ। চাও বা না চাও তোমাকে তাঁর কথ মানতে হবেই নইলে পার্টি তোমাকে একঘরে করে ছাড়বে।

তবে যে দল ক্ষমতায় থাকে না তার নেতাদের আচার-আচরণ ওই মোড়লের মতো। যদি গ্রামটা দেশ হয়ে যায়। লক্ষ্য করবেন, এক-একজন ক্ষমতাহীন নেতা যে যার নিজের মতো চিৎক করে চলেছেন। কেউ তাঁর কথা শুনছে না, শুনুক তাও তিনি চান না, কিন্তু চিৎকার না করা লোকে যদি তাঁকে ভুলে যায় তাই তাঁকে চ্যাঁচাতেই হবে। ধরা যাক, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচ সিদ্ধান্ত নিলেন, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া কাউকে পশ্চিমবাংলায় ঢুকতে দেওয়া হবে না। অমনি এ নেতারা চ্যাঁচাতে আরম্ভ করবেন। 'মানবতা বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী নিপাত যাক। নির্যাতিত হয়ে যা এদেশে আসছে তাঁদের বাঁচার সুযোগ কেড়ে নেওয়া চলবে না।' এরপর মুখ্যমন্ত্রী যদি সিদ্ধান্ত বদল

তাহলে এঁরাই আন্দোলনে নামবেন, 'বেআইনি বিদেশিদের এনে দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজানো চলবে না। অনুপ্রবেশকারী আনা হচ্ছে ভোটের জন্যে। চলবে না, চলবে না।'

আজ, স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বছর পরে দেশের মানুষ বুঝে গেছে যে রাজনৈতিক নেতারা যা বলেন তা শুনতে নেই। এঁরা যা করার করে যাবেন, আমাদের দিনদিন আরও খারাপ অবস্থার সামনে পড়তে হবে। এর থেকে নিষ্কৃতি নেই। ওঁরা মোড়লি করে যান, আমরাও না মেনে বসে থাকি। তবে একথা ঠিক, লোকে মানুক বা না মানুক মোড়লি করার সবচেয়ে ভালো রাস্তা হল রাজনীতি করা।

রাজনীতিতে কোটি কোটি টাকার খেলা আছে, তাই মোড়লি করার চেষ্টা থাকবেই। কিন্তু সামান্য টাকা বরাদ্দ, একটু সংস্কৃতির ছাপ আছে—এমন সব সংগঠনে ঢুকে পড়ে মোড়লি করার চেষ্টা তো অবিরত চলছে।

একজন প্রথম যৌবনে ভালো নাটক করার জন্যে চেষ্টা করেছেন। দু-তিনটে প্রযোজনা নামও করেছিল। তখন তিনি বামফ্রন্টের হয়ে রাস্তায় নামলেন পথ-নাটক করতে। ফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর তিনি কাকুতিমিনতি করে একটা সরকারি ফ্ল্যাটের মালিক হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দল উঠে গেছে। একে ওকে টেনে এনে নতুন নাটক নামাতে গিয়ে বুঝেছেন ওটা নাটক হচ্ছে না। অথচ তাঁর বেঁচে থাকতে হলে টাকার দরকার। আবার পথ-নাটকে নেমে গেলেন। এবার পুরস্কার হিসেবে পেয়ে গেলেন সরকারি নাট্য-উপদেষ্টার পদ, যার মাসমাইনে বেশ ভালো। এখন তাঁর দল উঠে গেছে। কিন্তু যে-কোনো সেমিনারে, টিভিতে নাটক নিয়ে আলোচনা হলেই তাঁকে গম্ভীর গলায় কথা বলতে দেখা যায়। নাট্যকর্মীদের অত্যন্ত অপছন্দের এই নেতার তাতে কিছু এসে যায় না। সরকারের প্রীতি পাওয়ায় তিনি নাট্য বিষয়ক মোড়লি চালিয়ে যাচ্ছেন।

আমাদের মাস্টারমশাই নারায়ণ গাঙ্গুলির একটা কথা মনে পড়ছে। তিনি নিজে শেষ জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন, কিন্তু তাঁর বড় পরিচয় ছিল ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পকার হিসেবে। শেষ লেখা 'সুনন্দর জার্নাল' যে আলোড়ন তুলেছিল তা আজও মনে আছে। নারায়ণবাবু বলেছিলেন, 'পত্র-পত্রিকায় বই-এর সমালোচনা যাঁরা লেখেন তাঁদের অধিকাংশই অধ্যাপক। খোঁজ নিলে জানতে পারবে এঁদের সকলেরই গল্প লেখার বাসনা ছিল। সেগুলো হালে পানি পাচ্ছে না দেখে সমালোচক হয়ে গেছেন এক-একজন। এখন এঁদের রায় আমাদের মানতে হবে।' মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে তর্ক করে উদাহরণ দিয়েছিলাম, যিনি কখনও জলে নামেননি তিনি বিখ্যাত সাঁতারের কোচ হয়েছেন। অবশ্য এরকম উদাহরণ খুব কম। আমাকে লেখক হতে দিল না, দাও ব্যাটার বারোটা বাজিয়ে—এই মানসিকতা নিয়ে কলম ধরতে অনেককে দেখেছি। ক্রমশ এঁদের কেউ কেউ সাহিত্যের মোড়ল হয়ে যান। এঁদের কাছে না পৌঁছতে পারলে তরুণ লেখকদের সম্পর্কে এক কলমও লেখা হবে না। সেদিন এরকম একজনের লেখায় প্রসঙ্গ ছাড়াই এক তরুণ লেখক সম্পর্কে সুখ্যাতি পড়তাম। পরে জানলাম বেচারা তরুণ লেখক কলকাতা থেকে ট্রেন ধরে নকুড়ের সন্দেশ কিনে নিয়ে প্রণামী দিয়ে এসেছিল ওই মোড়লকে। আমাদের কপাল ভালো, এই মোড়লি বাঙালি পাঠক আদৌ আমল দেন না। সমালোচনা পড়ে বই কেনেন না তাঁরা।

সেদিন টিভিতে বাংলা সাহিত্যের হালচাল নিয়ে একটা আলোচনা সভা বসেছিল। ছিলেন একজন অধ্যাপক যিনি গল্প লেখার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে সমালোচক হয়েছেন, একজন প্রকাশক আর লেখক হিসেবে যিনি ছিলেন তাঁকে আমি গত ছত্রিশ বছর ধরে দেখে আসছি। এই ভদ্রলোক বাকি দু'জনকে কথা বলতে দিচ্ছিলেন না, এমনকী অধ্যাপককেও নয়। সত্তরে পৌঁছে যাওয়া এই লেখক সারাজীবন গোটা চারেক ভালো গল্প লিখেছিলেন, তাও পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর আগে। বাকিগুলো তাঁর অবদমিত আকাঙ্ক্ষার ক্ষিপ্ত প্রকাশ। সরাসরি পর্নোগ্রাফি লেখেননি কিন্তু যৌনতার গন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া লেখা না লিখলে শান্তি পেতেন না। ক্রমশ তাঁর সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গ ত্যাগ করে

জুনিয়র লেখকদের দাদা হলেন, তারপর তাদেরও কমবয়সিদের অভিভাবক বনে গেলেন। দশক ধরে এই চালিয়ে যাচ্ছেন যিনি তাঁকে নিরানব্বই ভাগ বাঙালি পাঠক চেনেন না। কিন্তু ি এখন তাত্ত্বিক দাদা। টিভিতে শুনলাম, 'লিখছে? কে লিখছে? ওগুলো লেখা বলে নাকি। হ্যা 'না মশাই, আমাকে বলতে দিন। বাংলা সাহিত্যে শেষ কথা বলে গেছি আমরা। এই যে আ বললুম, কোন আমরা। আমার সঙ্গে যারা শুরু করেছিল তাদের কেউ কেউ বড় গাছে নৌ বেঁধে দিব্যি টাকাপয়সা মদ মেয়েমানুষ নিয়ে রসেবশে আছে। তাদের হাত দিয়ে এখন যে বের হচ্ছে তা বেলাকোবা গ্রামের কালীচরণ মুদির লিস্টির চেয়ে খুব বেশি দামি নয়। হে হে। একটা টিভি মিডিয়া, তবু বলি, এখন কোনো বৃক্ষ তো দূরের কথা, তরু পর্যন্ত নেই। এ সব ভ্যারেন্ডা গাছ।' এসব কথা বলে টিভি থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় প্রতীক্ষারতা এক কু একুশের বোকা-বোকা যুবতীকে বলবেন, 'ভরদুপুরে মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষ বলে মনে হয় যুবতী ফিক্ করে হেসে মুখ ফেরাবে, 'কী মনে হয়?'

'কলাগাছ। ছাড়িয়ে যাও আর ছাড়িয়ে যাও, নাই রস নাই।' তিনি হাসলেন, 'আজ শালা যা এক হাত নিয়েছি না! চলো একটা চায়ের দোকানে বসি।'

এই মানুষটি একজন মোড়ল। নির্বিচারে মোড়লি করে যাচ্ছেন।

আর এক ধরনের মানুষকে মোড়ল করে দেওয়া হয়। এবারের বইমেলায় লেখক-পাঠ মুখোমুখি অনুষ্ঠানে আমার নাম ছিল না। বছর কুড়ি ধরে বসে দেখেছি প্রশ্নগুলো প্রায় একই রকম তবু লিস্টটা দেখলাম। তার মধ্যে কয়েকটা আধচেনা নাম আর একটি সম্পূর্ণ অচেনা নাম পে উদ্যোক্তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইনি কে?' উত্তর হল, 'লেখেন।' 'কী লেখেন?' সেটা সঠিক জা না কেউ। কেন তালিকায় নাম উঠল তার দায় এ ওর ওপর চাপাচ্ছে। শেষপর্যন্ত জানা একটি বিশাল সংস্থা প্রতি বছর কয়েক লক্ষ টাকার বই কেনেন। এই ভদ্রলোক সেই কেনার দায়ি একটু-আধটু শখ আছে লেখালেখির। তাঁকে সন্তুষ্ট করতেই ওই আসরে বিখ্যাতদের পাশে বসা হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি ভাবেন ওঁর কোনো লেখা পাঠকরা পড়েননি অতএব প্রশ্ন করবেন করে, তাহলে ভুল ভাবা হবে। পাঠকদের হয়ে প্রশ্ন লেখা হয়ে গেছে। তা মাইকের সামনে হল, 'রহস্য উপন্যাস বলতে আপনি কী বোঝেন?' অথবা 'কল্প বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ কী?' ইনি জবাব দিলেন। কেউ ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'মালটা কে রে?' উত্তর হল, 'কোনো মো হবে হয়তো।' কিন্তু এর মোড়লি প্রকাশকরা মানতে বাধ্য। গাঁ মানুক বা না মানুক।

এই আমি, আমিই বা কম মোড়লি করছি কোথায়? 'পত্রপাঠ'-এ লেখা শুরু করার অ 'দেশ'-এর পাতায় কী দরকার ছিল একে ওকে যেচে গালাগাল দেওয়ার? দিয়ে কী লাভ হ আপনারা ভাবলেন, বেটা মোড়লি করছে অথচ কেউ মানছে না। তবে একটা সান্ত্বনা আছে। জেনেছিলাম বাংলা ছবির একটা সংলাপে। বছর পঁয়তাল্লিশ আগে দেখা ছবিতে সংলাপ ছিল, 'চরব তেল দেওয়া যার স্বভাব সে নিজের চরকা পরের চরকা বিচার করে না, চরকা পেলেই দেয়।'

একটু পালটে আমি বলতে পারি, 'মোড়লি করা যার স্বভাব সে স্থান-কাল-পাত্র বিচার ক না। চান্স পেলেই মোড়লি করে।'

মে ২০০২

বেশ আছি!

গত সপ্তাহে ঢাকায় গিয়েছিলাম হুমায়ুন আহমেদের আমন্ত্রণে। ছিলাম ওরই অট্টালিকায়। রাত্রে খানাপিনায় অনেকে আমন্ত্রিত ছিলেন। গল্পগুজব হচ্ছিল। হঠাৎ বিখ্যাত প্রকাশক আলমগীর সাহেব আমাকে প্রশ্ন করলেন, 'সমরেশবাবু, গুজরাতে যা ঘটল তাতে আপনাদের কোনো দায়িত্ব নেই? আপনাদের খারাপ লাগছে না?'

শুরুতে যাই হোক, এখন তামাম দুনিয়া জানে, গুজরাটে মুসলমানদের মারছে হিন্দুরা। প্রশ্নটি শুনে অস্বস্তিতে পড়লাম। জবাব দিতে হল, 'গুজরাটের ঘটনা একটি বিচ্ছিন্ন ব্যাপার। তার সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের মানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। এই দেখুন, গুজরাটে যা হচ্ছে তার কোনো প্রতিক্রিয়া পাশের রাজ্যগুলোতেও পড়েনি।'

আলমগীর বললেন, 'বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মানে কি? ওই একটা রাজ্যে দিনের পর দিন কিছু হত্যাকারী হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাবে আর আপনারা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার বলে সেটা চলতে সাহায্য করবেন? গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী হয় অক্ষম নয় তিনি এই দাঙ্গায় মদত দিচ্ছেন। তবু ওঁকে সরিয়ে দেওয়ার বা ওঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো চেষ্টাই আপনাদের কেন্দ্রীয় সরকার করল না। আর আপনারা তা মুখ বুঁজে মেনে নিলেন!'

আলমগীরের বলা শেষ হতেই হুমায়ূন খেঁকিয়ে উঠল, 'থামেন তো মিঞা। সমরেশদারা কী করবেন? আপনি কি চান উনি লাঠি বা পিস্তল নিয়া আহমেদাবাদে ছুইট্যা যাবেন? আমাদের এখানে যখন মন্দির ভাঙছিল তখন আপনি কী করছেন?'

হুমায়ূনের এখন একটি বিশেষ ধরনের মর্যাদা হয়েছে। বাংলায় গল্প-উপন্যাস লিখে সে দেশের একজন কেউকেটা। লোকে তাকে খুব মান্য করে। অতএব আলমগীর সাহেব চুপ করলেন।

কিন্তু প্রশ্নটা আমার মাথায় থেকেই গেল।

ভারতবর্ষের গঠন, এই দেশের সংবিধান, এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রিয়াকলাপ আদৌ সমর্থন না করলেও স্বীকার করতে বাধ্য, আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। আমার পাশপোর্টে কথাটা স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে। অতএব গুজরাট বা অসম, কেরালা বা পশ্চিমবঙ্গের কোনো তফাত আমার কাছে থাকা উচিত নয়। ধর্ম সম্মেলন ফেরত কিছু হিন্দুকে যারা ট্রেনের কামরায় পুড়িয়ে মেরেছে তারা জানত বিশ্বের প্রতিটি মানুষ এর প্রতিবাদ করবে এবং হিন্দুরা বদলা নেবে। কার্যত তাই হল এবং দীর্ঘদিন ধরে হচ্ছে।

কলকাতায় মাঝে মাঝে বিভিন্ন ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কাগজে চিঠি ছাপা হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিরা তাতে সই করেন। সাধারণত রাজনীতির গন্ধ-মাখা একই শিল্পী, পরিচালক, লেখকদের

নাম সেই প্রতিবাদপত্রের নিচে দেখা যায়। খোঁজ নিয়ে দেখেছি কিছু স্বেচ্ছাসেবক উদ্যোগী যোগাযোগ করে ওই প্রতিবাদ পত্রের ব্যবস্থা করেন। ব্যস, চুকে গেল। এবার গুজরাটের ঘ প্রতি ধিক্কার দিয়ে বিমান বসুর নেতৃত্বে মিছিল বেরিয়েছিল একটা। কয়েকটা অনুষ্ঠান হয়েছে ‍ প্রেক্ষাগৃহে। তার টিকিট বিক্রির টাকা সব খরচ মিটিয়ে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পাঠানো হ সেটা কুড়ি পঁচিশ হাজারের বেশি নয়। এইসব ঘটনা ঘটাবার আগে যে কমিটি তৈরি হয়ে তার অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি বিজ্ঞাপন দেখে। অবশ্য যে-কোনো মহৎ কাজই ঢাকঢোল গি কমিটি তৈরি করে করা সম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা যারা মানুষকে নিয়ে মানুষের জন্যে লেখালেখি করি তারা এতবড় কুৎসিত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো বিস্ফোরণ কি দেখা গেছে? মানুষ যেখানে আক্রান্ত সেখানে কি ে লেখক ছুটে গিয়েছেন? যদি যেতে না পারেন তাহলে বিভিন্ন কাগজ পড়ে শরীরে যে ঝিম আসে তার প্রতিফলন কি কোনো লেখায় ফুটে উঠেছে? আমরা এখনও নানান রকমের ছোটখাটো সমস্যার গল্প-উপন্যাস লিখতে ব্যস্ত।

গুজরাট দূরের কথা, মেদিনীপুরে যে জনযুদ্ধ গোষ্ঠী আজ আত্মপ্রকাশ করেছে, নিত্য মারা যাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে আলফা, বোরো, কামতাপুরী মিলেমিশে জঙ্গি আক্রমণের প্রস্তুতি শা আমাদের কার লেখায় এই সমস্যার কথা বলা হয়েছে? এখনও মালদা, শিলিগুড়িতে লা অনুগামীরা সভা করে, এখনও রামচন্দ্রের ভক্তরা সংবিধান বিরোধী কথাবার্তা বলে মানুষকে উে করতে চায় কিন্তু আমরা সে সবকে লেখার বিষয় করি না। এই আমরার মধ্যে আমিও এই যে করছি না, তাই যন্ত্রণা পাই। মাঝেমাঝে ভাবি, লেখালেখি বন্ধ করে দেব। না, আ কেউ নিষেধ করেনি লিখতে। কিন্তু আমার লেখায় যদি মুসলমান চরিত্র থাকে এবং সেই চা বলে—আমি রোজা করছি না, তাহলে যে সংখ্যায় ওই লেখা বের হবে সেই সংখ্যাটি বাং সরকার বাজেয়াপ্ত করবেন—এই ভয়ে শঙ্কিত থাকবেন সম্পাদক। অথচ বাংলাদেশে আমার বন্ধু রোজা করেন না এবং মুখে সেটা বলতেও সংকোচ বোধ করেন না। ত্রিপুরায় বাঙ অনুপ্রবেশী। ভারত সরকার ত্রিপুরা দখল করেছিল মহারানিকে ম্যানেজ করে। এই সত্যটি করতে কেউ চাই না। তাই তা নিয়ে লেখা অপরাধ। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ওপর অন্যতম লেখা লিখেছিলেন সমরেশ বসু। আদাব। যতদিন বেঁচে ছিলেন, দেশের রাজনীতি কখনও বা ক তাঁর লেখায় ফুটে উঠত। তিনিই শেষ। এখন আমরা সেইসব হরিণের পাল, যারা শত্রু জঙ্গলে মুখ ঢুকিয়ে ভাবি—বেশ লুকিয়ে আছি, বিপদ হবে না।

আচ্ছা, গুজরাটে মানুষ মানুষকে ধর্মের দোহাই মারছে। কিন্তু কলকাতায় ফিরদৌসের সঙ্গে ে অভিনয় করতে নায়িকাদের অসুবিধে হচ্ছে না। সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা, খেলোয় লেখকরা, চিত্রশিল্পীরা যে যার কাজে বেশ ব্যস্ত আছেন।

আগে এরকমটা হত না। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতায় ি বেরিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নাইট উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই। রাখি ব মধ্যে সেই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল।

আমি বারংবার বলে আসছি, স্বাধীনতার পর থেকে আমাদের যাবতীয় মূল্যবোধের মূষল শুরু হয়ে গিয়েছিল। নকশালদের অভ্যুত্থান ও পতন তার ধ্বংসের শেষ বাঁশি বাজাল। ও প বোম পড়ছে, এ পাড়ায় আমাদের কী? ওই ফুটপাতে একজনকে খুন করে লাশ ফেলে চলে গিয়েছে, তাহলে এই ফুটপাত দিয়ে চলো। পাশের বাড়িতে মেসোমশাই মারা গিয়েছেন, ত

থেকে বাড়ি এসো না, বাইরে দেখা করে রাত্রে রেস্টুরেন্টে খেয়ে ফিরব। নইলে তোমাকে শ্মশানে গিয়ে মাঝরাত পর্যন্ত কষ্ট করতে হবে।

নিজেকে গুটিয়ে গুটিয়ে এখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে আমাদের।

কিন্তু কথা বলতে দিন! কথায় আমরা উত্তর মেরুকে দক্ষিণ মেরুতে মিলিয়ে দিতে পারি। সেই কবে ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন, নগর পুড়িলে কি দেবালয় এড়ায়?

চারপাশে আগুন জ্বলছে, আমরা মাঝখানে বসে কতদিন আর সেই আগুনে দেওয়ালি দেখব?

জুন ২০০২

বই-ব্যবসা এবং

টাকাপয়সার সঙ্গে সাহিত্যের ভাসুর-ভাদ্দরবউ সম্পর্ক, একথা আমাদের এককালে বো হয়েছিল। যে লেখক টাকার জন্যে বই লেখেন তিনি কখনোই জাতে ওঠেন না। বোধহয় কারণে টাকার জন্যে না লিখেও টাকা পাওয়াটাও বেশ অপরাধ-অপরাধ ব্যাপার ছিল। তুমি সাহি সৎ সাহিত্য রচনা করবে, টাকা টাকা করবে না কক্ষনো। বই বিক্রি হলে প্রকাশক যদি দয়া কিছু দেন, তা-ই হাত পেতে নেবে। ব্যস।

হয়তো এই কারণে শরৎচন্দ্রকে এককালে বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীরা তেমন কলকে দিতে চাননি। অপ বাঙালি পাঠক মুড়ি-মুড়কির মতো ওঁর লেখা বই কেনে। যার বই আপামর জনসাধারণ খেয়ে গেলে, তিনি কিছুতেই উচ্চমানের সাহিত্য রচনা করতে পারেন না। কারণ উচ্চমানের সা সাধারণ পাঠকরা বুঝতেই পারে না। মুশকিল করতেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর নায়িকাকে বলালেন, একটা গল্প লেখো শরৎবাবু—! রবীন্দ্রনাথ বাজারি লেখক, একথা বলার সাহস বে উন্নাসিকের ছিল না। সেই রবীন্দ্রনাথ শরৎবাবুকে এতবড় জায়গা দিলেন? নতুন করে পড়ে দে হয় তার লেখা! এইরকম ভাব।

সময় এগিয়ে চলেছে কিন্তু ভাবনা এগোয়নি। এখনও বেশকিছু মানুষ একই কথা বলেন। বি করে যাঁরা লিটল ম্যাগাজিন করেন তাঁদের ধারণা অনেকটা ওইরকম। যার লেখা বেশি বিক্রি সে-ই বিকৃত লেখক। ওঁরা চিরকাল এস্টাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে, সর্বহারা অহংকার নিয়ে উ অনেকেই অবশ্য পরে ভুল বুঝতে পেরেছেন কিন্তু মচকেছেন, ভাঙেননি। কৃত্তিবাসের লেখ বলেছিলেন, কখনোই বড় কাগজে লিখবেন না, তাদের দেওয়া পুরস্কার নেবেন না। কিন্তু গেল বিখ্যাত হওয়ার লোভে সবাই প্রায় সুড়সুড় করে আনন্দবাজার বা যুগান্তরের সঙ্গে যুক্ত হ

গত পঞ্চাশ বছরে যাঁরা লিখে নাম করেছেন তাঁদের সবাই পত্রিকা থেকে টাকা পেয়েছে কলেজস্ট্রিটের প্রকাশকরা কিন্তু সবার প্রতি সদয় হননি। তাঁদের বই ছাপা হয়েছে কিন্তু উ করা সত্ত্বেও প্রকাশকরা পাঁচশো হাজারের বেশি টাকা দেননি। মিত্র ও ঘোষ প্রতি পয়লা বৈ তাঁদের লেখকদের কিছু টাকা দেন। সেটা পেতে অনেকেই সেদিন উপস্থিত হন। টাকার অ অবশ্য কেউ জানাতে চান না।

আবার এদের মধ্যে কয়েকজনকে টাকা দিতে পারলে প্রকাশকরা খুশি হন। কৃত্তিবাসের লে সম্পাদক সুনীল গাঙ্গুলি যদি আজ কোনো প্রকাশকের কাছে টাকা চান তাহলে তিনি কাছা নাচবেন। বছরের শেষ যে স্টেটমেন্ট আনন্দ পাবলিশার্স দিয়ে থাকেন তাতে সুনীল, শীর্ষেন্দু, বুদ্ধ গুহর এক বছরের পাওনা টাকা যে-কোনো আই. এ. এস অফিসারের বাৎসরিক মাইনের অ বেশি। এছাড়া অন্যান্য প্রকাশক, পত্রিকা, টিভি সিরিয়াল, যে টাকা দেয় তা কি এঁরা নেবেন প্রাপ্য টাকা ফেলে দেবেন?

নিচ্ছেন, নিজের টাকা নিচ্ছেন বলে যাঁদের চোখ টাটাচ্ছে তাঁরা কারা? অবশ্যই সেই সব মানুষ, যাঁদের জীবনে সাফল্য আসেনি। চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলেই অন্যের অর্থপ্রাপ্তিতে তাঁদের গাত্রদাহ।

কিছুদিন আগে একটা লিটল ম্যাগাজিনে এ ব্যাপারে বিশ্লেষণ পড়ছিলাম। লেখক লিখেছেন, 'বাজারি লেখকরা আসেন, তুবড়ির মতো জ্বলেন আবার ছাই হয়ে যান। যাযাবর এসেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিপাত সুপার ডুপার হিট। বাঙালি, বোকা বাঙালিরা গিলেছিল তাঁর লাইনগুলো। লেখক দু'হাতে কামিয়েছেন ব্যস। তারপরে মাল ধরা পড়ল। আর কোনো বই বিক্রি হয়নি। অবধূতের মরুতীর্থ হিংলাজ সম্পর্কেও ওই এক কথা বলা যায়। নিমাই ভট্টাচার্য মেমসাহেব লিখলেন। হইহই কাণ্ড। তারপরেও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু এখন কেউ ফিসফিসও করে না।'

ঘটনাগুলো অসত্য নয়। আমার বক্তব্য আপনি দয়া করে একখানা দৃষ্টিপাত বা মরুতীর্থ হিংলাজ অথবা মেমসাহেব লিখে দেখান তো! এঁরা বলবেন, অত খারাপ লেখা লেখার বাসনা নেই। মুশকিল হল ভালো বলতে এঁরা যা মনে করেন তার বিক্রি বছরে নব্বই কপি।

শংকর গত পঞ্চাশ বছর ধরে সমানে লিখে চলেছেন এবং এই বাংলায় তিনি সবচেয়ে জনপ্রিয় (অন্তত বই বিক্রির নিরিখে) লেখক। অন্তত গোটা দশেক বই সমান তালে জনপ্রিয় হলে এবং সময় পেরিয়ে গিয়েও থেমে না পড়লে তাঁর সম্পর্ক কী বলা যায়?

সুনীল গাঙ্গুলির প্রথম আলো, সেই সময়, পূর্ব-পশ্চিম-এর বিক্রি তো থামছে না। বিমল মিত্রকে ঠাট্টা করা হত—কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। বই-এর আয়তন নিয়েই ওই রসিকতা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের, বুদ্ধদেব গুহর জনপ্রিয়তম বই-এর পাতার সংখ্যা কড়ি দিয়ে কিনলাম-এর থেকে অনেক বেশি।

তাহলে এঁরা বাজারি লেখক? লেখক হিসেবে জাতের নয়? প্রশ্ন করলে উন্নাসিকরা চুপ করে থাকবেন। যেন শোকসভায় ঢুকেছেন। চাপ দিলে বলবেন, সুনীল তো বেসিক্যালি কবি। জাত কবি। শীর্ষেন্দু তো আর আগের লেখা লিখেছেন না। বুদ্ধদেব গুহ—!

আজ কাগজে একটা লেখা পড়লাম। কোনো একটি বই-এর সমালোচনা। মূল বইটি কেনার ইচ্ছে আছে। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীলদার ইতিহাস সম্পর্কিত রেফারেন্স পড়ে অখুশি হয়েছিলেন। সত্য বলে মনে হয়নি তাঁর। অনুজ কিছু লেখককে বলেছিলেন প্রতিবাদ করতে। তাঁদের একজন বলেছিলেন 'প্রতিবাদ তো করেছি। লিট্‌ল ম্যাগাজিনে লিখেছি, আপনার চোখে পড়েনি?' অর্থাৎ ওই প্রতিবাদের কোনো মূল্য নেই।

আজ কথাটা স্বীকার করা দরকার। বই যেহেতু একটি ব্যবসার মাধ্যম তাই তার লেখা থেকে বিক্রি পর্যন্ত টাকার অস্তিত্ব থাকবেই। এখনও কলেজস্ট্রিটে এই ব্যবসা চলছে পুরোনো চালে। বেশিরভাগ প্রকাশক নামি লেখকদের বই না পেয়ে সংকলন ছাপছেন। এতে সুবিধে হল মাত্র একশো টাকা দিলেই গল্পলেখকের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ।

কিন্তু নিয়মটা এমন হবে কেন? কোনো লেখকের কাছে যখন প্রকাশক বই চাইবেন, তিনি তো কয়েকটা প্রশ্ন করতেই পারেন—

এক, আপনি কত কপি বই ছাপবেন?

দুই, আমি কত টাকা পাব?

তিন, এই টাকা আপনি কীভাবে দেবেন?

প্রশ্নগুলো বেশিরভাগ লেখকই করেন না। প্রকাশক কত বই ছাপবেন তা জানার কোনো উপায় নেই। তাঁরা যা বলবেন তা-ই মেনে নিতে হবে। শতকরা কুড়ি বা পনেরো করে বই-এর দামের ওপর লেখক পান বলে কলেজস্ট্রিটের নিয়ম। সেই টাকা কখন লেখকের হাতে আসবে তার ঠিক নেই। ধরা যাক, কোনো লেখকের একশো টাকার বই এক বছরে পাঁচ হাজার কপি বিক্রি হল।

লেখকের পাওনা পঁচাত্তর হাজার অথবা এক লক্ষ। টাকাটা চাইলেই দু-তিন জনের বাইরের প্র চোখে অন্ধকার দেখেন। অগ্রিম চাইলে তো কথাই নেই।

তখনই লেখক খারাপ হয়ে গেলেন। অর্থপিশাচ, চামার। একজন তো বলেই ফেললেন, 'আ কাছে ঠিক হিসাব দিচ্ছি বলে ভাবছেন খুব লাভ করেছি? এই যে আপনার বই-এর পাশা আরও ন'টা বই ছেপেছি তার ছ'টার তো এক কপি বিক্রি হয়নি। কাগজ ছাপা বিজ্ঞাপন তে একই। আপনার থেকে যা পেয়েছি তা দিয়েই তো ওদের ধার শোধ করছি।'

প্রশ্ন করি, 'যখন জানেন বিক্রি হয় না, তখন ওগুলো ছাপেন কেন?'

'চালচিত্র জানেন?'

'সেটা তো প্রতিমার পেছনে থাকে।'

'ঠিক। চালু বই-এর পেছনে যদি ওইসব বই না থাকে তাহলে লোকে কী দেখবে? ও দোকান ন্যাংটো। কাউন্টার ভরাতে ওসব বই ছাপতে হয়।'

'তাই বলে লস্ দিয়ে ছাপবেন?'

'পাঁচ দশ বছরে পুশ করতে করতে যদি কিছু যায় তা-ই লাভ।' ব'লে হাসলেন, 'তবে কয়ে লেখক আছেন, যাঁদের বই দু'বছরে আট-ন শো কপি বিক্রি হয়। তাঁদের বই পরপর ছা

'লাভ থাকে?'

'না আট-ন'শো বিক্রি হলে লস হয় না। চালু বই-এর বিক্রি বাড়ে।'

'ওইসব লোকেদের টাকা দেন?'

'লাভ না হলে কোথা থেকে দেব?' প্রকাশক বললেন, 'দু-পাঁচশো ধরিয়ে দিই।'

'তার পরেও তাঁরা বই দেন?'

'কেন দেবেন না? এইটা ছাপা হয়ে গেল, বিজ্ঞাপনে নাম বের হল। বাড়িতে আলমারি ভ মারা যাওয়ার পর ছেলেমেয়ে বলবে বাবা কত বই লিখেছেন। তবে হঠাৎ কেউ যদি ফি সিরিয়াল করে বসে তাহলে আর দেখতে হবে না। আচ্ছা, এক কাজ করুন, আপনি মাসে হাজার করে নিন। ঠিক এক তারিখে পৌঁছে যাবে টাকা।'

'বছরে ছত্রিশ। কবে শোধ হবে? এর পরেও তো বিক্রি হবে।'

'আর একটা নতুন বই দিন। মোটা বই। কথা দিচ্ছি দেওয়া মাত্র পুরোনো টাকা শোধ দেব।'

এই হল ছবি। এবার ঢাকায় গিয়ে হুমায়ুন আহমেদের বাড়িতে এসব নিয়ে কথা হচ্ছিল। ব বলল, 'আপনি যদি কোনো বই ছাপতে না দেন তাহলে খুব অসুবিধে হবে?'

'মানে? বই বের হবে না?'

'না। বলবেন পাঠক চাইছে বলে আমার বই ছাপতে এসেছেন। তাহলে দশটা এডিশনে ঠিক করে আমার প্রাপ্য টাকা আগাম দিয়ে যান। তার পরে আর দিতে হবে না।'

'দূর! আমাদের ওখানে এসব শুনলে কেউ আসবে না।' হেসে বললাম, 'আমার বই নব্বই এডিসন হলেও ঠিকঠাক টাকা বাদলদা দিয়ে যাচ্ছেন, চল্লিশ পার হলেও ভানুদারা টাকা দিচ্ছেন। আমি ওঁদের কাছে ভালো আছি। যাঁদের কথা বললাম তাঁরা অবশ্যই সংখ্যায় কী করা যাবে।'

হুমায়ুন নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনি ব্যবসাদার নন। আজকাল মাস্টারমশাইরাও মাইনে নেন, বুনো রামনাথের দিন শেষ। কেরানিরা আন্দোলন করেন। লেখকরা কি অন্য গ্রহের

হুমায়ুন একথা বলতেই পারে।

আমাদেরও বলা দরকার।

জুলাই ২০০২

সাক্ষী থাকুন গোপালবাবু

দেবদেবী নিয়ে রসিকতা অথবা ব্যঙ্গ বোধহয় বাঙালি হিন্দুরাই করতে পারে। পারে, কারণ এখনকার অধিকাংশ বাঙালি আর হিন্দুত্বে আস্থাবান নয়। ছেলেবেলায় এক বয়স্কা প্রতিবেশিনীকে উত্তেজিত অবস্থায় বলতে শুনলাম, 'অদ্ভুত—আমার কপালেই জুটেছে? এ তো শালগ্রাম শিলা!' অভিযোগ স্বামী সম্পর্কে, কিন্তু বুঝতে আমার দেরি হয়েছিল। প্রশ্ন করতে শুনলাম, 'শালগ্রাম শিলা দেখিসনি? যেভাবে রাখবি সেভাবেই থাকবে। কোনো কম্মের নয়, আবার পুজোর সময় না রাখলে চলেও না। তোর মেসোমশাই হলেন সেই শালগ্রাম শিলা।'

পুরীর জগন্নাথদেবের কাছে পুজো দিতে, রথ টানতে লক্ষ লক্ষ মানুষ যান। অথচ রাগের সময় গালাগালি হিসেবে 'ঠুটো জগন্নাথ' বলতে কিন্তু বাঙালির বাধে না। ঈশ্বর-চিন্তায় তৃতীয় যে শব্দটি মনে এল সেটি হল সাক্ষীগোপাল। এই দেবতার অধিষ্ঠান উড়িষ্যায়। কিন্তু বাঙালি তাঁর নাম ব্যবহার করেছে যে অর্থে তা মোটেই সম্মানজনক নয়। শালগ্রাম শিলা বা ঠুটো জগন্নাথ যদি নেহাতই গালাগাল হয় তাহলে সাক্ষীগোপালের ব্যবহারে একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ, অবজ্ঞা যেন জড়িয়ে থাকে।

মিসেস নন্দীর প্রেমিকা হিসেবে অত্যন্ত খ্যাতি আছে। ক্লাবে, পার্টিতে অথবা প্রাপ্তির জায়গায় যখনই তিনি যান তখনই তাঁর স্বামীকে পাশে দেখতে পাওয়া যায়। এই ভদ্রলোক অত্যন্ত শান্ত, মুখে হাসি লেগে আছে। কখনো কখনো মিসেস নন্দী তাঁর কনুই ধরে দাঁড়িয়ে অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলেন। যেমন—

'গুড ইভনিং ম্যাডাম। দারুণ দেখাচ্ছে আপনাকে।' চাটুকারের নিবেদন।

'আর দারুণ! কী যে প্রব্লেমে আছি!' মিসেস নন্দী ডান হাত বাড়িয়ে স্বামীর কনুই জড়িয়ে ধরলেন। চোখমুখে সমস্যা ফুটে উঠল তাঁর।

'কেন? কী হয়েছে?' চাটুকার উদ্বিগ্ন।

'ম্যাকনিবার অ্যান্ড ম্যাকনিবারে হাবি একটা টেন্ডার সাবমিট করেছে কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা পাওয়া যাবে না।' নিশ্বাস ফেললেন ভদ্রমহিলা। তাঁর হাবি অর্থাৎ স্বামী মাথা দোলালেন।

'এটা কোনো সমস্যাই নয়। ম্যাকনিবারের এম. ডি. আমার ভায়রাভাই।'

'ওঃ কি ভালো! সত্যি?'

'হ্যাঁ! বাট ইউ লুক গ্রেট!'

'থ্যাঙ্কু। বেয়ারা কোথায়? হাবিকে একটা স্কচ দিতে বলুন না!'

চাটুকারের আদেশে বেয়ারা স্বামীকে স্কচের গেলাস ধরিয়ে দিলে মিসেস নন্দী বললেন, 'অ্যাই শোনো, তুমি ড্রিঙ্কটা এনজয় করো। আমি ওঁর সঙ্গে একটু আলাদা টেন্ডারটা নিয়ে কথা বলি। এখানে বললে কেউ না কেউ ঠিক শুনে ফেলবে।'

'ওঃ, সিওর।' স্বামী মদে চুমুক দিলেন,—'চিয়ার্স।'

'চিয়ার্স।' বলে মিসেস নন্দী চাটুকারের দিকে তাকালেন,—'চলুন, আমরা ওই নির্জন কোণে কথা বলি, কেমন?'

দূরের টেবিলে বসা দু'জন লোক ওদের লক্ষ্য করছিল। একজন বলল, 'এই নন্দীটা এক নম্বর ভেড়ুয়া। ওর বউ ওকে সাক্ষীগোপাল করে রাখে বুঝতেই পারে না।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'পারে। কিন্তু বলে না।'

'পাকড়াশি কোণে নিয়ে গেল মিসেস নন্দীকে। এবার চিবিয়ে খাবে।'

'চিবোবে কিন্তু খেতে পারবে না।'

'কেন?'

'মিসেস নন্দী হলেন সেই বৃদ্ধা খাসির মতো যার মাংস এখন ছিবড়ে। চিবিয়ে শেষ করা না। মাঝখান থেকে নন্দীর টেন্ডার অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে।'

এরকম সাক্ষীগোপালদের সংখ্যা দিনদিন বাড়বে। বউ মক্ষিরানিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হতে চাইছে আর স্বামী নির্লিপ্ত, যেন সমুদ্রের ঢেউ দেখছেন।

আজকাল স্টুডিয়োপাড়ায় বা প্রযোজকদের অফিসে কিশোরী বা যুবতী মেয়েকে নিয়ে সুন্দরী মায়েদের প্রায়ই আসতে দেখা যায়। একটু সুযোগ, একটা নায়িকার চরিত্র মেয়েকে দেওয়ার জন্যে তাঁরা ঝুলোঝুলি করেন। কোনো প্রযোজক মেয়ের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে চাইলে উদার হয়ে বাইরে গিয়ে বসেন এমন ভঙ্গিতে যে মেয়ে ভেতরে পরীক্ষা দিচ্ছে আর তিনি গার্ডিয়ান হিসেবে বাইরে অপেক্ষা করছেন। এঁদের সাক্ষীগোপাল বলতে কারও নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

স্কুল বা কলেজে ব্যক্তিত্বহীন হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপালের অভাব নেই। দেখা যায় সেই কোনো শিক্ষক এই সুযোগটাকে কাজে লাগান। হেডমাস্টার বা প্রিন্সিপালকে সাক্ষীগোপাল দিয়ে তাঁরই বকলমে তিনি ছড়ি ঘোরান।

সাক্ষীগোপালদের কি কোনো দুঃখ বা আপশোস থাকে? মনে হয় না। কোনো কাজ হচ্ছে না অথচ সবকিছু তাঁর নামেই হচ্ছে, এতেই আনন্দিত তাঁরা। আপশোস মনে এলে তো আর সাক্ষীগোপাল থাকতেন না।

তবে সাক্ষীগোপালও মাঝে মাঝে মানুষ হয়ে যায়। তখন বিপদ। শিশু রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে মৃত রাজার দূরসম্পর্কের আত্মীয় রাজ্য চালাচ্ছিল। কিন্তু একটু বড় হতেই রাজপুত্রকে শূলে চড়াল, এরকম ঘটনা ইতিহাসে আছে।

ভারতবর্ষের সংবিধানে রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতির যে ভূমিকা, তা নিয়ে অনেকের দ্বিধা আছে। এঁদের মুখ বন্ধ করে থাকতে হয়। নির্দিষ্ট দিনে প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদিত ভাষণ রাষ্ট্রপতিকে পড়তে হয়। একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর দল যদি গরিষ্ঠতা হারায় তাহলে তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। বাকি দিনগুলোয় তাঁর নামে রাষ্ট্র চলে অথচ তাঁর ভূমিকা দর্শকের।

অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রপতিকেও মাঝে মাঝে সাক্ষীগোপালের ভূমিকায় অভিনয় করতে বাধ্য করে সংবিধান।

মিস্টার নন্দীদের এটুকুই সান্ত্বনা।

আগস্ট ২০০২

লাল শায়ায় ইস্ত্রি

কোনটা শ্লীল কোনটা অশ্লীল তার পার্থক্য একদল চটপট করে ফেলেন, একদল ধন্দে পড়েন। বলেন, কার মন কীভাবে নেবে সেটা তার মনের ওপর নির্ভর করছে।

একসময় গুরুজনের সামনে 'শালা' শব্দটা আমরা উচ্চারণ করতে পারতাম না। সেটা তাঁদের কানে অশ্লীল শোনাত। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তো বটেই, কল্লোলের অনেক লেখকও 'শালা' শব্দটি লেখেননি। অন্তত গালাগাল হিসেবে ব্যবহার করেননি। এখন শালা অত্যন্ত নিরীহ শব্দ। অনেক মহিলা বিরক্তি প্রকাশের সময়ে সহজেই উচ্চারণ করেন। অল্পবয়সিরা তো বটেই, আমেরিকাবাসিনী এক প্রৌঢ়া সেদিন বলছিলেন, শালা বড় হয়ে গেছে তবু এখনও ছোঁকছোকানি গেল না। ওঁর মনেই হয় না শব্দটা অশ্লীল। আমরা যারা প্রকাশ্যে মেয়েদের সিগারেট খেতে দেখতে অস্বস্তি বোধ করি তাদের কানে অবশ্য খট্ করে লাগে। অথচ শালার বদলে এখন রাস্তাঘাটে অনর্গল যে শব্দটি ছেলেরা ব্যবহার করে তা পুরুষাঙ্গের দু'অক্ষরের প্রতিশব্দ। আমার বাড়ির রকে তো মিনিটে একবার উচ্চারিত হচ্ছে। বিরক্ত হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে জানতে পারলাম, শব্দটা যে অশ্লীল তা ওরা জানেই না। কেন খারাপ কথা বলছ, জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিল, কোনো খারাপ কথা ওর বলছে না। এক বন্ধু আমায় বোঝালেন, মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশ, যেমন, হাত পা মুখ গলা যদি অশ্লীল না হয় তাহলে ওই শব্দটি কেন অশ্লীল হবে? ঢাকা থাকে বলে? তাহলে তো 'স্তন' শব্দটি অশ্লীল হয়ে যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ যদি মনে করতেন স্তন অশ্লীল তাহলে নিশ্চয়ই লিখতেন না। এরাও পুরুষাঙ্গের প্রতিশব্দটিকে অশ্লীল বলে মনে করছে না। অশ্লীল হলে মানুষ কেন বহন করবে?

অর্থাৎ, বন্ধুবর আমার শ্লীল এবং অশ্লীল ভাবনাকে গুলিয়ে দিলেন।

মহাভারতের পাতায় পাতায় যৌনবিহারের কাহিনী। এই অপ্সরা অমুক মুনিকে প্রলুব্ধ করেছেন, ওই দেবতা মর্ত্যের এই মহিলার সঙ্গে এসে শুচ্ছেন, কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কখনও তাদের সংগমের বিস্তৃত বিবরণ কোথাও নেই। এবং প্রতিটি মিলনের পরে যে সন্তান আসছে সে কোনো-না-কোনো ইতিহাস তৈরি করছে। সেখানে অশ্লীলতা প্রাধান্যই পাচ্ছে না। নগ্ন শরীর অশ্লীল নয়, সেই শরীরে ঢেউ তুললে বা মোজা পরালে অশ্লীলতা দেখেন অনেকেই। কিরণময়ী দিবাকরকে চুমু খেতে পারে, এটা অশ্লীল নয়, কিন্তু খাওয়ার পরে খিল খিল করে হেসে ওঠাটা নাকি অশ্লীল। ঠিক বুঝতে পারি না।

তরুণ বয়সে লেডি চ্যাটার্লিস লাভার পড়েছিলাম অশ্লীলতার সন্ধান করতে। তেমন খুশি হইনি। সমরেশ বসুর বিবর, প্রজাপতি, পাতক, বুদ্ধদেব বসুর রাতভোর বৃষ্টি পড়ার সময় সাহিত্য ছাড়া অন্য কিছু মনে আসেনি। যেসব মামলা হয়েছিল সেগুলোকে হাস্যকর মনে হত আমার, যিনি মামলা করেছেন তিনি তো ওইসব উপনাসের পাঁচটা লাইনও কক্ষনো লিখতে পারবেন না। প্রয়োজন

হলে নিশ্চয়ই সংগমের কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু যা সবাই জানে তার বর্ণনা দেওয়ার শিল্প নেই। বাংলা সাহিত্যের সম্পদ ওই বইগুলোর মধ্যে যাঁরা অশ্লীলতা খুঁজেছেন তাঁরা বাতিব মানুষ।

কলেজে পড়ার সময় এক সহপাঠীকে গোপনে বই পড়তে দেখেছিলাম, স্কটিশের সামনে হেদ নির্জন দুপুরে সে তন্ময় হয়ে বইটি পড়ছিল। হঠাৎ গিয়ে পড়ায় লুকোবার চেষ্টা বিফল হও স্মার্ট হয়ে বলেছিল, 'বই পড়ছি। বই পড়া তো অপরাধ নয়।' এখনও মনে আছে, বইটির ছিল 'লাল শায়া'। কোনো মলাট নেই। কোথায় ছাপা হয়েছে তার নির্দেশ নেই, শুধু লেখা চিৎপুর, কলিকাতা। প্রথম লাইনেই ছিল বউদি ঠাকুরপোকে তার লাল শায়া দেখাচ্ছে। চতুর্থ ল থেকে তাদের যৌন মিলনের বর্ণনা যাবতীয় অকথ্য শব্দ সঞ্চয় করে বর্ণনা করা হয়েছিল। কয়ে লাইন পড়ার পর শরীর ঘিনঘিন করে উঠেছিল। সহপাঠী গর্বিত গলায় বলেছিল, সে দৈনিক টাকা ভাড়ায় বইটি এনেছে। দশ টাকা জমা রাখতে হয়েছে।

সেই প্রথম এবং শেষ। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওই ধরনের বই আমি চোখে দেখি বাংলা ভাষায় যে ওইরকম শব্দাবলি লিখে ছাপা যায় তা জেনে খুব কষ্ট পেয়েছিলাম। অ পরে মাস্টারমশাই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বইটির উল্লেখ করেছিলাম। মাস্টারম বলেছিলেন, 'এটা অস্বাভাবিক নয়। অনেক অবিবাহিত পুরুষ বার্ধক্যে পৌঁছেছেন অথচ তাঁদের জী নারী না আসায় এই বইগুলো পড়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। আবার অনেক বিবাহিতা পুরু মনে অবদমিত বিকৃত আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল যে বইগুলো তাদের শান্ত করে। ধরে নাও যে-কা পতিতাপল্লির উদ্ভব, এই বইগুলোও সেই কারণেই ছাপা হয়ে থাকে।'

এতদিন তো এসবই জানতাম। জীবনে যা ঘটে তা-ই সাহিত্য নয়। জীবনের মা যেভাবে ব সাহিত্যের মা সেভাবে কাঁদলে আর যাই হোক শিল্প হয় না। সেদিন একজন বড় প্রকাশক হা হাসতে বললেন, 'বাঃ, জীবনে যা ঘটছে, যা স্বাভাবিক, তা গল্প-উপন্যাসে লিখলেই খাই খাই উঠবে কেন? তাহলে জীবনে ওগুলো ঘটাবেন না।'

তিনি যে অশিক্ষিত, কিছু বোঝেন না, এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। ধরা যাক, এক লেখক যে গল্প লিখছেন তার কেন্দ্রীয় চরিত্র কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে। চরিত্রটি টয়লেটে গেল। কমে অর্ধনগ্ন হয়ে বসল। এবং তারপর তার প্রয়াস যদি লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করে চলেন এম তার শরীর থেকে নির্গত মলের রং, আকৃতি এবং পরিমাণের বিস্তৃত বর্ণনা লিখতে থাকেন তা সেই গল্পকে সাহিত্য বলা হবে? আমরা সবাই পিতামাতার শারীরিক মিলনের কারণে পৃথিবী এসেছি। এই সরল সত্য নিয়ে আমরা কেউই মাথা ঘামাই না। কেউ পিতা বা মাতাকে প্রশ্ন না—সেই মিলনের সময়টা কখন ছিল? দিনদুপুর না সন্ধে অথবা শেষ রাত? আমরা জান চাই না মিলনের সময় কার কী ভূমিকা ছিল। এই জানতে চাওয়াটাই পৃথিবীর অশ্লীলতম কা একটা। আমরা বাবা-মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ থাকি এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য। আবার আম যখন বাবা-মা হয়ে সন্তানের জন্ম দিই তখন নিজেরাই ভুলে যাই ওই মিলনের কথা, তৃপ্তির আন বুঁদ হয়ে থাকি।

মনে আছে বনফুল নবকল্লোল পত্রিকায় 'হাটে বাজারে' উপন্যাস লিখেছিলেন। তাতে 'আ দোষ' শব্দ দুটি ছিল। তাতেই সে সময় অনেকে বিরক্ত হয়েছিলেন। এঁরা বয়সপন্থী। অধিক পাঠকই কৌতুক বোধ করেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু 'রাত ভোর বৃষ্টি'র শুরুতেই 'ওটা হয়ে গে বলে যে কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন তার অর্থ ধরে নিয়ে কিছু বাঙালি পাঠক চেঁচিয়েছিল। হাংরি কথা ছেড়ে দিলাম, শক্তি চট্টোপাধ্যায় যখন লিখেছিলেন 'পোঁদে মারব লাথি', তখন সেটাকে এক খারাপ লাগেনি, কারণ তার আগের লাইনে ছিল, 'চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয়।'

কিন্তু লেখার হাত আছে, কলমে জোর আছে, চমৎকার চরিত্র বিশ্লেষণ করতে পারেন, পাণ্ডিত্যে

পরিচয় দিতে যিনি সক্ষম, এমন একজন লেখক যদি হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে যৌনমিলনের বিস্তৃত বিবরণ লিখতে শুরু করেন, শুধু চরিত্রের মুখ দিয়ে নয়, লেখক হিসেবে বর্ণনা করার সময় ওইসব শব্দ অনায়াসে লিখে যেতে পারেন, তাহলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, তিনি আমার সেই সহপাঠীকে চাইছেন, যে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর বই পড়বে। হয় কিনে নয় ভাড়া নিয়ে। বাংলা সাহিত্যের এতকালের ইতিহাসে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। আর সেই লেখা প্রচারিত করার জন্যে প্রকাশক যদি চোখে ঠুলি আর পিঠে কুলো বেঁধে মাংসওয়ালার হাসি হাসেন তাহলে তো কথাই নেই।

এই ক্ষেত্রে শ্লীল-অশ্লীলের লড়াই-এ এঁদের জিত হবে। এঁদের প্রতিনিধি আদালতে গিয়ে সওয়াল করবেন, 'ধর্মাবতার, আমাদের বাবা-মা যদি ওই কর্ম ঠাকুরদা বেঁচে থাকতে করতে পারেন তাহলে আমরা লিখলেই অন্যায় অশ্লীল হবে? তাহলে দয়া করে বাবা-মাকে শাস্তি দিন, কারণ তাঁরাই তো প্রথমে অশ্লীল কর্ম করেছেন।'

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০২

লু

সেদিন একটি সমীক্ষা করেছিলাম। পরিচিত দশজন মানুষকে প্রশ্ন করেছিলাম যে যদি তাঁদের টাকা দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা তাঁদের বাঁ হাতটি চেনে বেঁধে রাখা একটি ক্ষুধার্ত বাঘের মু সামনে রাখতে পারবেন কি না। বাঘটি এমনভাবে বেঁধে রাখা হবে যাতে সে কোনোভাবেই ব্য ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে এবং একমাত্র ওই হাতটি ছাড়া অন্য অঙ্গ স্পর্শ করতে না প দশজনের মধ্যে একজন এ ব্যাপারে মন্তব্য করেননি। ন'জন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, টাকার পরি কত? আমি পাঁচ হাজার বললে সবাই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। টাকার অঙ্ক দশ থেকে পঞ পৌঁছলে মন্তব্য শুরু হল—বাঘটা যদি হাতটা খেয়ে ফেলে, তাহলে সারাজীবন অঙ্গহীন হয়ে থা হবে। পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে হয়তো বিশ হাজার যাবে চিকিৎসা করাতে। তিরিশ হাজারের অঙ্গহীন হওয়ার কোনো মানে হয় না। আমি তখন টাকার অঙ্ক বাড়াতে লাগলাম। দেখা তিন লক্ষ পেলে পাঁচ জন, পাঁচ লক্ষ পেলে দু'জন, দশ লক্ষ পেলে একজন এবং শেষতম র রাজি হলেন বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে হাত খোয়াতে। তখন আমার শর্ত হল, বাঘের মু সামনে হাত নিয়ে গেলেই হবে না, বাঘ যদি হাত আক্রমণ করে তবেই টাকাটা পাওয়া য তাঁরা জানালেন, বাঘ যদি বৈষ্ণব হয়ে যায় তাহলে তাঁরা তাকে এমন উত্যক্ত করবেন যে হাতের মাংস কামড়াতে বাধ্য হবে।

অর্থাৎ তিন থেকে কুড়ি লক্ষ টাকার বিনিময়ে দশজনের মধ্যে নয়জন মানুষ নিজের হাত খোয় রাজি। এক্ষেত্রে মানুষের লোভ পর্যায়ক্রমে চেহারা বদলেছে। এক হাজার টাকা ঘুষ দিতে চা যে অফিসার উপেক্ষা করতে পারেন তিনি দু'লক্ষ টাকা ঘুষ পেলে কী করবেন তা বোঝা য না।

সেদিন আমার বন্ধু বলছিলেন, তিনি এক-কার্টুন বিদেশি সিগারেট কিনেছিলেন কিন্তু তার প্যাকেটের হদিশ পাচ্ছেন না। তাঁর সন্দেহ চাকরকে এবং পনেরো বছরের ছেলেকে। তাঁর স্ত্রী তাঁ দোষী করলেন—সতর্ক হয়ে না রাখলে তো এই অবস্থা হবেই। শেষ পর্যন্ত যখন প্রমাণ পে ছেলেই প্যাকেট সরিয়েছে, তখন তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে গিয়ে শুনলেন, ওর সামনে প্যা ফেলে রেখে তিনি ওকেই লোভী করে তুলেছেন।

কথাটা আমার মনে ধরল। আমাদের যার যা আছে তা যদি আমরা আমাদের ট্যাকে বা শরী অন্য কোথাও তালাচাবি দিয়ে না রাখি তাহলে দোষ তো আমাদের। সেটা করার পর দে হবে, অন্য লোকজন অসতর্ক আছে কি না। থাকলেই হাতিয়ে নাও। 'ছবি করতে চাই' বলে এফ ডি সি-র কাছে যখন টাকা চাইব তখন নিজের জন্যে কত সরিয়ে রাখব তা আগে ভাবতে হবে। চল্লিশ লাখ বাজেট দিয়ে অর্ধেক ছবি শেষ করে যদি বলি, সৎ শিল্পের জন্যে দরবৃদ্ধির কারণে আর কুড়ি লক্ষ টাকার দরকার, তখন, আমার নামের পাশে যদি এ বি সি থাকে, তাহলে এন এফ ডি সি-কে ঢোঁক গিলতেই হবে এবং টাকাটা আমি পাব। একই ব্যা

সরকারের পয়সায় ছবি করার সুযোগ পেলে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টাকায় ছবি করতে গিয়ে আগে ফ্ল্যাট বুক করেছেন, এমন পরিচালক সম্ভবত আছেন। কয়েক বছর আগে হঠাৎ উদার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপেক্ষিত লেখকদের অনুদান দিয়েছিলেন বই ছাপতে। ছাপার জোয়ার চলেছিল। যে বই ছাপতে দশ হাজার লাগে তার পৃষ্ঠাসংখ্যা কমিয়ে পাঁচ হাজারে ছাপা হয়েছিল। হাজার কপি ছাপাতে চুক্তি হলেও পাঁচশোর বেশি ছাপা হয়নি।

একে ঠিক লুটপাট বলা যাবে কি না জানি না তবে লুটপাটের একটা নমুনা সেদিন দেখলাম। চব্বিশ ঘণ্টার বন্‌ধ ডাকা হয়েছিল। তাতে সব ট্রেন বাতিল। হঠাৎ ডাকিয়েরা উদার হয়ে সেটাকে বারো ঘণ্টায় নামিয়ে আনতে সন্ধ্যা ছটায় বন্‌ধ শেষ হল। সমস্ত ট্রেনের টিকিট আগেই বাতিল হলেও রাতের ট্রেনগুলো ঠিক সময়ে আবার যাত্রা শুরু করবে বলে স্থির হল। ট্রেন ফাঁকা। শেষ সময়ে খবর পেয়ে যেসব যাত্রী স্টেশনে উপস্থিত তাদের দিকে তাকিয়ে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে চলেছেন। ট্রেন ফাঁকা অথচ বলে চলেছেন সিট নেই, বর্ধমানের যাত্রীরা নাকি সিট বুক করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন এই শর্তে, ওই এলোমেলো পরিস্থিতিতে তাঁকে লুটেপুটে খেতে দিতে হবে।

এলোমেলো করে দিলে লুটেপুটে খাওয়া সম্ভব হয়। দেশে যখন যুদ্ধবিপ্লব হয়, সরকার থাকে না, সংসার যখন কর্তাবিহীন তখন মানুষের ইচ্ছে হয় নিয়ম ভাঙার। এটা বুঝি। সব থাকা সত্ত্বেও কিছু মানুষের অদম্য বাসনা লুটেপুটে খাওয়া। এই খাওয়ার পদ্ধতি আবার নানান রকম। আপনি নামি পত্রিকার গল্প-সম্পাদক। আপনি ইচ্ছে করলে একজন তরুণ লেখকের গল্প ঘন ঘন ছাপতে পারেন। দেখা যাবে, আপনি যখন ছুটির সময় অফিস থেকে বেরোচ্ছেন তখন পাঁচ-সাতজন তরুণ লেখক আপনাকে ঘিরে রয়েছে। আপনি কফিহাউস বা রেস্টুরেন্টে বসলেন, ওরাও সঙ্গী হল। বয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে বিল মেটানো আপনার কর্তব্য কিন্তু ওরা তো সেটা কিছুতেই হতে দেবে না। আপনার ভালো আদ্দির কাপড় চাই, ওরা এনে দিচ্ছে। সকালে যারা বাড়িতে হাজির হয় তারা শুধু আপনার ইশারার জন্যে প্রস্তুত, সঙ্গে সঙ্গে বাজার করে এনে দেবে। এগুলো পেতে পেতে আপনি এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে, ভাবছেন, অবসর নেওয়ার পর যদি আরও কয়েক বছর এক্সটেনশন পান তাহলে মেয়ের বিয়ের সময় বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করতে হবে না। লুটেপুটে খাওয়ার এটাও একটা পদ্ধতি।

শেষ করি একটা গল্প দিয়ে। ভদ্রলোকের বাজে খরচ করার অভ্যেস ছিল না। ওঁর স্ত্রীর চোখে উনি কঞ্জুস। একটা টাকাও মহিলা ভদ্রলোকের নজর এড়িয়ে নিতে পারতেন না। মধ্যবয়সে এসে ভদ্রলোকের পদোন্নতি হওয়ায় এমন কিছু সঙ্গী পেলেন যাঁরা সন্ধের পর ক্লাবে সময় কাটান। তাঁদের সঙ্গ পেতে ভদ্রলোক মদ ধরলেন। অভ্যেস না থাকায় অল্পেই বেসামাল হয়ে যেতেন। বাড়ি ফেরার পর টাকাপয়সার ব্যাপারে হুঁশ থাকত না। পরদিন সকালে ব্যাগ খুলে হিসেব মেলাতে পারতেন না। ভাবতেন ক্লাবেই খরচ করেছেন। স্বামী মদ ধরার পর মহিলা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন আত্মীয়স্বজনদের জানাবেন। কিন্তু এলোমেলো হয়ে বাড়ি ফেরা স্বামীর মানিব্যাগ হাতে পেয়ে সেই ইচ্ছে উবে গেল। মনে মনে বললেন, 'রোজ এরকম এলোমেলো হয়ে এসো গো, আমি একটু লুটেপুটে খাই।'

মুশকিল হল, স্ত্রীরা খেয়ে হজম করতে পারেন না। বাপের বাড়ির লোকজন এত উপহার পেতে লাগল যে খবরটা ভদ্রলোকের কানে পৌঁছতে দেরি হয়নি। তৎক্ষণাৎ টাকার বদলে ডেবিট অথবা ক্রেডিট কার্ড মানিব্যাগে রাখতে শুরু করলেন ভদ্রলোক। তখন মহিলার আপশোস, 'থাকলে তো লুটব, এলোমেলো হয়ে লাভ কী আমার!'

ন্যুইয়ারের ইয়

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বন্ধুবান্ধব। আনন্দবাজারের পাতায় ওঁর লেখা পড়ে অনেককে বি মন্তব্য করতে শুনেছি। ওঁর লেখায় যৌনতার গন্ধ পান তাঁরা, গন্ধ না বলে সুড়সুড়ি বলাই ভা একটি ব্যাপক প্রচারিত দৈনিক কাগজে শ্লীলতার সীমা ছাড়ানো লেখা কী করে ছাপা হয়, তাঁদের প্রশ্ন।

রঞ্জনের হাতে লেখা আছে। তাঁর শব্দের ব্যবহার এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ দেখে আমি হই। আমরা যেখানে আলু বেগুন আর কাটাপোনা নিয়ে সমস্যার পোকা বাছছি ও তখন উচ্চবিত্ত ফেনিল, স্বপ্ন-স্বপ্ন জীবনের গল্প শোনাচ্ছে। বাহ্।

শীল অশ্লীলতার মধ্যে চীনের দেয়াল তো ভেঙে চুরমার। সাম্প্রতিক একটি উপন্যাসের পাঁ পাতার মধ্যে একশো পাতায় যে যৌনজীবনের বিবরণ তা আমাদের তরুণ বয়সে গোপনে কি হওয়া মলাটবিহীন 'লাল কাঁচুলি' জাতীয় বইকেও শিশু বানিয়ে দিয়েছে। যেহেতু বাকি চারশো পা সাহিত্য রয়েছে তাই ওই একশোকেও শ্লীল বলতে হবে। পত্রিকায় ছাপা হওয়ার সময় বা বই বে গেলেও কাউকে মন্তব্য করতে শুনছি না। যেসব পাঠক ওই উপন্যাসের ছাপা-সময়ে পত্রিকা বাি রাখতে না পেরে বন্ধ করেছিলেন তারা ছাপা শেষ হলে আবার হকারকে বলেছেন দিয়ে যে যেহেতু রঞ্জন দৈনিক কাগজে লিখছেন এবং ফিচারকে সাহিত্য বলতে অনেকের আপত্তি তাই । সুন্দরীদের রানি নেশাকে নিয়ে কলকাতায় উচ্চমার্গের রেস্তোরাঁ নিশিবাসর বা নৃত্যশালার আলোআঁ যা রঞ্জন একের পর এক তাঁর কলমে ফুটিয়ে চলেছেন তাকে মেনে নিতে বাঙালি পাঠককুল প্রকা পারছেন না।

আমি মফস্‌সল থেকে এসেছি। নাইট লাইফ অফ প্যারিস বা ইভনিং ইন লন্ডন পড়ে হত কলকাতার রাত-জীবন নিশ্চয় ওইরকম। এতগুলো বছর রাত কাটিয়ে যে কলকাতাকে দে তা হল ভিখিরির বা খদ্দের না-পাওয়া ম্লান বারবনিতার কলকাতা, সারারাত ধরে শাস্ত্রীয় সংগী আসর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বা বসে শোনা কলকাতা, যার আগাগোড়াই নিরামিষ। রঞ্জনের লে এই প্রথম আমিষের সন্ধান পেলাম। একসময়ে পকেটে রেস্ত থাকলেও এই কলকাতাকে পা যেত না, কারণ বিনোদনের এই উপকরণ তখনও এই শহরে আসেনি। যাদের দুঃসাহস থা তারা লাল-এলাকায় ঢুকে পড়ত চুপিসাড়ে। আমি একজন অর্থবানকে জানি যিনি শুধু মদ খাও জন্যে লাল এলাকায় যেতেন। সেসময় বাড়িতে মদ খাওয়ার কথা ভাবা যেত না। পার্কস্ট্রি বারগুলোর সাহেবি কেতায় ভদ্রলোক স্বস্তি পেতেন না। পঁচিশ বছর ধরে পান করতে লাল এলা গিয়েও একটিবারও রমণীর শরীর স্পর্শ করেননি। শুনে আমি চমকে উঠতেই উনি নিম্ন বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, ওরা খুব রেগে যেত। বলত, অপমান করেছি। সত্যি, ব্যাপারটা অশ্লীল।'

দ্বিতীয়বার চমকেছিলাম। বারবনিতাদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে তাদের স্পর্শ না করাটা ওদের চে

অশ্লীল কাজ। অর্থাৎ যেখানে যা স্বাভাবিক তা না করলে কি অশ্লীল বলা যায়? দুই তরুণ-তরুণীর বিয়ে হল। ফুলশয্যার রাতে তরুণ বলল, 'দ্যাখো, আমরা সারাজীবন শুধু হৃদয় বিনিময় করে যাব, বন্ধু হয়ে থাকব কিন্তু শরীরের ব্যবহার করব না।' তাহলে স্ত্রী কি তাকে উন্মাদ বলে ভাববে? আর কে না জানে, শেয়ানা উন্মাদরাই অশ্লীলতার জনক!

তা যাক, রঞ্জনের লেখায় আমি স্বপ্নের ভুবনের খোঁজখবর পাচ্ছি। এই খবরটা রাজকাপুর দিয়েছিলেন সিনেমার মাধ্যমে। তার নায়ক মানেই চালচুলোহীন বেকার যুবক। যে স্বপ্ন দেখতে চায়। প্রতিটি ছবি সেই স্বপ্ন হরণের গল্প। একমাত্র 'মেরা নাম জোকারে' সেই স্বপ্ন শেষপর্যন্ত ভেঙে চুরমার হয়। রাজকাপুরের ছবি দেখলেই, আমি যা হতে পারব না, তা কেউ হচ্ছে, দেখে ভারতবাসী পুলকিত হয়েছে। সেই 'আওয়ারা' 'চারশ বিশ' থেকে 'ববি' বা 'মেরা নাম জোকার', সর্বত্র তিনি একটি না একটি দৃশ্য রাখতেন যেখানে রমণীর শরীরের অনাবৃত অংশ নিষ্পাপ ভঙ্গিতে দেখানো হত। ভারতবাসী তা দেখে পুলকিত হলেও অশ্লীল বলে চ্যাঁচাত না। তা রঞ্জন ওই একই কাজ করে চলেছে তার লেখায়। আমি তন্ত্রে গিয়েছি, ব্রিটিশ পাবে গিয়েছি ওর লেখার মাধ্যমে। এই শীতে কোনো কোনো প্রায়-বিবসনা সুন্দরী কোন নাচ নাচবেন তাদের বিশদ পড়ে অভিজ্ঞ হয়েছি।

কেউ কেউ নিশ্চয়ই বলবেন, এগুলো কি ভালো? বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মেলে? রুচিতে আটকাচ্ছে না? এর জবাব একটাই। এসব বাদ দিয়ে আমি কী করতাম? চব্বিশ ঘণ্টা রবীন্দ্রনাথ পড়া বা শোনারও তো একটা ক্লান্তি আছে। টিভিতে চোখ বেশিক্ষণ রাখা যায় না। তাছাড়া বাঙালির অবস্থা সেই বিধবা যুবতীর মতো, যে প্রাকৃতিক নিয়মে ঋতুমতী হয়ে কিন্তু যাকে জোর করে আলোচালের ভাত দিয়ে নিরামিষ তরকারি খেতে হয়। তন্ত্র বা ব্রিটিশ পাবে যাওয়ার জন্যে যে টাকা পকেটে থাকা দরকার তা আমাদের নাইবা থাকল, রঞ্জনের লেখায় সেই রসালো গপ্পো পড়ে মজতে ক্ষতি কি!

গতকালই এক বন্ধুর বাড়িতে অনেকদিন বাদে গিয়েছিলাম। সন্ধের পর। বন্ধু বললেন, 'কী খাবেন? হুইস্কিতে অসুবিধে নেই তো?' বন্ধুর মা সামনে বসেছিলেন। বাঙালির অন্তত পঁচিশ ভাগ শিক্ষিতজন বাড়িতে পান করেন, তাই রাস্তায় মাতাল দেখা যায় না বলে কেউ আবিষ্কার করেছিলেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখে বন্ধুর মা ভেতরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়ে থমকালেন,— 'রাস্তার ধারে ঘর তো, খেতে খেতে বেশি জোরে কথা বলবে না।'

জানুয়ারি ২০০৩

পারভার্টেড উইপোব

গতবছরের বইমেলায় কানুবাবু কিছু বই কিনেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের যত নামীদামি বই তা আগেই তাঁর আলমারিতে জায়গা পেয়েছে। গত চল্লিশ বছরের সেইসব সংগ্রহ তিনি ঘুরিয়ে ফি পড়েছেন। পথের পাঁচালীর প্রথম সংস্করণ, হাঁসুলিবাঁকের প্রথম সংস্করণ অতি যত্নে রেখে তিনি। গতবার বইমেলায় গিয়ে মনে হল আজকের ছেলেদের লেখা তাঁর পড়া উচিত। হাল সাহিত্যের কথা না জানাটা অন্যায়। তরুণ লেখকদের কয়েকটি গল্প এবং রচয়িতার কোনো এর আগে তিনি পড়েননি। কিন্তু অজানা লেখকের এত মোটা উপন্যাস যখন প্রকাশক সাহস ছাপছেন তখন নিশ্চয়ই খুব ভালো হবে বলে তাঁর মনে হয়েছিল।

বাড়িতে ফিরে কানুবাবু বিপাকে পড়লেন। তাঁর বই-এর দুটো আলমারিতে একফোঁটা জ নেই। নতুন আলমারি কেনার কথা ভেবেছিলেন, কেনা হয়নি। নতুন কেনা বইগুলো একটা টো রেখে দিয়েছিলেন তখনকার জন্যে। একেবারে নিচে মোটা বইটি, তার ওপরে পাতলাগুলে

কানুবাবু বিপত্নীক। একমাত্র কন্যা থাকে আমেরিকার নিউজার্সিতে। সেখান থেকে ফোন মেয়ে খুব অসুস্থ। জামাই বলল, 'বাবা, তাড়াতাড়ি চলে আসুন।'

দশ বছরের ভিসা আগে থেকেই নেওয়া ছিল, ফ্ল্যাটে চাবি দিয়ে কানুবাবু মেয়ের কাছে গেলেন। মেয়ের বুকে ক্যানসার ধরা পড়েছে। তার চিকিৎসার সময় পাশে থাকলেন, অপা হল, ডাক্তার বললেন, 'আপাতত বিপদ নেই।' এই করতে এগারো মাস চলে গেলে মে কিছুটা সুস্থ দেখে কানুবাবু ফিরে এলেন।

এবারে বইমেলার বিজ্ঞাপন দেখে কানুবাবুর মনে পড়ল গতবারে কেনা বইগুলোর কথা। না থাকায় পড়া হয়নি অথচ আর একটা বইমেলা এসে যাচ্ছে। কানুবাবু লজ্জিত হলেন। সেই হঠাৎ তাঁর কানে খচর খচর শব্দ বাজল। কী ব্যাপার? শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে বই-এর আলম কাছে পৌঁছতেই দেখলেন দু'টো ইঁদুর পেছন দিক থেকে পালিয়ে গেল। সর্বনাশ। তাড়াতাড়ি আল খুলেই তিনি মাথায় হাত দিলেন। তাঁর এগারো মাসের অনুপস্থিতিতে দুটো আলমারির পেছ নরম কাঠ ফুটো করে ইঁদুরেরা ঢুকে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতাকে খেয়েছে। একে একে দে পেলেন—শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, এমনকী সমরেশ বসুকেও বাদ দেয়নি রাক্ষসগু কোনোটার খানিকটা কাটা, কোনোটার অর্ধেকটাই। ঝুরঝুরু পড়তে লাগল কাগজের টুকরোগু চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন কানুবাবু। প্রতিজ্ঞা করলেন, ইঁদুরগুলোকে পরলোকে না পা জলস্পর্শ করবেন না। সেদিনই ইঁদুর মারার বিষ প্রয়োগ করতে গোটা দশেক লেংটি এবং চা মজবুত ইঁদুরের মৃতদেহ পাওয়া গেল। তিনদিন পরে ওদের সংখ্যা চল্লিশে পৌঁছলে দেখা আর কোনো ইঁদুর এদিকে পা বাড়াচ্ছে না।

ইঁদুরকুল ধ্বংস করে ছিন্নভিন্ন বইগুলোর কথা ভাবতে বসে কানুবাবুর নজর পড়ল টেবি

ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফাঁপরে পড়লেন। গত বইমেলায় কেনা বইগুলো টেবিলের ওপর খোলা পড়ে আছে এগারো মাস। ওগুলো নিশ্চয়ই আস্ত নেই। হাত বাড়িয়ে প্রথম কবিতার বইটা তুলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন কানুবাবু। একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই। প্রতিটি পাতা আস্ত, এখনও নতুন নতুন গন্ধ বের হচ্ছে। দ্বিতীয় বইটি তুললেন, ছোটগল্পের।

সেটাও নতুন হয়ে আছে। কী ব্যাপার? ইঁদুরগুলো কি এদের দেখতে পায়নি? হতেই পারে না। যারা কাঠ ফুটো করে বই ধ্বংস করে তারা চোখের সামনে পড়ে থাকা খাবার খাবে না? কিন্তু খায়নি তো!

কানুবাবু ভাবতে বসলেন। অনেক ভেবে মনে হল, এটা আধুনিক প্রকাশনার অবদান। এখন নিশ্চয়ই বই-এর মলাট ছাপার সময় এমন কেমিক্যাল মিশিয়ে দেওয়া হয় যা ইঁদুরদের সহ্য হয় না। দূর থেকে তার ঘ্রাণ পেয়ে ওরা এদিকে এগোয়নি। তাড়াতাড়ি এক পরিচিত প্রকাশককে ফোন করে প্রশ্নটা করলেন কানুবাবু। প্রকাশক আকাশ থেকে পড়লেন। কই, এমন কথা তো তাঁর জানা নেই। উলটে তিনি কানুবাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এই আবিষ্কারের জন্যে। এখন যেসব বই তাঁর প্রকাশনা থেকে বের হবে তাতে তিনি এই এক্সপেরিমেন্ট করবেন। অবশ্য তাতে অসুবিধে আছে। অনেক পাঠক পাতা ওলটান জিভে আঙুল স্পর্শ করে। যে বিষে ইঁদুর মরে সেই বিষ পাঠকের শরীরে যাওয়া ঠিক নয়। অবশ্য একটা ওয়ার্নিং ছেপে দেওয়া যেতে পারে মলাটের এককোণায়।

নিজের ভাবনা সঠিক নয় জানার পর কানুবাবু মুষড়ে পড়লেন। দু-একটা ইঁদুর ধরে এনে তাদের বইগুলোর ওপর বসিয়ে দিয়ে দেখলে হত! কিন্তু এখন এখানে ইঁদুর পাবেন কোথায়। তখনই মনে পড়ল। পাতলা বইগুলো তুলে ছুটলেন কার্জন পার্কে। সেখানে গর্ত থেকে বেরিয়ে লুটোপুটি করছে হাজারখানেক ইঁদুর। তাদের গর্তের সামনে বইগুলো রেখে গবেষকের চোখে তাকালেন। তখনই কাণ্ডটা ঘটল। হাজারখানেক যেন প্রাণের দায়ে কার্জন পার্ক ছেড়ে পালাতে চাইল রাজভবনের দিকে। পটাপট ছুটন্ত বাস-গাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তারা, তবু কার্জন পার্কে থাকতে চাইছিল না।

বইগুলো নিয়ে ফিরে এসে কানুবাবুর নজর পড়ল মোটা বইটির দিকে। দু'হাতে তুলতে গিয়ে বেশ হালকা লাগল। পাতা ওলটাতেই আর এক চমক। পুরো বইটির তিনভাগের দু'ভাগ সুন্দরভাবে খেয়ে ফেলেছে উইপোকারা। খেয়েদেয়ে চলে গেছে। আশ্চর্য! শুধু একই বইটা, তাও পুরোটা নয়, উই খেয়ে গেল? কানুবাবু প্রথম থেকে পড়তে আরম্ভ করলেন। বেশ ভালো লাগছিল পড়তে। উইপোকা যে সব জায়গা সুনিপুণভাবে খেয়ে গেছে সেগুলো ছাড়াই পুরো উপন্যাস পড়ে ফেলে মনে হল খুব শক্তিশালী কলম। বেশ ভালো লেখা। কিন্তু বাকি দুই-তৃতীয়াংশের লেখা পড়া হল না, এ হতে পারে না। তিনি বাজার থেকে আর একটা বই কিনে এনে উই কাটা অংশগুলো পড়তে গিয়ে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। পরে চোখ খুলে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলেন, উইগুলো সেইসব অংশ খেয়ে গেছে, যেখানে চিৎপুরের মলাটহীন চটি বই থেকে টোকা হয়েছিল।

কানুবাবু সিদ্ধান্তে এলেন, উইগুলোতে কোনো স্ত্রী-উই ছিল না সব পারভার্টেড পুরুষ উই।

ফেব্রুয়ারি ২০০৩

নেকু বনাম ন্যা

অভিধান বলছে, ভালোমানুষের মতো অজ্ঞতা, সারল্য বা সাধুতার ভান করে যে তাকে নেকা হবে। ভান শব্দটা থাকায় আমরা ব্যাপারটার মধ্যে প্রতারণার গন্ধ পাই। আর যে প্রতার তো অপরাধী। আর অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত।

কিন্তু অভিধান যাই বলুক, বাংলা শব্দভাণ্ডারের অনেক শব্দের মতো নেকামি অথবা ন্যা অপরাধ অত তীব্র নয়। বরং এ নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতা করার চল আমাদের সমাজে রয়েছে। এক বন্ধুর মা-বাবা খুব সুখী দম্পতি ছিলেন। আমাদের যখন বছর কুড়ি বয়স তখন তিনি চ পৌঁছেছেন। সে সময় চল্লিশের মহিলাদের বৃদ্ধা ভাবার চল ছিল, যা এখন পঁয়ষট্টির পরে হয়। কিন্তু সেই চল্লিশের মহিলা যেমন সুন্দরী ছিলেন তেমনি কথা বলতেন তাঁর নিজস্ব তে। আমাকে দেখতে পেলেই বলতেন, 'ওমা, কী ছেলে গো, একবার মাসিমার দিকে ত চোখে দেখতে নেই! সেই কবে এসেছিলে, তারপর থেকে হাপিত্যেশ করে বসে আছি। এবে দুষ্টুমিষ্টি। কী খাবে বলো!'

এরকম ভাষায় আমার কোনো পরিচিতা মহিলা কথা বলতেন না। ওঁর গলার স্বর এত ছিল যে চোখ বন্ধ করলে প্রেমিকার উক্তি বলে ভুল হতে পারত। আমার অন্য বন্ধুরা আ বলত, ন্যাকা। শুনে আমার খারাপ লাগত। শুধু আমার সঙ্গে নয়, বন্ধুর বাবা হয়তো বেরো আমরা ঘরে রয়েছি, মাসিমা বলে উঠলেন, 'তুমি কী গো! ওরা এখানে রয়েছে অথচ এ কথা বলে গেলে না। ওম্মা! তোমার শার্টের বোতাম কোথায় গেল! এক মিনিট দাঁড়াও লক্ষ্ বলে ছুটে গেলেন ভেতরে। ফিরে এলেন সুচ-সুতো নিয়ে। তারপর স্বামীর বুকের সঙ্গে হয়ে শার্টে বোতাম বসিয়ে দিয়ে হাসলেন, 'এসো।' আমরা যে ঘরে রয়েছি তাঁর বিন্দুমাত্র সংবে কারণ ঘটেনি। অভিধান যদি ন্যাকামিকে ভান বলে তাহলে মহিলাকে ন্যাকা বলা যায় না। তিনি যা করেছেন তা ভেতর থেকে করেছেন, বানিয়ে করেননি।

কিন্তু তাঁর বয়সি মহিলার ওই আচরণকে কেউ মেনে নিতে পারেনি। বয়স্করা ওঁর সম বলতেন, 'এত নেকি মহিলা যে, দেখলে গা জ্বলে যায়।' 'বুড়ি হচ্ছে না ছুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে বলবে।' অর্থাৎ ছুঁড়িরা, মানে অল্পবয়সি মেয়েরা এমন কথা বললে বা আচরণ করলে সেটা মানান সেসময় কোনো অল্পবয়সি মেয়েকে দেখিনি, যে ওইভাবে কথা বলতে অভ্যস্ত।

এর বছর দশেক বাদে আবার শহরে এসে বন্ধুর বাড়িতে গেলাম। খবর শুনেছিলাম, সে করেছে। বউ খুব সুন্দরী। মাসিমা দরজা খুললেন, 'ওমা, সমরেশ, আমি কী ভাগ্যবতী!'

'কেন?' অবাক হলাম।

'বাঃ। ডুমুরের ফুল দেখছি।' হেসে ফেললেন মাসিমা।

দেখলাম তখন উনি ষাটে। চুল পাকেনি, শরীর একটু রোগা হয়েছে কিন্তু সেই সৌন্দর্য যেতে যেতে রয়ে গেছে। ভারতচন্দ্র হীরা মালিনী সম্পর্কে লিখেছিলেন, এতে আছে গুঁড়া। ঠিক তাই। তখন সবে সন্ধ্যা পেরিয়েছে। বন্ধুর খোঁজ করতে বললেন, 'ওরা চাঁদ দেখতে গিয়েছে গো।'

'চাঁদ দেখতে!' ঢোঁক গিললাম।

'তুমি তো এখনও বিয়ে করোনি, বুঝবে কেমন করে! বিয়ের পর এটাই তো চাঁদ দেখার সময়। যাও না ছাদে, ওরা ওখানে আছে।' মাসিমা বললেন।

'আমার কি ওখানে যাওয়া ঠিক হবে?' আমি ইতস্তত করছিলাম।

'ওম্মা! কোথায় সেই ছোট্টবেলার বন্ধু, তুমি যাবে না তো কে যাবে! যাও।'

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতেই মহিলা কণ্ঠ কানে এল, 'ধূর! তুমি না এক নম্বরের কাঠখোট্টা। আমাকে জড়িয়ে ধরতে পারছ না? নো নো নো ডার্লিং, ওভাবে নয়। চাঁদটাকে একটু জেলাস করে দাও না প্লিজ। উম্!'

নিঃশব্দে নেমে এসেছিলাম। এই কাহিনী কোনো শিক্ষিত মহিলাকে শোনালে তিনি ফোঁস করে ওঠেন, 'ন্যাকামি! যাদের ভেতরটা শূন্য তাদের মুখে ওই বোল ফোটে। আপনারা পুরুষরা তাতেই মজেন।'

হয়তো। কার বুকের ভেতর ভরাট তাই তো বুঝি না। তাই ওই 'ন্যাকামি'র জন্যে হাপিত্যেশ করতে আপত্তি নেই। এরকম নেকু তো বরং বেশ আদরের।

একটু বিখ্যাত হলে মানুষের চালচলন বদলে যায়। আমাদের সময় বয়স্ক লেখকরা তেমন ছিলেন না। তাঁদের কারও কারও সম্পর্ক খারাপ হলেও পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক বজায় থাকত। এখন তা একেবারেই নেই। এই যে আমি, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে 'দেশ' পত্রিকায় লিখছি, সব লেখককেই চিনি, কিন্তু বইমেলায় মাঝে মাঝে ছাড়া কারও সঙ্গেই দেখা হয় না। প্রফুল্ল রায়কে কতদিন দেখিনি, সিরাজদার সঙ্গে শেষ কবে দেখা হয়েছে মনে পড়ে না। আমাদের পরে যারা নাম করেছে তারা একটু একটু করে বয়স্ক হয়ে উঠল। আমার মনে হয় আমরা কেউ কারও লেখা পড়ি না। আগে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পড়ত। সন্তোষকুমার ঘোষ তো লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ভালো লেখা পড়ে লেখককে চিঠি লিখতেন। একবার রাত বারোটায় ফোন করে আমাকে গালাগাল দিয়ে ভূত বাগিয়ে দিয়েছিলেন একটা ভালো বিষয় নিয়ে বাজে লিখে নষ্ট করেছি বলে। এই মানুষগুলো ন্যাকামি কাকে বলে জানতেন না।

এবারের বইমেলায় অনেকদিন পরে এক কবির সঙ্গে দেখা হল। সে এখন বিখ্যাত। আগে দেখা হলে মাথা নিচু করে লজ্জা-লজ্জা ভাব ফোটাত মুখে। এবার দেখলাম পাঁচ-দশজন মহিলা-পুরুষ তাঁকে ঘিরে রয়েছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সুপুরি গাছের মতো দুলে বলল, 'ভালো!'

বললাম, 'ঠিক আছি! তুমি?'

সে বলল 'এই আর কী! তোমরা ওঁকে চেনো?

সঙ্গীরা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ'।

'কী ভালো লেখেন, তাই না?'

সঙ্গীরা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'ওঁর লেখা একদম আলাদা, নর্থ বেঙ্গলকে বেস করে, না?'

সঙ্গীরা আবার মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, নর্থ বেঙ্গল মানে সিনিক বিউটি, মূর্তি নদীর ধারে সেই বাংলোটা, আহা।'

বললাম, 'চললাম।'

সে বলল, 'দেখা হবে।'

আমি জানি বিখ্যাত হওয়ার পরে সে আমার কোনো লেখা পড়েনি। ওর সঙ্গীরা পড়েছে কি না তাতে সন্দেহ আছে।

এই ন্যাকামি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু যেহেতু ভালোমানুষ সাজার জন্যে এইরকম ন্যাকামি করা প্রয়োজন তাই খারাপ মানুষের সাতখুন মাফ হয়ে যায়।

মার্চ ২০০৩

চোরের মা, অথবা চোরের দিদি, চোরের বাবা কোথায়?

আমার বাড়ির সামনে একটি বস্তি আছে যেখানে দিনে অন্তত তিনবার বেশ ঝগড়াঝাঁটি হয়। লক্ষ্য করেছি, ঝগড়া শুরু হয় পুরুষদের মধ্যে কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে সেটা মহিলাদের অধিকারে চলে যায়। ধরা যাক ভরদুপুরে বাংলা পান করে এই বস্তির এক বেকার যুবক তার জিগ্‌রি বন্ধুকে চার অক্ষরের গালগাল দিল। সে যদি বাংলায় বুঁদ না হয়ে গালাগাল দিত তাহলে বন্ধুটির শব্দটাকে গালাগাল বলে মনে হত না। হেসে দুই অক্ষরের পালটা জবাব দিত। কিন্তু তাকে ফাঁকি দিয়ে বন্ধু বাংলা খেয়ে এসেছে—এই রাগে সে গালাগালটাকে গালাগাল ধরে নিল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। মনে হচ্ছিল এখনই একটা লাশ পড়ে যাবে; কিন্তু সেটা কখনও পড়ে না। হঠাৎ পিলপিল করে বস্তি থেকে মহিলারা বেরিয়ে এলেন। রোগা অপুষ্টির ছাপ স্পষ্ট শরীরগুলো থেকে যা বের হতে লাগল তাকে চিৎকার বললে কিছুই বলা হয় না। বুঝতে পারলাম, ওদের দলের যে তরুণীটি গলার শিরা ফুলিয়ে চিৎকার করছে সে সমর্থন করছে গালাগাল হজম না করা আক্রমণকারী যুবককে। মাঝে মাঝে ছুটে গিয়ে সে যুবকের হাত ধরে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছিল। যুবক বীর ভঙ্গিতে তাকে বলছিল, যাও বাড়ি যাও।

এই সময় রণাঙ্গনে উপস্থিত হলেন একটি শীর্ণ চেহারার প্রৌঢ়া। সবার গলা চাপা পড়ে গেল তাঁর গলার তলায়। তাঁর ছেলে মাল খেয়েছে নিজের পয়সায়, কারও পাকা ধানে মই দেয়নি। যে তাকে মারতে চাইছে তার কুষ্ঠ হবে, তার বউ বিধবা হবে।

বউটি তেড়ে গেল প্রৌঢ়ার দিকে,—'তোর ছেলে লম্পট, চরিত্রহীন।'

প্রৌঢ়া চিৎকার করলেন,—'মুখ ভেঙে দেব শয়তানি। তোর শরীরে তো কয়েকটা হাড় ছাড়া কিছু নেই। আমার ছেলে দূরের কথা, তোর নিজের স্বামী কাছে যায় না হাড় ফুটে যাওয়ার ভয়ে।'

ক্রমশ দেখতে পেলাম, যুদ্ধক্ষেত্র প্রৌঢ়ার দখলে চলে গেল। শেষপর্যন্ত তিনি তাঁর শাবককে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বুঝলাম, চোরের মায়ের বড় গলা কাকে বলে!

বিজ্ঞাপনের যুগের বড় হাতিয়ার ইলেকট্রনিক মাধ্যম। যা সত্যি নয় তাকে সত্যি প্রমাণ করেও বিভ্রম তৈরি করে জনসাধারণকে টুপি পরানোর যে কায়দা এখন সর্বজন-স্বীকৃত তাকে চোরের মায়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, জ্যোতি বসু মানুষ হিসেবে আদৌ ধূর্ত ছিলেন না। যা ভালো মনে করতেন তা ফস্ করে বলে ফেলতেন। বানতলায় নারী নিগ্রহ হল, একজন মারাও গেলেন। সাংবাদিকরা ওঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে গম্ভীর মুখে বললেন, এরকম তো হয়ই। যেন ঠাস্ করে চড় কষালেন। হাতি চলে গেল, রাস্তার কুকুররা চিৎকার চ্যাঁচামেচি করল। মন্তব্য শুনে তাতে হাতির কিছু এসে গেল না। নিজেকে ভালোমানুষ উনি নিজেই ভাবেন, অন্যের কাছে তা বিজ্ঞাপিত করার কোনো দায় তাঁর ছিল না। বিভ্রম তৈরি করেননি বলে পশ্চিমবঙ্গের

মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন রাজত্ব করেও তিনি জনসাধারণের সম্ভ্রম পেয়েছেন, ভাবে পাননি।

কুচবিহারে সিপিএমের কর্মী-মহিলাকে ধর্ষণ করল তারই দলের লোক। হইহই শুরু অনিল বিশ্বাস রোবটের মতো মুখ করে বললেন, ওই মহিলার চরিত্র ভালো ছিল না। সি বলল, মহিলাকে ধর্ষণ করাই হয়নি। রাতারাতি এই প্রচার বাড়ানো হল। যেন সোনাগাছির মহি ময়দানে নিয়ে গিয়ে যদি ধর্ষণ করা হয় তাহলে সেটা কোনো অন্যায় নয়। কুচবিহারের মা আলিমুদ্দিনে বসে বড় গলায় যা বলল, তাই-ই মেনে নিতে হবে।

কিন্তু ডাক্তারি রিপোর্টে যখন বলল, মহিলাকে ধর্ষণ করা হয়েছে তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রা বসে ব্যাপারটা স্বীকার করে নিয়ে বললেন, কোনো মহিলার চরিত্র ভালো কী মন্দ তার ধর্ষণের অপরাধ কমে যায় না। মহিলাকে এই কার্যটি করার ব্যাপারে দলীয় কর্মীরা জড়িত থ তাদের রেহাই দেওয়া হবে না। এইটেই বিভ্রম দৃষ্টির আধুনিক কায়দা। দলের সম্পাদক যদি বসুর মতো বলার যোগ্যতা অর্জন করত তাহলে বলত, 'এমনটা হয়েই থাকে।' সেই ব্যক্তিত্ব নেই বলে মিথ্যা কথা বলে সেটাকেই সত্যি প্রমাণ করতে চাইলেন। তাঁর সাগরেদরা সেই গলা মেলাল। কিন্তু এই প্রচার জনতা মানছে না বুঝতে পেরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভালোম ইমেজটা আরও বড় করার প্রচারে নামলেন। জনতা বলল, দেখেছ, সিপিএম করেও ভদ্র হওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন উঠবে, চোরের মা কে? চোর তো কুচবিহারের সেই বীরপুরুষ, যে আনন্দিত হ পার্টির সদস্য হওয়ায় তার মা অবশ্যই পার্টির সেক্রেটারি। তিনি বড় গলায় যা বলেছেন ত কার্যকর হল না তখন ঠাকুমার প্রয়োজন হল। ঠাকুমার গলা খাদে থাকলেও বাজিমাত করার যথেষ্ট।

আচ্ছা, চোরের মায়ের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু চোরের বাবার কথা তেমনভাবে কেউ ব কেন?

আমাদের বাড়ির সামনে বস্তিতে যেসব বাবা থাকেন তাঁরা ওইরকম চিৎকারের সময় বাক্যও বলেন না। উলটোদিকের ফুটপাতে বসে নির্বিকার মুখে তাস খেলে যান। যা করার মা করে। আলিমুদ্দিন বা রাইটার্স যদি মা-ঠাকুমা হয় তাহলে বাবা-ঠাকুরদা অবশ্যই জনসাধারণ, কোনো ভূমিকা নেই, গলাও নেই।

তবে এখন মায়েদের যুগ শেষ হয়ে আসছে। বাঙালির দু'জন মা ছিল। একজন গর্ভধ অন্যজন শ্রীমা। যখন ছিল তখন এঁদের গলা ছিল না। কিন্তু এখন বাঙালি একজনই দিদি পে দিদি ডাকলে ট্রেনের রিজার্ভেশন তছনছ করে, কলকাতার রাস্তায় অরাজকতা তৈরি করে ময়দানে জমায়েত হন। আমরা দিদিকে টেলিভিশনে দেখি। তিনি যে স্টাইলে শাড়ি পরে আজকের মহিলারা পরেন না। আঁচল ঘুরিয়ে আনেন বুকের ওপর, যা দেখে আমাদের ছেলে দেখা বিধবা পিসির কথা মনে পড়ে যায়। ছবি তোলা শুরু হলেই মুখ গম্ভীর হয়ে যায় খেঁক খেঁক করে বাক্য ঝরা। দু'চারটে বাংলার পর ইংরেজিতে চলে যান। সেই ইংরেজি বার্নাড পিগমিলিয়ন লিখতেন না, 'মাই ফেয়ার লেডি' ছবি হত না। যেহেতু বার্নাড আগে জন্মে এবং ছবিটি দিদির অভ্যুত্থানের আগে তৈরি হয়েছিল তাই আমরা বঞ্চিত হইনি।

দিদি রেলমন্ত্রক চেয়ে না পেয়ে গোঁসা করেছিলেন। নীতিশকুমারের ছায়া দেখলেই ি করতেন। একটি শিশুও লজেন্সের জন্যে এমন বায়না করে না। সেই নীতিশকুমার যখন সদর দপ্তর কলকাতা থেকে সবিয়ে নেবেন বলে ঘোষণা করলেন তখন দিদিকে রোখা ম হয়ে গিয়েছিল। প্রকাশ্য সভায় তিনি আকাশ-কাঁপানো চিৎকার করে হাততালি কুড়িয়েছিলে বলে,—'আমরা বাংলাকে দু'ভাগ করতে দেব না।'

দুর্জনেরা প্রশ্ন তুলল, আমার বাংলা মানে কী? বাংলা কি ওনার পৈতৃক সম্পত্তি? দ্বিতীয়ত, বাংলা বলে কোনো রাজ্য তো এখন নেই। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলা বলা কোনোমতেই যায় না। বাংলাদেশ তো ওঁর আওতার বাইরে। তাহলে বাংলা বলতে উনি নিশ্চয়ই পশ্চিমবঙ্গকে বুঝিয়েছেন। লর্ড কার্জন যখন বাংলা ভাগ করতে চেয়েছিলেন তখন ছিল গোটা বাংলা। তার প্রতিবাদে বাঙালি সোচ্চার হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ রাখিবন্ধনের ডাক দিয়েছিলেন। দিদির বাসনা হল রবীন্দ্রনাথ হওয়ার। ইতিমধ্যে কি সব লেখালেখিও সেরে ফেলেছেন, বইও বেরিয়েছে। তারপর কী হল? রেল দপ্তর চলে গেল বাইরে। বিজেপি মন্ত্রীসভা ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরলেন না। দিদি চিৎকার হজম করে ফেললেন এবং এখন পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সেই বিজেপির সঙ্গে গাঁটছাড়া বেঁধে ফেললেন।

চোরের মা বড় গলায় যখন চ্যাঁচান তখন তিনি ভালো করেই জানেন কখন সেই গলায় মিনমিন করতে হয়!

এপ্রিল ২০০৩

জলের ড

নামের পাশে ঠাকুর থাকলে তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেই হত। তার ওপর সেই মানুষটির চামড়া যদি গৌরবর্ণ হয়। শরীর দীর্ঘ, নাক টিকালো, তাহলে তৃতীয়বার দেখতে হবে। ত যৌবনে এরকম ঠাকুর অনেক ছিলেন যাঁদের প্রতিভাকে আরও প্রচারিত করেছিল ওই পদবি। সৌমেন ঠাকুর, শুভ ঠাকুর মশাইরা নিজগুণে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিলেন ঠিকই কিন্তু জোড়া গন্ধ খুঁজে পেতাম তাঁদের পদবিতে। আর জোড়াসাঁকো বলতে দেবেন ঠাকুর বা অবন ঠ নাম প্রথমে মনে আসত না, তার পুরোটা জুড়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। হিমালয়ের পাশে শু পাহাড়ের যে অবস্থান, ঠিক তাই হয়েছিল জ্যোতিরীন্দ্র বা দিনেন ঠাকুরের। তিনি চলে একচল্লিশ সালে। যা রেখে গেছেন তা নিয়ে আমরা ভরাট হয়ে আছি। এতটাই সেই মুগ্ধ পরবর্তীকালে কোনো ঠাকুর যদি বক্তা হিসেবে দারুণ বলেন তাহলে বলি, হবে না কেন, রবীন্দ্র রক্ত আছে শরীরে।

শুভ ঠাকুরের বহেমিয়ান জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঠিক মেলেনি তবু তাঁর প রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি। এই যে বাণী, বাণী ঠাকুর, দারুণ রবীন্দ্রসংগী ওই ঠাকুর পদবিটা বোধহয় সমসাময়িকের থেকে ওঁকে একটু এগিয়ে দিয়েছিল। সেইসঙ্গে ঘরানার সঙ্গে মিলিয়ে ওঁর চেহারার গড়ন, গায়ের রঙ ওই এগোনোর কাজটাকে সহজ ক

মনে আছে, বেকবাগানের মোড়ে শ্রদ্ধেয়া অমিয়া ঠাকুরের কাছে একবার গিয়ে রবীন্দ্রনাথের নিকট-আত্মীয়া ওই মহিলা চমৎকার গান গাইতেন। আমার অনুরোধে একটা ত উনি গেয়েছিলেন বৃদ্ধা বয়সে। বয়স যত বাড়ে মানুষ যে তত সদয় হয় এটা আমি জে তাঁকে দেখে, পরে সুচিত্রা মিত্রকে। অমিয়া ঠাকুর আমাকে একটি পোস্টকার্ড দেখিয়ে জগদীশচন্দ্র বসু ডাকে পাঠিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সাধারণ দু'চারটে লাইন। এক দুপুরে রবীন্দ্র কাছে গিয়েছিলেন অমিয়া ঠাকুর। তাঁকে দেখতে পেয়ে সেই দুপুরে গান এল তাঁর মনে। লিখবেন, কাগজ কই, পেয়ে গেলেন পোস্টকার্ডটা। উলটোদিকের ঠিকানায় পাশের ফাঁকা ত লিখে ফেললেন প্রথম চারটে লাইন। সুর দিয়ে শোনালেন। বললেন, এটা নিয়ে যাও, তুমে মুখরাটা।

অমিয়া ঠাকুর বলেছিলেন, এ আমার কাছে কোহিনুরের চেয়েও দামি। আমি তো চ দিয়ে যাব বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালায়। নইলে হয়তো ...

কথা শেষ করেননি তিনি।

এই 'নইলে হয়তো' শব্দদুটো নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন নাড়াচাড়া করেছি। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর একচেটিয়া অধিকার নিয়ে যেমন বিরক্ত হয়েছি তেমনি নিষেধাজ্ঞা উঠে ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে রবীন্দ্রনাথের হাল কী হবে তা ভেবে আতঙ্কিত হয়েছি। সন্তোষ

ঘোষ বলতেন, নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে অশিক্ষিতরা উল্লসিত হবে কয়েকদিন, তারপর থিতিয়ে যাবে দলবৃদ্ধি না হওয়ায়। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথেই থাকবেন চিরকাল।

কুড়ি বছর আগে শোনা এই কথাগুলো সত্যি হতে চলেছে। নিষেধাজ্ঞা উঠে গেলে কলেজস্ট্রিটের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রকাশকরা উঠেপড়ে লাগলেন রবীন্দ্রনাথের বই ছাপাতে। কোন বই? রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা, প্রেমের গল্প, প্রেমের উপন্যাস নতুন রঙিন মলাটে বাজারে বের হল।

রবীন্দ্রনাথের অশ্লীল কবিতাও ছাপা হয়ে গেল। কী আছে সেই বইতে? বিয়ে হল বান্ধবীর। বাসর শেষে নিরালায় দেখা হল বরের সঙ্গে। পরদিন তার সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, কী হল তখন? কনে মুচকি হেসে বলেছিল, 'কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা বনে।' কনে চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। ফিরল সাত মাস পরে। তার সন্তান হবে। সঙ্গীরা টিপ্পনি কাটল। কনে বলল, কী করব বল। এক রজনীর বর্ষণে মোর সরোবর গেছে ভরিয়া। শুধু তাই নয়, প্রথম রাত্রে মিলনের পর কনে তার বরকে অনুরোধ করেছিল, 'কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে, নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়।' সম্পাদকের বক্তব্য, প্রথম সম্ভোগের এমন জ্যান্ত বিবরণ ওই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কে দিতে পারেন? আর যৌনসুখে উন্মত্তা নারী তার প্রিয়কে বলছে, 'আরো আরো প্রভু আরো, এমনি করে—।' এমনকী 'সোনার তরী' কবিতাটি যে চরম অশ্লীল তা আমরা এখন জানতে পারলাম।

আমার এক বন্ধু ওয়েলিংটন থেকে লিখলেন এমনি এক কপি নব গীতবিতান কিনে পাঠাতে। কলেজস্ট্রিটের পাঁচজন প্রকাশক বইটি এখন ছেপেছেন। এই বইয়ের ওপর নটরাজের মূর্তি। ছাপা ভালো। না দেখে কিনে পাঠিয়েছি। বন্ধু বই পেয়ে ফোন করলেন—বিশ্বভারতীর বইতে একঘেয়েমি ছিল। এটি যেমন ভুলে ভরা তেমনি সৌজন্যবিহীন ছাপা। কেন?

ফোন পেয়ে লজ্জিত হয়েছিলাম। আমাদের কলেজস্ট্রিটের অন্তত নব্বই ভাগ প্রকাশক প্রকাশনার মান নিয়ে মাথা ঘামায় না, খরচ বেড়ে যাওয়ার ভয়ে। ফলে তাঁদের বইগুলোকে মোটেই আধুনিক বলে মনে হয় না। আর রবীন্দ্রনাথের বই-এর ক্ষেত্রে তো কেউ কৈফিয়ত চাইতে আসবে না। লেখককে সম্মান দক্ষিণা দিতে হচ্ছে না, সেই টাকা প্রকাশনায় খরচ করলে বইয়ের মান ভালো হবে—এসব ওঁরা ভাবেন না। বই বাজারে ছাড়ার সময় ভেবে নেন, অন্তত পনেরো-কুড়ি শতাংশ লাভ হয়ে গেল, যা লেখকদের দিতে হয়, রবীন্দ্রনাথকে দিতে হবে না।

আজকের তরুণ কি রবীন্দ্রনাথ পড়ে? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে আরও পালটা প্রশ্ন করতে হয়, শিক্ষিত বাঙালির কত শতাংশ বাংলা বই পড়েন?

সম্প্রতি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। দুশো জন বিভিন্ন বৃত্তির বাঙালিকে প্রশ্ন করা হলে মাত্র পাঁচজন বলেছেন নিয়মিত বাংলা গল্প-কবিতা-উপন্যাস প্রবন্ধ পড়েন। বাংলা খবরের কাগজ পড়েন পঞ্চাশ শতাংশ, পাক্ষিক মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়েন আট শতাংশ। দুশোজনের পাঁচজন মানে আড়াই শতাংশ। বাকি সাড়ে সাতানব্বই শতাংশ মানুষ বাংলা সাহিত্যের খোঁজই রাখেন না। এ যদি তথ্য হয়, এই আড়াই শতাংশ পাঠকের অনেকেরই রবীন্দ্রনাথ পড়া। তরুণদের কেউ কেউ পড়েছেন বলেই অনুমান। এখনও একুশ বছর বয়সে 'কিনু গোয়ালার গলি' পড়ে নিজের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়ে তো তাদের মন্দ লাগে না।

সেদিন এক তরুণ প্রশ্ন করল, রবীন্দ্রনাথের জন্যে কত মানুষ বিখ্যাত হয়েছেন তার খবর রাখেন? সেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, যিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনীকার, রবীন্দ্রনাথ না থাকলে কেউ তাঁকে চিনত? সেদিন থেকে আজ অবধি যত রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ শ্রদ্ধা এবং পুরস্কার পেয়ে গেছেন তা তো রবীন্দ্রনাথের জন্যেই! রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় না জন্মালে চিত্রা দেব 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' লিখলে কেউ কি পড়ত? আর চিত্রা কি লিখতে উদ্যোগী হতেন? শান্তিনিকেতন আর জোড়াসাঁকোয়

দু-দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার মানুষ খেয়ে-পরে বেঁচে আছে তো তাঁর জন্যে।

তরুণ আরও বলল, এসব তো বিশাল বটগাছে আশ্রয় পাওয়া লতার কথা। কফিহাউসে খবর পেলাম, 'রবীন্দ্রনাথের যৌনজীবন' শিরোনামে একটি বই বের হচ্ছে। আপনি কি জানেন?

চমকে উঠলাম। তরুণ জানাল, সেই আশা থেকে শুরু করে নতুন বউঠান হয়ে বৃদ্ধ বয়সে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোতে আলোড়িত হওয়ার পরেও কিশোরী রাণুর প্রতি তাঁর তীব্র আকর্ষণের বর্ণনা থাকবে বইটিতে। বাঙালি পাঠক উপুড় হয়ে সেসব গিলে নেবে।

রেগে গেলাম খুব। জিজ্ঞাসা করলাম, লিখলেই হল? সাক্ষী কোথায়?

তরুণ হাসল—লেডি রাণু দশ বছর বয়সে উলঙ্গ হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, এটা এখন প্রমাণিত। তখন দশ বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। ওকাম্পোর বাড়িতে তিনি লিখছিলেন। কৌতূহলী ওকাম্পো কী লিখছেন দেখার জন্যে পেছন থেকে উঁকি মারতেই তিনি আপেল ধরার মতো...।

বাকিটা বলতে তরুণের সংকোচ হল।

বললাম, এসব তো কুৎসা।

পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল তরুণ,—শুনুন। প্রেমে পড়িবার কোনো বয়স নাই। স্বচ্ছন্দে সত্তরের কাছে আসিয়াও আপনি প্রেমে পড়িতে পারেন; এই গ্রন্থ আপনাকে উদ্বুদ্ধ করিবে; নহিলে মূল্য ফেরত।

তরুণকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি রবীন্দ্রনাথ পড়েছ?

—হ্যাঁ। একটা জাতি হামাগুড়ি দিচ্ছিল, তিনি তাকে দাঁড় করালেন, হাঁটতে শেখালেন, দৌড়োবার শক্তি দিলেন। ওই কারণেই তাঁকে বলতে হবে—ঈশ্বর, এরা জানে না কী করছে, এদের ক্ষমা করো।

মে ২০০৩

পত্রপাঠের কান

পত্রপাঠের সম্পাদক প্রতি মাসের নির্দিষ্ট তারিখে তাগাদা দেন লেখার জন্যে এবং আমিও বাধ্য ছেলের মতো লেখা দিয়ে যাচ্ছি প্রথম থেকেই। ব্যাপারটা অনেকের চোখে পড়েছে। যেসব ছোট-বড় কাগজের অনুরোধে ইচ্ছে সত্ত্বেও লিখতে পারি না তাদের সম্পাদকরা জানতে চান, কেন আমি 'পত্রপাঠে' লিখে চলেছি—ওরা তো বিজ্ঞাপনে আপনার নাম ছাপে না। তবে কি বেশি টাকা দেয়?

পত্রপাঠে বিজ্ঞাপন কতটা আনুকূল্য দেয় তা কাগজ খুললেই বোঝা যাবে। টাকা দেওয়ার ক্ষমতা যে সম্পাদকের নেই তা একটি শিশুও বলে দিতে পারবে। তাহলে কেন লিখি?

কলেজে পড়ার সময় দীপ্তেন সান্যালের 'অচলপত্রে'র ভক্ত পাঠক ছিলাম আমি, ব্যঙ্গ–বিদ্রূপের মাধ্যমে অন্যায়কে চাবুক মারার সাহস দীপ্তেন সান্যালের ছিল। তারপর আর এই ধরনের কাগজ বাংলায় হয়নি বললেই চলে। মনে আছে, খাদ্য আন্দোলনের পর পর কলকাতায় বরিস পাস্তেরনাকের 'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। ছবিও চলেছিল। দীপ্তেন সান্যাল কাগজের হেডলাইন করলেন—'ডক্টরজী ভাগো!' খাদ্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বিধানচন্দ্র রায়ের প্রতি বিদ্বেষ ওই উপন্যাসের নাম ভেঙে চমৎকার জমিয়ে দিয়েছিলেন। শেখর যখন 'পত্রপাঠ' বের করল, আমি যেন সেই নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হলাম। কিন্তু জানতাম না, যাদের আক্রমণ করে শেখর পত্রপাঠ বের করছে, তাদের দু'কান কাটা।

আচ্ছা, এক কান কাটা আর দু'কান কাটার মধ্যে পার্থক্য কী? যিনি এক চোখে দেখেন তাঁকে কানা বলা হয়, যিনি দু'চোখেই দেখতে পান না, তাঁকে অন্ধ। তাহলে এক কান কাটা একটু কম নির্লজ্জ, দু'কান কাটার ক্ষেত্রে যা কোনো হিসেবে ধরা পড়ে না। অভিধান বলছে, কান কাটা ব্যক্তি নিজের বদনাম গ্রাহ্য করে না। আর দু'কান কাটা যে, সে স্রেফ নির্লজ্জ। অর্থাৎ কান কাটা (অর্থাৎ এক কানা কাটা) ব্যক্তি একটু বেপরোয়া হয়, ভদ্রতার ধার ধারে না। কিন্তু দু'কান কাটা হলে তার মধ্যে একটা আব্রু চলে আসে, যার আড়ালে সে লজ্জাহীন। এটুকু জানার পর আমার কান কাটাদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ল। তারা যত খারাপ কাজ করুক, তা প্রকাশ্যেই করে থাকে। অর্থাৎ তাদের বোঝা যায়।

পৃথিবীর সব দেশের মতো কলকাতায় এক কান কাটার চেয়ে দু'কান কাটাদের সংখ্যা একটু বেশি। সাধারণত এঁরা একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির ছায়ায় ঘোরেন এবং সবসময় তাঁকে প্রশংসা-বাক্যে রসসিক্ত করে থাকেন। বাবু যদি এক বলেন তো এরা একশো বানিয়ে দেয়। একজন, ধরা যাক কবি হতে চায়। খুব বড় কবি, যাঁর হাতে কবিতা প্রকাশের ক্ষমতা আছে, তাঁর কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার রাস্তা সে খুঁজে নেয়। তারপর কবির বাড়ির বাজার করা থেকে রাত্রে মদের বোতলের জোগান দেওয়া ইত্যাদি কর্মের মাধ্যমে সে আরও আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টা করে। এবার কবিতা।

চল্লিশ বছর আগে মাসিক বসুমতী অথবা তারও আগের প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা অখ্যাত কো
কবির রচনা একটু আধটু পালটে সে কবির পাদপদ্মে নিবেদন করে। কবি বলেন, এঃ এটা
কবিতাই হয়নি। সে বলে, আজ্ঞে, ঠিকই, হয়নি। কবি বলেন, তোমার দ্বারা কবিতা হবে না
সে বলে, আপনার আশীর্বাদ থাকলে হবে; কিছুদিন পরে বড় কাগজে তার কবিতা ছাপা হল। ব্য
তারপর থেকে সব কবি-সম্মেলনে তাকে দেখা যাচ্ছে, এমনকী বাংলাদেশে গিয়েও নিজের কবি
পড়ে আসছে। কবিদের দলে ঢুকে পড়ে কলার তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, যদিও আর কোনো কবি
তার ছাপা হয়নি। লোক বিদ্রূপ করলেও তার কিছু এসে যাচ্ছে না।

লেখকরা কতদিন তরুণ থাকেন? বছর পনেরো-কুড়ি আগেও সুনীল গাঙ্গুলীদের তরুণ লে
বলা হত। আজকে অমর মিত্র, তপন বন্দোপাধ্যায়দের বলা হয়। যদিও ওদের বয়স পঞ্চাশে
আশেপাশে। মনে আছে, এরকম এক পঞ্চাশ পার হওয়া তরুণ লেখক, যিনি 'দেশ' পত্রিকায় প্র
পঞ্চাশটি গল্প লিখেও পাঠকের কাছে গ্রহণীয় হননি, 'দেশে' নতুন গল্প জমা দিয়েছিলেন। তৎকাল
গল্প-সম্পাদক সেই গল্প পড়ে আগুন। কাকিমার সঙ্গে প্রেম ও শারীরিক সম্পর্কের বিশদ বিব
ছিল গল্পে। রুচিবান সম্পাদক গল্প ফিরিয়ে দিয়ে অন্যান্য তরুণ লেখকদের সামনে তাকে ভর্ৎস
করেছিলেন খুব। পরদিন সেই তথাকথিত গল্প-লেখক আর একটি গল্প জমা দিলেন। সম্পাদ
দেখলেন, দুই গল্প একই, শুধু কাকিমার জায়গায় নতুন বউদি করে দেওয়া হয়েছে। সম্পাদক অবা
লেখক জানালেন, নষ্টনীড় অত বছর আগে লেখা বলে শরীর পর্যন্ত এগোতে পারেননি রবীন্দ্রনা
তবে নতুন বউঠানের সঙ্গে প্রেম দেখিয়েছিলেন। সময়টা আধুনিক বলে এই গল্পে দেহজ
দেখানো হয়েছে। তাছাড়া গল্পটা না ছাপিয়ে উপায় নেই। সম্পাদক কারণ জিজ্ঞাসা করলে লেখক
স্বীকারোক্তি—নতুন গল্প লিখে বাড়ি থেকে বেরোবার সময় তাঁর স্ত্রী খাতায় এন্ট্রি করে রাখে
ছাপা হলেই টাকার জন্যে অপেক্ষা করেন। এই গল্পও তিনি এন্ট্রি করে ফেলেছেন। না ছাপা হ
তাঁর প্রেস্টিজ থাকবে না স্ত্রীর কাছে।

সেই গল্প ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—দু'কান কাটা লেখক।

কলকাতায় সরকারি অফিসগুলোতে নিয়মিত দেরিতে যাঁরা কাজ করতে যান এবং ওপরওয়াল
ভর্ৎসনা শোনেন, তাঁদের সেটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। দু'কান কাটা হলেই বোধহয় চামড়া পু
হয়ে যায়। এঁদেরও হয়েছে।

সবচেয়ে বড় দু'কানকাটারা রাজনীতিতে আছেন; লজ্জা বলে কোনো বস্তু তাঁদের অভিধানে নেই
এই কংগ্রেসকে গাল দিচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই তার হাত ধরছেন। এই বিজেপিদের চোর বে
মন্ত্রীসভা ছেড়ে চলে আসছেন, আবার প্রয়োজন হতেই তাদের পদসেবা করছেন। একটা মন্ত্রীত্বে
জন্যে ওঁরা, যা কিছু করতে বলা হবে তা-ই করবেন। তখন রেলমন্ত্রক হাতছাড়া হয়ে গেছে বে
যে শোক হয়েছিল, তা ভুলে যাবেন। দলের কেউ প্রতিবাদ করলেই পদত্যাগপত্র লিখে গোঁসাঘ
ঢুকে যাচ্ছেন। সবাই আনুগত্য স্বীকার করতেই ব্যাপারটা ভুলে যাচ্ছেন।

দু'কান কাটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল বামফ্রন্ট। সবাই জেনে গেছে, সিপিএম মানে বামফ্রন্ট
বামফ্রন্ট মানে সিপিএম। সিপিএমের সাংগঠনিক ক্ষমতার ধারেকাছে আসে না শরিকদল। বামপন্থা
নজির বজায় রাখতে সিপিএম অন্যান্যদের সঙ্গে রেখেছে। এই অন্যান্যরা প্রতি পদক্ষেপে অপমানি
অবহেলিত হয়েও মন্ত্রীত্বের লোভে বামফ্রন্ট ছেড়ে যেতে পারছে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম
তারা প্রকাশ্যে সিপিএমের সন্ত্রাসের নিন্দা করেছে, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ করেছে, কোথাও কোথা
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরেছে, বামফ্রন্টে থাকবে কি না তা নিয়ে হুংকার দিয়েছে, আবার সুড়সুড় ক
রাইটার্সের চেয়ারে গিয়ে বসেছে। সিপিএম-খুড়োর কল থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা এদের নেই
কারণ বেরিয়ে এলেই সিপিএম তাদের অস্তিত্ব মুছে দেবে নির্বাচনে। অতএব বাইরে বড়দার বিরুদ্ধে
যতই এরা গজরাক, দু'কান-কাটা হয়ে এদের বলতে হচ্ছে—আমরা বামফ্রন্ট।

কলকাতার চলচ্চিত্রেও এঁরা বেশ আছেন, একটার পর একটা আঁতেল ছবি কাউকে না কাউকে টুপি পরিয়ে বানাচ্ছেন, পাবলিক সেসব ছবি দেখতে চাইছে না, অথচ কাগজে লেখালেখি হচ্ছে, ফেস্টিভ্যালে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে পরের ছবির জন্যে মুরগি খুঁজছেন, ছ'টা ছবি বানিয়েই নিজেদের সত্যজিৎ রায় বলে ভাবছেন। প্রযোজক সর্বস্বান্ত হচ্ছেন তো বয়েই গেল।

এরপর বঙ্গদেশের জনতা। এঁরা সব বোঝেন, সব জানেন। কিন্তু প্রতিবাদ করে নির্লজ্জদের ছুঁড়ে ফেলার ক্ষমতা যেহেতু নেই, তাই সেই তিন বাঁদরের মতো মুখ-চোখ-কানে হাত চাপা দিয়ে বসে আছেন। এই অর্থে তাঁদেরও দু'কান-কাটা।

শেখরের কাগজে লিখছি এই আশায়, যদি কেউ ভুল করেও একবার চোখ-কান-মুখ থেকে হাত সরায়—এই আশায়। তবে প্রশ্ন উঠতে পারে—পত্রপাঠের কী অবস্থা? তার কান ধরে টানাটানি হচ্ছে না তো? .....

জুন ২০০৩

দেওয়ালটা একটু সরাও

কয়েকদিন আগে একজন তরুণ পরিচালক আপেক্ষ করে বলছিলেন তাঁদের নাটক তেমন কল শে পাচ্ছে না, যদিও কাগজে ও লোকমুখে প্রশংসা হয়েছে। তিনি জানালেন, এর জন্যে থিয়েটারের এক দাদার বড় ভূমিকা আছে। এখন মোটামুটি পশ্চিমবাংলার কোথায় কে বা কারা কল শো-এর ব্যবস্থা করেন তা জানা হয়ে গিয়েছে। নাট্য পরিচালক হিসেবে ওই দাদার খ্যাতি এখন তুঙ্গে। শুধু নিজের দল নয়, অন্য কয়েকটি দলের নাটকও তিনি পরিচালনা করেন, না করলে দেখে দেন। সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ভালো। ফলে কল শো-এর আয়োজকদের অনেকেই তাঁর বক্তব্যকে গুরুত্ব দেন। তিনি যে দলকে নিয়ে যেতে বলেন তারাই আমন্ত্রণ পায়। এর পেছনে অন্য কোনো আর্থিব লেনদেন আছে কিনা তা তরুণ পরিচালক বলতে পারলেন না।

তরুণ বয়সে নাটকের সঙ্গে কিছুকাল জড়িয়ে ছিলাম। নাটককে ভালোবেসে বেশ কয়েক বছর 'দেশ' পত্রিকায় লেখালেখি করেছি। ইদানীং তেমন সময় হয় না নাটক দেখার, ইচ্ছেটাও কমে গিয়েছে কোনো নাটক নিয়ে তর্কবিতর্ক উঠলে চলে যাই দেখতে। যেমন 'উইঙ্কল টুইঙ্কল' দেখতে গিয়েছিলাম তাই এখনকার নাটক নিয়ে কথা বলা আমার সাজে না। বলতে চাইও না।

ষাট দশকে কোনো দলের সভ্য অন্য দলের পরিচালক বা অভিনেতা হয়েছেন, এমন উদাহরণ ছিল বিরল। কয়েকটি দল নিয়ে একটি নাটক নির্দিষ্ট শো-এর জন্যে করলে আমরা যেমন আনন্দিত হতাম তেমনি ভয় হত—ভাড়াটে ব্যাপার না হয়ে যায়। ডিসিপ্লিনের নামে যে কড়াকড়ি তার যে-কোনো মানে ছিল না তা একটু দেরিতে বুঝেছি। কিন্তু গোড়া থেকেই দেখেছি নাটক করা মানেই আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। কখনোই কোনো নাটক হাউসফুল হলেও খরচ করা টাকার পুরোটা পকেটে আসে না। তাই বাংলা নাটককে কল শো-এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়েছে। একটা কল শো মানে দুটো নিজস্ব শো-এর ক্ষতিপূরণ।

এই ব্যবস্থায় এক ধরনের অপমানও হজম করতে হয়। টিভি সিরিয়ালে মুখ দেখানো নাটক না-জানা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে একটা দল গড়ে ওয়ান ওয়াল থিয়েটার বলে যেখানে কল শো করে গেছে গত রাতে যারা তাদের দেওয়া হয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা, সেখানে দিনের পর দিন রিহার্সাল দেওয়া নাটকের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করা ছেলেমেয়েদের প্রশংসিত নাটক পাচ্ছে বারো হাজার টাকা। এককালে শ্যামবাজারি থিয়েটারের সিনেমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছে আকাদেমির থিয়েটার দলগুলোর পরাজয় অনিবার্য ছিল এবং তার পেছনে যুক্তিও পাওয়া যেত। কিন্তু এখন গ্রুপের একটি পঞ্চম শ্রেণীর অভিনেতা সিরিয়ালে ভাঁড়ামো করার সুযোগ পেয়ে এমন নাম করে গেল যে সে ওয়ান ওয়ালে যোগ দিলেই শো পিছু বারো হাজার টাকা পেয়ে যাচ্ছে। কিছু করার

নেই, যাঁরা ভালো নাটক করার জন্যে জীবনের কয়েক হাজার সন্ধে রিহার্সাল রুমে কাটাচ্ছেন তাঁরা যদি অভিমান অপমানে কল শো করতে আর রাজি না হন তাহলে আকাদেমি বা মধুসূদনের ভাড়া দেওয়ার ক্ষমতাই থাকবে না, নাটক করা দূরের কথা।

ব্যাপারটা নিয়ে একসময় অনেক কথা হয়েছে। যে আবেগ বাংলার তরুণ থিয়েটার দলগুলোকে নাটক করতে উদ্দীপ্ত করেছে বহু বছর ধরে তার আয়ু নিয়ে কথা হয়েছে। শুধু আবেগ দিয়ে একটা দল বেশিদিন চলতে পারে না। আরও বেশি দর্শককে তাদের নাটক দেখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যে আর্থিক মূল্যে আজকাল টিকিট পাওয়া যায় তার যোগফল হাউসফুল হলেও যখন পুরো খরচ মেটায় না তখন মূল্যবৃদ্ধি যে প্রয়োজন তা বুঝেও সাহসী হতে পারে না দলগুলো। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনের দাম হু হু করে বাড়ছে, বাড়ছে প্রেক্ষাগৃহের ভাড়াও। শুধু আবেগসর্বস্ব হয়ে পড়ে থাকলে যে আত্মহত্যা অনিবার্য তা এরা বুঝেও কিছু করতে পারছেন না কেন? আমাদের নাটকের দলগুলোর ক্ষমতা আছে, প্রতিভা আছে, পরিশ্রম করার ব্যাপারে কেউ পিছিয়ে নেই। নাটক, যখন টিকিট বিক্রি হচ্ছে তখন অবশ্যই ব্যবসার দিকটা দেখা কর্তব্য। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর চেষ্টা হচ্ছে না কেন?

কীভাবে এটা সম্ভব?

একদম প্রথমে নাটকের বিষয় নির্বাচন। আপনি কেন নাটকটি নির্বাচন করলেন? আপনার নিজস্ব ভালো-লাগা উপভোগ করতে, নাকি দর্শকদের আনন্দিত করতে? মনে রাখতে হবে, আগে সিনেমা ছিল একা, এখন প্রচুর চ্যানেল টিভি-তে মনোরম অনুষ্ঠান নিয়ে দর্শকদের বলছে—দেখুন। সেই আকর্ষণ ত্যাগ করে কেন দর্শক আসবেন আপনার আত্মরতি দেখতে, যদি কোথাও যা তিনি পাচ্ছেন না তা আপনার নাটকে না পান?

'উইঙ্কল টুইঙ্কল' চমক তৈরি করেছিল। বিষয় নির্বাচনে সাহস দেখিয়ে দর্শকদের বাহবা পেয়েছিল। যা তাঁরা ভাবেন অথচ কেউ বলেন না তাই তাঁরা এই নাটকে দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু বিষয়, বক্তব্য, অভিনয় বা পরিচালনা অতি উচ্চমানের হওয়া সত্ত্বেও নাটকের গঠনে নাটকীয়তার অভাব এবং কাহিনীর বিন্যাসে অমনোযোগী হওয়ার কারণে একটা শ্লথ ভাব তৈরি হয়। দর্শক অতগুলো প্রাপ্তির পাশাপাশি যদি টানটান নাটক দেখতে পেত তাহলে এই নাটকের সর্বনিম্ন টিকিটের দাম তিরিশ টাকা করলেও পাঁচশো শো হাউসফুল যেত। নাটকটির পরিচালক আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাঁকে ত্রুটিগুলোর কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, যেহেতু এই সময়ের নাটক এবং একটা আকাঙ্ক্ষার নাটক তাই ত্রুটিগুলো দ্রুত শুধরে ফেলা দরকার। মুশকিল হল, এখানে ব্যক্তিবিশেষের ইগো এত বড় হয়ে যায় এবং কোনো কোনো মূর্খ তাকে এমন হাওয়া করে যে সে নিজের ভাবনা থেকে নড়তে চায় না। সমালোচনা করলেই তাকে শত্রু বলে ভেবে নেয়। এই কারণেই নাটক নির্বাচন করে মহলার আগে বিভিন্ন শ্রেণীর বন্ধুদের ডেকে একটা বোর্ড তৈরি করে তাদের মতামত নেওয়া উচিত। সেই মতামতে যুক্তি থাকলেই দলগুলোর যাঁরা পরিচালক তাঁরা একত্রিত হয়ে আলোচনায় বসা উচিত। দেখা যাবে বিষয় নির্বাচনে অনেকটা উন্নতি হয়ে গেছে।

'তেরো পার্বণ' করার পর শুনেছিলাম জোছনদার দলে সব্যসাচী এবং মুকু থাকায় নাটকের দর্শক বেড়েছিল। প্রতিটি দলের পরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রী অনেক আছেন যাঁরা অন্য মিডিয়ার মধ্যে দর্শকের পরিচিত। তাঁদের অনুরোধ করা যাক না কোনো একটি নাটকে কাজ করার জন্যে। এতে লজ্জার কিছু নেই। রণি তো উইঙ্কল টুইঙ্কলে চমৎকার কাজ করছে।

ভালো বাংলা গল্প-উপন্যাসকে বিষয় হিসেবে নির্বাচন করুন না। যে বই পঞ্চাশ থেকে এক

লক্ষ কপি বিক্রি হয় তার ভেতরে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা নাটকের মন ভরায়। সেই কাহি নাট্যরূপ তো পাঠক দর্শক হিসেবে দেখবেনই।

কাগজে যখন আট হাজার না দিলে বিজ্ঞাপন বের হয় না তখন টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের স কথা বলুন। তারা এক হাজারে দশ সেকেন্ড হিসেবে আটবার ওই টাকায় আপনাদের বিজ্ঞাপন দেখা এতে প্রচার অনেক বেশি, কলকাতায় এবং বাইরেও।

নিজেকে বিকিয়ে অথবা রুচি জলাঞ্জলি না দিয়েও তো সমঝোতা করা যায়। নাটককে বাঁচ তবেই তো নতুন কাজের সুযোগ পাওয়া যাবে!

জুলাই ২০০৩

যদি সুযোগ পাই

শেষপর্যন্ত পত্রপাঠ চার বছরে পড়ল? দেখতে দেখতে?

একজন গৌরী সেন পেছনে নেই, বিজ্ঞাপনও নেই বললে চলে, শুধু পাঠকের ওপর ভরসা করে কোনো কাগজ তিন বছর অতিক্রম করতে পারে? তবু দেখা হতেই শেখর আগের মতনই হাসে। ওর প্রভিডেন্ড ফান্ডের অবস্থা বা ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট এখন কোন পর্যায়ে তা এই হাসি দেখে টের পাওয়া যায় না। আর বরাতজোরে এমন একজনকে গৃহিণী হিসেবে পেয়েছে যিনি পত্রপাঠকে নিজের সন্তান হিসেবেই ভেবে নিয়েছেন। এরকম জেদ দেখতে খুব ভালো লাগে। তবে দূর থেকে।

পত্রপাঠের সম্পাদকীয় উপদেষ্টা হিসেবে তিনজন বিখ্যাত মানুষের পাশে আমার নামও ছাপা হয়। উপদেষ্টার কাজ কী? উপদেশ দেওয়া? সেটা বিলক্ষণ দিতে পারি যতক্ষণ আমার পকেট থেকে কিছু বের করতে না হচ্ছে! এই তিনবছরের কোনো সংখ্যায় আমি একটি বিজ্ঞাপন জোগাড় করে দিতে পারিনি, দুটো কপি বিক্রি করে শেখরকে টাকা দিতে পারিনি কিন্তু বলেছি সঙ্গে আছি।

পত্রপাঠ বের করার আগেই শেখর ওর উদ্দেশ্য বলেছিল। কলেজে পড়ার সময় দীপ্তেন সান্যালের 'অচলপত্র' আমাকে আলোড়িত করত। আজও এই কাগজের কিছু লেখার শিরোনাম বলতে পারি। শেখর সেরকম একটা কাগজের কথা বলেছিল যা আজকাল বাংলায় নেই। উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলাম, সঙ্গে আছি।

কীরকম সঙ্গে থাকা? মার্কিন-ব্রিটিশ সৈন্য ইরাক ধ্বংস করে সাদ্দামকে তাড়িয়ে, সাধারণ মানুষকে মেরে জেঁকে বসেছে যখন তখন বামফ্রন্ট কলকাতায় মহামিছিল করে বলল আমেরিকার ইরাক আক্রমণ করা চলবে না। বলা হল আয়োজন করতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল বলেই আমেরিকানরা ঢুকে পড়েছে। ভিয়েতনামে যখন মানুষ আমেরিকানদের সঙ্গে লড়ছিল আমরা কলকাতায় চেঁচিয়ে বলেছি, সঙ্গে আছি। ওই সঙ্গে থাকায় যদি ভিয়েতনামীদের মনোবল বাড়ে তাহলে খুব ভালো কিন্তু আর কি উপকার হচ্ছে? অবশ্য ইতিহাস বলে ভিয়েতনামীরা আমাদের গলা শুনতে পাননি।

পত্রপাঠের সঙ্গে আমিও তো এইভাবেই আছি। হ্যাঁ, প্রথম সংখ্যা থেকে শেখর আমাকে লিখতে বলছে। আমি লিখে যাচ্ছি। বোধহয় কোনো সংখ্যাই বাদ যায়নি। মাসের একটি নির্দিষ্ট সময়ে শেখরের ফোন আসে, লেখা চাই। অসুবিধে থাকলেও কখনোই না বলতে পারিনি। আমি পেশাদার লেখক। লিখে বেঁচে আছি। অতএব শেখরকে লেখা দিলে টাকা চাইব এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাকে টাকা দিলে শেখরকে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার সাহায্য করা উচিত কারণ আমি তো কাগজের উপদেষ্টা! লেখক সমরেশকে টাকা দিতে হলে উপদেষ্টা সমরেশকে দায়িত্ব নিতে হবে। সেটা নিতে পারিনি বলে টাকা চাইতে পারিনি। শেখর চেয়েছে উপহার দিতে। সেটা নিতেও সংকোচ লেগেছে।

কেন? অচলপত্রের পরে বাংলা ভাষায় কোনো কাগজ সরাসরি ব্যঙ্গাত্মক লেখা ছাপেনি। দীপ্তেন সান্যাল নন, দীপ্তেন লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কাগজের জন্যে দু'হাতে লিখতে তাতে চমক থাকত। শেখর নিজেও লেখে কিন্তু তার কাগজের পাতা ভরাতে যে লেখা লি হয় তাতে সবসময় হয়তো তেমন চমক থাকে না। না থাক, কিন্তু এই চেষ্টা তো আর কেউ করে তাই পত্রপাঠের অন্তিম সংখ্যা পর্যন্ত আমি লিখতে চাই, অবশ্য শেখর যদি সুযোগ দেয়।

আগস্ট ২০০৩

লেখক-প্রকাশক, বিচিত্র সম্বন্ধ

একজন লেখক এবং একজন প্রকাশকের সম্পর্ক সবসময় মধুর হওয়া উচিত। মায়ের পেটের দুই সন্তানের চেয়েও তাদের বেশি একাত্ম হওয়া উচিত। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় লেখকদের তরফ থেকে অভিযোগ উঠছে। তাঁদের মনে হচ্ছে প্রকাশকরা তাঁদের ঠকাচ্ছেন। যা বই বিক্রি হচ্ছে তার সঠিক হিসেব দিচ্ছে না। প্রকাশকরা সাধারণত লেখক সম্পর্কে অভিযোগ করেন না। কারণ, করার কিছু নেই। তাঁরা জেনেশুনেই লেখকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ছেপেছেন, বিক্রি না হলে লেখকদের দায়িত্ব কোথায়?

বাংলা বই-এর প্রকাশনার ক্ষেত্রে কিছু অব্যবসায়িক পদ্ধতি চালু আছে। লেখক যখন প্রকাশককে তাঁর পাণ্ডুলিপি ছাপার জন্যে দেন তখন সাধারণত কোনো চুক্তি হয় না। এমনকী কত বই ছাপা হবে, কত রয়্যালটি পাওয়া যাবে, তা নবীন লেখকরা জিজ্ঞাসা করেন না চক্ষুলজ্জায়। বছর ঘোরার পর লেখক যখন সবিনয়ে জানতে চান তাঁর বই-এর বিক্রি কীরকম হল তখন প্রকাশক যা জানাবেন তাই-ই সত্যি বলে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। ধরা যাক, প্রকাশক বললেন, মাত্র দুশো দশ কপি বিক্রি হয়েছে। বইটি সাড়ে সাতশো কপি বিক্রি না হলে ছাপার খরচ উঠত না। এটা শোনার পর লেখককে ঢোঁক গিলতে হয়। বেরিয়ে এসে প্রকাশকের সততা নিয়ে সোচ্চার হন। কিন্তু গালাগাল দেওয়ার আনন্দ ছাড়া আর কিছু উপভোগ করতে পারেন না। এবার যদি প্রকাশক তাঁকে বলেন, আর একটা উপন্যাস দিন, এবং পাঠকদের ভালো লাগলে তার টানে আগেরটা বিক্রি হতে পারে, তখন লেখক সানন্দে নতুন উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি জমা দেন।

এ দেশে এটাই নিয়ম। আঠাশ বছরের অভিজ্ঞতায় দেখেছি, তিন কী চারজন প্রকাশক ছাড়া কলেজস্ট্রিটের নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। আনন্দ পাবলিশার্স লেখকদের ঠকান—তা অতিবড় নিন্দুকও বলতে পারবে না। লেখক মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা একটি পয়সা থেকেও বঞ্চিত হন না। দে'জ এবং মিত্র ও ঘোষ সম্পর্কেও একই কথা বলতে পারি। কিন্তু একজন তরুণ লেখক যখন চুক্তি ছাড়া বই ছাপতে দেন তখন তাঁর কোনো ব্যাপারে কথা বলার স্বাধীনতা থাকে কি? আর যদি চুক্তিও করতেন, লেখা হত, এগারোশো কপি ছাপা হবে, বিক্রীত কপির দামের ওপর পনেরো শতাংশ টাকা লেখককে দেওয়া হবে, তাহলে লেখক কি করে জানবেন, এগারোশোর বদলে প্রকাশক বাইশশো ছাপছেন না? দুশো দশ কপির বদলে সাড়ে সাতশো বিক্রি হয়েছে তাও তিনি প্রমাণ করবেন কী করে? করতে হলে বাইন্ডারের কাছে যেতে হয়। তিনি যদি সঠিক কথা বলেন তাহলে প্রকাশককে কাঠগড়ায় তোলা যায়। কিন্তু যে তাকে কাজ এবং টাকা দিচ্ছে তাকে বিপদে ফেলতে বাইন্ডার লেখককে সঠিক তথ্য দেবেন, এটা ভাবা যাচ্ছে না। উলটে লেখক এসব খবর নিচ্ছেন জানাজানি হলে অন্য দরজাগুলো তার জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে।

হ্যাঁ, আপাত চোখে এই ব্যবসা একটু অভিনব। বিক্রির ওপর রয়্যালটি দেওয়া হয় যেখানে সেখানেই

সন্দেহ মাত্রা তুলবেই। যেসব শিল্পীর রেকর্ড বা সিডি গানের কোম্পানিগুলো বাজারে বের ক
তাঁদের অনেকেই ওই একই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু এর বিপরীত ছবিও রয়েছে। একজন পাঠকপ্রিয় লেখকের বই পাওয়ার জন্যে প্রকাশ
মুখিয়ে থাকেন। তিনি জানেন, ওই লেখকের বই ছাপা হলেই বছরে তিন থেকে পাঁচ হাজার বি
হবেই। ওই লেখকের বই পেতে হলে প্রকাশককে লেখকের কথা শুনতেই হবে। শুনেছি এক
একজন লেখক নিজের পরিচিত প্রেসে বই-এর মলাট ছাপাতেন। বাঁধাই-এর সময় প্রকাশকের ে
কত মলাট নিয়ে যাচ্ছে তা লিখে দিয়ে যেত। এর ফলে লেখক জানতেন তাঁর বই কত বি
হচ্ছে। কোনো সফল লেখক বাজারে বই বের হওয়ার সময় নিজের নাম সই করে দিতেন। ও
সফল একজন তো ছাপা থেকে বাঁধাই, এমনকী বিজ্ঞাপন পর্যন্ত নিজের মতো করে করতেন, প্রকাশ
নাম গলানোর অধিকার ছিল না। যে গোরু বেশি দুধ দেয় তাকে সহ্য না করে উপায় কী! লেখ
সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার জন্যে এসব ক্ষেত্রে প্রকাশকরা যথাসম্ভব সততা বজায় রাখেন। এর
দৃষ্টান্ত খুব কম দেখা যাবে যেখানে জনপ্রিয় লেখক এবং তাঁর প্রকাশকের সম্পর্কের অবনতি হয়ে
এটা তখনই হয় যখন লেখকের জনপ্রিয়তায় ভাটার টান আসে।

গত পঁচিশ বছরে বাংলা গল্প-উপন্যাসে যেসব তরুণ লেখক জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তাঁদের স
খুব কম। সুচিত্রা ভট্টাচার্য নিজের পাঠক পেয়েছেন, খুবই ভালো বিক্রি হয় তাঁর বই। তার
কিছুটা বাণী বসু। তবে জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে বাণী অনেক পিছিয়ে আছে সুচিত্রার থেকে। ছেলে
মধ্যে একমাত্র হর্ষ দত্ত কিছুটা পরিচিতি পেয়েছেন। কিন্তু এখনও তাঁকে জনপ্রিয় লেখক বলা
না। জয় গোস্বামীর বিপুল জনপ্রিয়তা তাঁর কবিতার জন্যে, উপন্যাসে তার এক শতাংশও
অথচ এই পঁচিশ বছরে লিখতে শুরু করেছেন এবং লিখে চলেছেন এমন লেখকের সংখ্যা ত
শতাধিক, যাঁদের নাম পত্রিকার দৌলতে আমাদের শোনা। এঁদের বই মাঝেমধ্যে বের হচ্ছে,
এবং বড় প্রকাশনা থেকেই বের হচ্ছে; কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না। পাঠকের মন জয় করতে এঁরা স
হননি। লেখার ব্যাপারে পরিশ্রম, আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই। পুরোনো ধারা থেকে বে
এসে নিজস্ব ভঙ্গিতে এঁদের অনেকেই লেখার চেষ্টা করেছেন। তাহলে জনপ্রিয়তা পাননি ে
বিশেষজ্ঞরা এ নিয়ে বিশ্লেষণ করতে পারেন। পাঠকদের কাছে শুনেছি, তাঁরা বলেছেন, এঁদের
পড়তে গিয়ে, তাঁদের টানে না। অথবা কাহিনী বা চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে বা নিজের পরিমণ্ড
মেলাতে পারেন না তাঁরা। বেশিরভাগ লেখা পড়ে মনে হয় লেখক যেন নিজের কথাই লিখ
অন্য মানুষের আনন্দ-দুঃখ-যন্ত্রণার ছবি ফুটিয়ে তুলছেন না। বা তুলতে চেষ্টা করলে সেটা আরো
বলে মনে হচ্ছে পাঠকের।

যাঁরা বই দু-তিনশোর বেশি বছরে বিক্রি হয় না তাঁর বই ছাপা মানে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হ
আনন্দ পাবলিশার্স এরকম অনেকের বই ছেপেছেন, কারণ তাঁরা নবীন লেখকদের উৎসাহ
চান। অন্য বই থেকে লাভের টাকায় তাঁরা এই পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন। এ ব্যাপারে দে'জ পাবলি
এর সুধাংশ দে বোধহয় এগিয়ে। প্রচুর নতুন লেখককে তিনি বাজারে এনেছেন, নিয়মিত বিজ্ঞ
দিয়ে থাকেন। তাঁর নিজস্ব বই বিক্রির যে চ্যানেল রয়েছে তার মাধ্যমে সেই সব বই বিক্রির চে
করেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাফল্য আসেনি। তবু তিনি ছাপছেন। জনপ্রিয় বইগুলো বিক্রি
যে লাভ হয় তার করভার কমানোর জন্যে কিনা তা জানি না, কিন্তু তরুণ লেখকরা তাঁদের
পেয়ে যাচ্ছেন।

অবশ্য এঁরা কেউ চেঁচিয়ে বলতে পারছেন না, আনন্দ বা সুধাংশ ওঁদের টাকা মেরে দি
যা অন্য প্রকাশকের ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

আমরা যখন তরুণ ছিলাম তখন একজন যুবক লেখক চোখ-ধাঁধানো গল্প কাগজে লিখে বি
হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর লেখার স্টাইল বুদ্ধিজীবী বা শিক্ষিত পাঠককে মোহিত করেছিল। কিন্তু

বই কেনেন, সেই গল্প-উপন্যাস প্রেমিকদের আকর্ষণ করেনি। সেই যুবকের বই একজন প্রকাশক ছেপেছিলেন। কিছুকাল পরে লেখক অভিযোগ তুললেন, প্রকাশক তাঁর টাকা মেরে দিচ্ছে। শুধু অভিযোগ তুলেই ক্ষান্ত হলেন না, সেই প্রকাশকের দোকানের সামনে ধরনা দিলেন। এরকম অভিনব খবর কাগজে ছাপা হল। যুবক লেখক প্রচারিত হলেন, কিন্তু জনপ্রিয় হলেন না। তারপরে প্রায় চল্লিশ বছর চলে গেছে। যুবক এখন বৃদ্ধ। মাঝে মাঝেই লেখেন, তবে লেখার চেয়ে কথা বলেন বেশি, সভায় মাইক পেলেই সফল লেখকদের তুলোধোনা করেন। কিন্তু চল্লিশ বছরেও তাঁর বই বিক্রির পরিমাণ অন্য প্রকাশকদের আকৃষ্ট করল না। বিশেষ এক গোষ্ঠীর প্রকাশনা তাঁকে লেখক হিসেবে বাঁচিয়ে রেখেছে।

এই পরিণতি হয়তো অনেকেরই। যাঁরা একসময় তরুণ ছিলেন তাঁরা এখন প্রৌঢ় হয়েছেন। এমনিতেই বাংলা বই-এর বাজার ছোট হয়ে এসেছে। কলেজস্ট্রিটের প্রকাশকদের, কয়েকজন ছাড়া, নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। এখন পত্রপাঠ সেই সব লেখা বন্ধ করা উচিত যা পাঠককে দূরে সরিয়ে দেবে।

শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ এখনও জনপ্রিয়। কেন জনপ্রিয়, তা জেনে নবীন লেখকদের লেখা শুরু করা দরকার। তাহলে প্রকাশকদের বন্ধুত্ব সহজেই পাওয়া যাবে।

সেপ্টেম্বর ২০০৩

নিজের জীবন আর লেখা যাঁর একা

অনেক ভেবেছি, মানুষটাকে ঠিক কীভাবে চিহ্নিত করা যায়?

বিয়ে না করে সারাজীবন একা থাকা অনেক মানুষকে আমি দেখেছি। বেশিরভাগই বয়স ব সঙ্গে সঙ্গে কাউকেই মেনে নিতে পারেন না। নিজের পৃথিবীতে কাউকে ঢুকতে দিতে তাঁর আ আর্থিক অবস্থা ভালো না হলে অন্যের ছিদ্র অন্বেষণে সময় কাটান। এর কোনোটাই শিবরাম চক্রব মুখ মনে এলে মনে আসে না।

সারাজীবন এক মেসবাড়িতে একা, শিবরাম চক্রবর্তী কি বহেমিয়ান ছিলেন? স্পষ্ট উত্ত না। কোনো নেশা ছিল? নেশা করে পড়ে থাকতেন? তিনি আমাকে বলেছিলেন, "একসময় অ ছিল পান-এর নেশা। পানদোষও বলতে পারো।"

আর এটাই ছিল তাঁর স্বরূপ। লোকে শুনলে ভাববে, প্রথমে ভাববে, খুব পান করতেন। তার মনে হবে পান খেতে ভালোবাসতেন বলে মজা করে বলেছেন। কিন্তু মাথায় ঢুকবে না, শি চক্রবর্তী বলতে চেয়েছেন, তাঁর লেখায় যেমন, কথায়ও, খুব বেশি পান করার প্রবণতাকে পান-এর নেশা বলেছেন। বলেছিলেন, "বুঝলে, যখনই লিখি তখনই শব্দগুলো এমন হুড়মু এসে পড়ে যে লোকে বলে পান করছি। এটা দোষ, খুব দোষ।"

ওইসব লেখা পড়ে আমরা মজা পেয়েছি। কিন্তু একই মজা সরবরাহ করতে করতে তিনি বো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি পান-দোষ মুক্ত হতে চেয়েছিলেন।

জলপাইগুড়ির স্কুলের ছাত্র হিসেবে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। পত্রিকার মাধ্যমে, বই-এর মাধ সেসময় বইপত্র সহজে পাওয়া যেত না। পত্রিকাও চেয়েচিন্তে পড়তে হত। এবং রেবতীভূ আঁকা তাঁর বিখ্যাত ছবি মনে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর হর্ষবর্ধন এবং গোবর্ধন আমারও জানা গিয়েছিল। আর সুন্দরী ভাগ্নীর দল? এঁচড়েই পেকেছিলাম বলে তখনই ভাবতাম, কবে এদের আমার দেখা হবে।

কলকাতায় পড়তে এসে পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পর হস্টেল জীবন শেষ হল। তখনও চ পাইনি। সামান্য টাকায় চাকরি করি সুশীলদার মাসিক পত্রিকায়। থাকার জায়গা নেই। একজন দিল, কলেজস্ট্রিট থেকে হাঁটা দূরত্বে বীণা সিনেমা, তার পেছনে একটি ঘর ভাড়া পাওয়া যাবে দোত বাকিগুলো অন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। ভাড়া পঁচিশ টাকা।

গেলাম। সাত বাই পাঁচ হল ঘরের সাইজ। খাট পাতা যাবে না। বাড়িওয়ালি বললেন, "আই ব্যাটাছেলে, তার ওপর উঠতি বয়স। আমাদের ভাড়াটেদের ঘরে ঘরে অনেক আইবুড়ো মেয়ে ত যদি কেউ নালিশ করে যে তাদের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছ তাহলে ঘর ছেড়ে দিতে হবে ব

সেই অঙ্গীকারে থাকা। প্রথমে ভোরেই এজমালি কলতলায় ভিড় জমবার আগেই পরিচ্ছন্ন বাইরে বেরিয়ে এসে এঁদো চায়ের দোকানে বসে ডবল হাফ চা আর টোস্ট খেতে খেতে যু

মুখস্থ করে ফেললাম। তারপর চোখ তুলতেই শরীরে বিদ্যুতের ধাক্কা লাগল। রেবতীভূষণের কার্টুন যেন সশরীরে হেঁটে চলেছেন। দু'হাতে মুখঢাকা ভাঁড়, বগলে ভাঁজ করা খবরের কাগজ, পরনে জালি গেঞ্জি এবং ধুতি, শুধু বই-এর পাতার ছবিটার বয়স বেড়ে গেছে, এই যা।

হুড়মুড়িয়ে তাঁর সামনে গিয়ে প্রণাম করতে চাইলে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "একি! শত্রুতা করছ কেন? ভাঁড়গুলো উলটে যাবে যে!"

আমি সংকোচে সোজা হলাম,—"আমি আপনার খুব ভক্ত।"

"উঁহু! মনে হচ্ছে তুমি বেশ পাকাপোক্ত।"

"তার মানে?" আমি অবাক।

"ফলো মি।" উনি পাশ কাটিয়ে হেঁটে গেলেন একটা পোস্ট বক্সের সামনে। বললেন, "আমি বগল ফাঁক করছি, তুমি কাগজটা লুফে নেবে। নিয়ে এটার পেটে ঢুকিয়ে দেবে। রেডি?"

আমি আদেশ মান্য করলাম।

বললাম, "এটা তো খবরের কাগজ!"

"হ্যাঁ। আজকের কাগজ। আনন্দবাজার 'ফিরি'তে দেয়। পড়া হয়ে গেছে তাই ধানবাদে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওখানে আমার ভাগনি থাকে। বিকেলে পেয়ে যাবে। পাঁচ পয়সার ডাকটিকিট সে কিনে দিয়ে গেছে বুকপোস্ট করার জন্যে। সকাল দশটার বদলে বিকেলে অর্ধেকের কম দামে পেয়ে যাচ্ছে। যা খরচ তাতে অতটুকু দেরি করলে বাসি হলেও ক্ষতি নেই। কী নাম?"

বললাম।

"কী করো?"

"এম.এ. পাশ করেছি। চাকরি খুঁজছি।"

'খোঁজো। খুঁজে যাও।"

"আমি আপনার বাড়িতে, না না, মেসে যেতে পারি?"

"থাকো কোথায়?"

"বালক দত্ত লেনে।"

"সপরিবারে?"

"না। একা। একটা ঘরে ভাড়া থাকি। বাইরে খাই।"

"চমৎকার। লেখো নাকি?"

"না। মানে, এখনও—"

"বাঃ! তাহলে চলে এসো। লেখকদের আমার খুব ভয়।"

সেই শুরু। তাঁর মেসের ঐতিহাসিক ঘরের কথা অনেকেই লিখেছেন। সেই ঘরের দেয়ালে আমার নাম ওঠেনি, কারণ আমি ছিলাম তাঁর প্রতিবেশী এবং আমার টেলিফোন ছিল না। রোজ বিকেলে সিল্কের শার্ট আর ধুতি এবং পাম্প শু পরে মুক্তারামবাবু স্ট্রিট ধরে হেঁটে বীণা সিনেমার উলটোদিকের বাস স্টপে এসে দাঁড়াতেন। জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—"কোথায় যান রোজ?"

বলেছিলেন সুর করে, "বালিগঞ্জে যাই, সন্ধেটা কাটিয়ে আসি।" যেন রবীন্দ্রনাথের 'বাঁশি' কবিতার সুর শুনতে পেলাম। জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় যাচ্ছ?"

"কফি হাউস।"

"কে কে থাকবে সেখানে?"

"বন্ধুরা। লিট্‌ল ম্যাগাজিন করে ওরা।"

"মেয়ে আছে ওদের মধ্যে?"

"না না।" আমি সতর্ক হলাম।

"সর্বনাশ! তোমার ভবিষ্যতের বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছ হে। রোজ সন্ধেয় কিছু ব্যাটাছেলের মুখ

দেখে কাটাও? তোমার চিত্তের প্যারালাইসিস হয়ে গেল বলে। এই যে আমি বালিগঞ্জ যাই, সুন্দরী তরুণীদের সান্নিধ্যে সময় কাটাই। আহা, কী চঞ্চলতা। রাত ন'টায় যখন টু বি বাসে মেসে ফিরে আসি তখন আমার নবযৌবন প্রাপ্তি হয়ে যায়। চললাম।"

টু বি বাসে চেপে তিনি চলে গেলেন। স্কুলবেলা থেকে জেনে গেছি বালিগঞ্জের তরুণীরা আচ্ছা, সেইসব ভাগনিদের কি বিয়ে হয়নি?

লেখক হিসেবে শিবরাম চক্রবর্তী কি ওই অনবদ্য ছোট ছোট হাসির লেখায় নিজেকে ব্যস্ত খুশি ছিলেন? 'দেশ' পত্রিকার 'অল্পবিস্তর' কি তাঁর প্রতিভার পরিমাপ? জিজ্ঞাসা করতে হেসে ব "সম্পাদক আমাকে বেশি জায়গা দিতে চায় না যে।" তারপর গলা নামালেন, "অল্প লিখলে যখন যায় তখন বেশি লিখতে আলস্যি লাগে।"

কথাটা খুব সত্যি। প্রথম জীবনে নাটক লিখেছেন। নাট্যরূপ দিয়েছেন। সেই নাট্যরূপ নিয়ে ভাদুড়ির মতো মানুষের সঙ্গে মতান্তর হয়েছিল। প্রবন্ধের বই লিখেছেন। এবং শেষতক 'দেশ' প তাঁর অনবদ্য জীবনস্মৃতি—"ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা"। বাংলা সাহিত্যে 'মহাস্থবির জাতকের' প অনবদ্য এবং সরল স্বীকারোক্তি আর কোনো লেখকের কলম থেকে বের হয়নি।

শুনেছি অর্থকষ্টে পড়েছিলেন। প্রকাশকের কাছে নতুন বই বের হলে লেখকের কপিগুলো নিয়েই বিক্রি করে দিতেন। লেখকদের সঙ্গে পরিণত বয়সে মিশতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু সময় পর্যন্ত নিজেকে নিয়ে রসিকতা করে গেছেন অনাবিলভাবে। হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘুরে গেলেন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিন্যুতে। দৌড়ে গিয়ে গল্পকার সুব্রত সেনগুপ্ত তাঁকে তুলল। কিছুই ভান করে বলেছিলেন, "অনেকদিন আকাশ দেখা হয়নি তাই একটু দেখে নিলাম।"

একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। দুপুরে গিয়েছিলাম ওঁর মেসে। দেখলাম ঘরের দরজায় একটু ফাঁক করে দেখলাম তিনি ঘুমোচ্ছেন। খাওয়া অর্ধেক হয়েছে। টেবিলে খাবারের থালায় ভাত। ডাকলাম। চোখ মেলে বললেন, "এসো।"

বললাম, "কী করে ঢুকব? তালা রয়েছে যে!"

"কেৎরে ঢুকে পড়ো। পারবে।" শুয়ে শুয়েই বললেন।

বাইরে থেকে ঠেলতে দুই পাল্লার ফাঁক একটু বড় হতে কোনোমতে আড়াআড়ি ঢুকে প বললাম, "আপনার ঘরে চোর ঢুকতে পারে এভাবে।"

বললেন, "পারে। কিন্তু বেরোতে পারবে না। চেষ্টা করে দ্যাখো।"

চেষ্টা করলাম। যতবার ভেতর থেকে বেরোতে যাচ্ছি পাল্লার ফাঁক ছোট হয়ে যাচ্ছে। বে যাচ্ছে না। উনি হাসলেন,—"এ হল অভিমন্যুর মতো, ঢুকতে পারবে, বেরোতে পারবে না যেমন আমি, সাহিত্যে ঢুকে আর বেরোতে পারছি না।"

ওঁকে কী বলব? বহেমিয়ান? উদাসী? সুনীলদার কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বলি, সংসার সন্ন্যাসীর মতো বাস করতে বাধ্য করেছিল।

ডিসেম্বর ২০০৩

গাঁয়ে মানে না

ছাত্রাবস্থায় কিছু মানুষের নাম শুনতাম, কেউ অসাধারণ পণ্ডিত, কেউ নব্যরীতির আদর্শ প্রচারক, কেউ বুদ্ধিজীবী হিসেবে শাণিত তলোয়ারের মতো। যেহেতু মফস্‌সল থেকে এসেছি তাই নামগুলো শুনে মনে বেশ শ্রদ্ধাভাব জাগত। এতবছর পরে দেখছি সেই নামগুলোর গুরুত্ব খুব একটা কমেনি। কিন্তু এই এত বছরে তাঁদের কী অবদান তা নিয়ে আমি ধন্দে নেই। শ'খানেক সভায় বক্তৃতা, দু-একটি প্রবন্ধের বই, বড় বড় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদ আঁকড়ে-ধরে থাকা তাঁরা কিছুই আমাদের দেননি। এঁরা যেমন ছিলেন তেমন থাকলে আমার আপত্তি হত না। মুশকিল হল, এঁরা যখন নাক গলান, অভিমত দেন এবং কাগজগুলো যখন ফলাও করে ছাপে তখন মানুষ বিভ্রান্ত হয়।

একটা ঘটনা বলি। একদা আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলাম বলেই হয়তো কয়েকবছর আগে আমাকে আকাদেমি কর্তৃপক্ষ শেষ বিচারকদের একজন হতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এছাড়া গত কুড়ি বছরে ওঁরা আমার অস্তিত্ব সম্পর্কেই বোধহয় ওয়াকিবহাল নন। যাহোক, প্রাথমিক নির্বাচনে যেসব বই নির্বাচিত হয়েছিল সেগুলো আমাকে পড়তে পাঠানো হয়, সঙ্গে নিয়মাবলি। সেগুলো পড়ে হাজির হয়েছিলাম ওঁদের অফিসে। গিয়ে দেখলাম কোঅর্ডিনেটর হয়েছেন আমার পরিচিত একজন শ্রদ্ধেয় লেখক। দ্বিতীয় বিচারক তিনি, যাঁর নাম ছাত্রাবস্থা থেকে শুনে আসছি, প্রথম চোখে দেখলাম। তিনি আমার নাম শুনেছেন বলে মনে হয় না। আচ্ছা, আচ্ছা,—বললেন।

টেবিলের ওপর বই রেখে কোঅর্ডিনেটর বললেন, 'প্রথম বইটা নিচ্ছি; এটা?'

বললাম, ভালো লাগেনি।

উনি চুপ করে থাকলেন।

দ্বিতীয় বইটি তোলা হল। বিমল মিত্রের একটি পুরোনো বই-এর নতুন সংস্করণ। উনি বললেন, 'ওঁকেই দিয়ে দাও।'

বললাম, 'এটা আকাদেমির আইনে আটকাবে।'

উনি বললেন, 'আপনি আইনও জানেন নাকি?'

বললাম, 'ওঁরা নিয়মাবলি পাঠিয়েছেন।'

ক্রমশ বুঝতে পারলাম, উনি একটি বইও পড়ে আসেননি। কোঅর্ডিনেটরের কথায় এক তরুণ মুসলিম লেখককে পুরস্কার দিয়ে দিচ্ছিলেন, আমি আপত্তি জানাতে বিরক্ত হলেন।

শেষ পর্যন্ত যিনি যোগ্য তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হল। সে বইটিও উনি পড়েননি। বলা হল, সন্ধ্যায় রেডিয়ো টিভি থেকে নাম ঘোষণা করার আগে আমরা যেন খবরটা কাউকে না বলি।

বিকেলে বাড়ি ফিরতেই ওই বই-এর প্রকাশকের কাছ থেকে ফোন পেলাম। খবর পেয়ে গেছেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ছাপতে দিয়েছেন। আর একবার কন্‌ফার্মড্ হতে চান।

জানতে চাইলাম, খবরটা কে দিল?

প্রকাশক হাসলেন, জবাব দিলেন না।

এবার তসলিমার বই, সরকার ব্যান করার আগে যখন হইচই হচ্ছিল তখন সেই বিখ্যাত মানুষটি সরব প্রতিবাদ কাগজে পড়লাম। তিনি চিরকাল তসলিমার সমর্থক। এবারও। হতেই পারেন। কি সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলে ফেলেছেন, বইটি এখনও পড়েননি। আশা করি ব্যান হওয়ার প নিশ্চয়ই পড়েছেন। না পড়লেও অবাক হব না। সভায় বক্তব্য তো রেখেছেন।

মানছি, এঁদের নিয়ে কথা বলার কোনো মান হয় না। কিন্তু মাঝে মাঝেই এঁরা যে ভূমিকা নি ফেলেন তা স্বস্তি কমায়। যাঁদের কোনোকিছু দেওয়ার ক্ষমতা নেই তাঁরাই একটা বিতর্ককে আঁক ধরে পাদপ্রদীপের আলোয় আসতে চান।

অবশ্য প্রদীপের আলো আর কতটুকু!!

জানুয়ারি ২০০৪

দীপ্তেন সান্যাল (শেখর)

'অচলপত্র' পত্রিকাটিকে আমি প্রথম দেখি ছাত্রাবস্থায়। স্কটিশে পড়ে, কাগজের হেডলাইন দেখে ভেবেছিলাম মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কে কোনো জেহাদ। কৌতূহলী হয়ে কিনলাম। বরিস পাস্তেরনায়কের 'ডক্টর জিভাগো' তখন বিখ্যাত। ওই দুটো শব্দকে এডিট করে হেডলাইন হয়েছে বুঝতে পেরে সম্পাদকের নাম খুঁজলাম। দেখে চমৎকৃত। আমি অচলপত্রের প্রেমে পড়ে গেলাম।

স্কটিশে পড়তাম। সুভাষ বসু, বিবেকানন্দ আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন, ছিলেন দীপ্তেন সান্যাল। কে দীপ্তেন সান্যাল? না, তিনি সাহিত্যিক। নীলকণ্ঠ ছদ্মনামে লিখতেন। ওই যেখানে আমরা রোজ আড্ডা মারি, সেই বসন্ত কেবিনের নামেই ওঁর দারুণ উপন্যাস আছে। রেস্টুরেন্টের কর্মচারী গোকুলদা তাঁকে দেখেছে। দেখেছেন বিপিনবাবুও।

বিপিনকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন স্কটিশের বাংলার অধ্যাপক। তাঁর শিক্ষক-জীবনে যত ছাত্র এসেছে তাদের প্রত্যেকের নাম তিনি জানতেন। সেই নামগুলো ছেপে প্রতিবছর পুস্তিকা বের করতেন। 'আশ্চর্য' শব্দটি দু'বার বলা তাঁর মুদ্রাদোষ ছিল। অবিবাহিত মানুষটি মেসে থাকতেন। মুখের ওপর সত্যি কথা বলতে ভালোবাসতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, স্যার, দীপ্তেন সান্যাল আপনার ছাত্র ছিলেন?

প্রৌঢ়ের মুখে অদ্ভুত অভিব্যক্তি,—আশ্চর্য, আশ্চর্য! এ নাম কেন? হাড়ে বজ্জাত, অত্যন্ত দুষ্ট। পড়া করে আসেনি বলে শাস্তি দিয়েছি—বেঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াও, তা সে সোজা উঠে দাঁড়াল জানলায়। ওই অত বড় জানলা, কোনো আড়াল নেই। বলে কিনা, শাস্তি প্রত্যাহার করুন, নইলে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করব। আশ্চর্য, আশ্চর্য!

দৃশ্যটি কল্পনা করে মজা পেতাম।

—ছাত্র হিসেবে কেমন ছিলেন?

বিপিনবাবু মাথা নাড়লেন,—খুউব ভালো। কিন্তু আশ্চর্য, অপমান করেছে।

—আপনাকে?

—হ্যাঁ। কলেজে পড়াতে এল। অন্য যে কলেজে আমি পার্টটাইম পড়াই সেখানে এসে প্রণাম করে পাশের চেয়ারে বসে সিগারেট ধরাল। আমি হতভম্ব। তা সে বলল, টিচার্স রুমে যখন তাকে বসতে হবে, আর সিগারেটের নেশা যখন আছে, তখন এ ছাড়া কোনো উপায় নেই; তাছাড়া তার ষোলো বছর বয়স হয়ে গেছে। আশ্চর্য, আশ্চর্য!

বিপিনবাবুকে অবশ্য অপমানিত বলে মনে হচ্ছিল না।

তেতাল্লিশ বছর আগে শোনা কথাগুলো এখনও স্পষ্ট মনে আছে। তখন বুঝে নিয়েছি, দীপ্তেন সান্যাল একটি ডাকাবুকো যুবকের নাম। ডাকাবুকো না হলে অচলপত্র বের করা যায় না। ফণীমনসার কাঁটার ঘায়ে চারপাশের দুর্নীতিকে বিদ্ধ করতে তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ওরকম একটা কাগজ বের করার চিন্তা ওঁর আগে কেউ করেছেন কি না জানি না। বোধহয় না।

এত বছর পরে শেখর কোনো স্বপ্নে দীপ্তেন সান্যালকে দেখল জানি না কিন্তু 'পত্রপাট' আত্মপ্ করল। অচলপত্রের জুতোর মাপ শেখরের চেয়ে বেশ বড় হলেও সেটা মানিয়ে নিতে চাইছে প্রাণ মুশকিল হল, দীপ্তেন সান্যাল সহ-লেখক হিসেবে যেসব ক্ষমতাবান মানুষকে পেয়েছেন শেখর ত পায়নি। কিন্তু অচলপত্রের কিছু তরুণ লেখককে সে পত্রপাঠে লেখাতে পারছে। তাঁদের বয়স হ অচলপত্র ছিল টগবগে যৌবনের প্লাটফর্ম। এখনকার নামী লেখকরা নানান কারণে শেখরকে এড়িয়ে যান নয় বাঁ হাতে কর্তব্য সারেন। তবু বাংলা ব্যঙ্গ সাহিত্যের একমাত্র পত্রিকা বের শেখর একাই বুঁদির গড় রক্ষা করে চলেছে। দীপ্তেন সান্যালের আত্মা এই শ্রদ্ধায় নিশ্চয়ই শান্তি পা

কলকাতার যে এলাকায় আমি থাকি সেই এলাকার সাংসদের নাম শ্রীযুক্ত সুদীপ বন্দ্যোপাধ সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, একগাল দাড়ি, চমৎকার বক্তৃতা করেন। গেল বারের নির্বাচনের শ্যামপুকুরের প্রান্তে বড় আসর বসেছিল। তাঁর পাশে ছিলেন দিদিমণি।

সে কী জ্বালাময়ী ভাষণ! দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তাদের সাহায্যে সেই ভাষণ ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে তাই শুনে পাড়ার বটাদা আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়েছিলেন,—আহা!

এই বটাদাকে আমি খুব খাতির করি। বিয়ে-থা করেননি। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ছিলেন সারাজী পরীক্ষা দেননি, কারণ প্রমোশন হলে তাঁকে অফিসে সময় বেশি দিতে হবে। কিশোর বয়স নাটক-টাটক নিয়ে মেতে আছেন। এঁর বয়স এখন আশির ওপরে। জীবনের বেশ খানিকটা পেশাদারি মঞ্চের উইংসের পাশে দাঁড়িয়েও প্রম্পট করে গেছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলা মানেই ন ইতিহাসের মণিমাণিক্য পাওয়া। জিজ্ঞেস করলাম,—কী হল দাদা?

'ফণিবাবুর কথা মনে পড়ছে?' বটাদা চোখ বন্ধ করলেন।

'তিনি কে?'

'আঃ! আপনি লেখক, আপনার মুখে এই প্রশ্ন মানায় না। বড় ফণি, ছোট ফণি-র নাম শোনে যাঁরা যাত্রার আসর একাই কাঁপাতেন?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনেছি, দেখিনি।'

'এই গলা ওদিকে গেল, তো তারপরেই গলা এদিকে। তখন তো মাইক ছিল না। দরকা হত না। শব্দের ঢেউ খেলে যেত। কী সুর! আহা! দিদিমণির বক্তৃতা শুনে সেইসব স্মৃতি উথ উঠল। সেই সোনার দিন ফিরিয়ে আনলেন তিনি। শুধু—'

'শুধু?'

'চোখ বুজে শুনতে হবে এঁর বক্তৃতা। চোখ খুললেই চোনা। ওরকম লালচে মুখে রাগ ফুটি তো ওঁরা বলতেন না!'

'আপনি ছেলেদের সঙ্গে ওর তুলনা করছেন? মেয়েরা—'

'মেয়ে? জ্যোৎস্না দত্ত? বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়? হ্যাঁ, খুব বড় অভিনেত্রী। কিন্তু এঁর গলার জো কাছে শিশু। ওঁরা সংলাপ মুখস্থ করে আবেগ দিয়ে শোনাতেন আর ইনি আবেগ মুখস্থ করে সংলা ঝড় তোলেন। বাহ্!' বটাদা চোখ খুলেন।

'আর সুদীপবাবু?'

'অনেক বিখ্যাত অভিনেতা আছেন যাঁরা ফিল্মে খুব জনপ্রিয়, শ্যামবাজারের থিয়েটারেও হাতত পান। যাত্রায় যখন সিনেমার অভিনেতাদের ডাকা শুরু হল তখন এঁদেরই ডাক পড়ল আগে। গেল অনেকেই সুবিধে করতে পারছেন না। দর্শকদের মনে হল মিনমিন করছে; বোদ্ধারা বল আন্ডার অ্যাক্টিং যাত্রায় চলে না। সবাই তো আর উৎপল দত্ত বা অজিতেশবাবু নন। এই সুদীপ আন্ডার অ্যাক্টিং করেন যেটা ওই দিদিমণি পাশে থাকায় বেশ তরিয়ে যাচ্ছে।'—বটাদা হাসলেন, 'ভদ্রলোক জিতে যাবেন।'

সেবার সুদীপবাবু সাংসদ হয়েছিলেন। ওঁর চিত্রাভিনেত্রী স্ত্রীও এম এল এ হয়েছিলেন। দিদিমণির সোনার সংসার হয়েছিল। দিদিমণির এমনই মহিমা যে অভিনেতা তাপস পাল কেন, রাম-শ্যাম-যদুকেও আলিপুরের আসনে জিতিয়ে আনতে পারতেন।

এম এল এ-র সংখ্যা এত কম থাকায় পশ্চিমবঙ্গে সুবিধে হল না, দিদিমণি দিল্লিতে ইট পাতলেন। বাজপেয়ী একটু নরম হন তো আদবানি বাধা দেন। দিল্লিতে মিস ডিগবাজি ব্যানার্জীর নাম প্রচারিত। অতীতই সাক্ষী দিচ্ছে। শেষপর্যন্ত মন্ত্রী হওয়ার যখন ডাক এল তখন দেখা গেল বেচারা সুদীপবাবুও তালিকায় আছেন। ভাইকে নিয়ে মন্ত্রীসভায় যেতে দিদির তো ভালো লাগার কথা। তাহলে দারা মুরাদদের ঔরঙ্গজেব সরিয়ে দেবেন কেন? তাঁরাও তো ওঁর ভাই ছিলেন! আমিই যেখানে দলের শেষ কথা সেখানে আমার পাশে একজন তল্পিবাহককে জায়গা দেওয়া মানে আমাকেই অপমান করা।

দিদি নিজের নাক কেটে সুদীপের যাত্রা ভঙ্গ করলেন। বিজেপি-র নেতারা মজা পেয়ে গেলেন। তাঁরা তোল্লাই দিতে লাগলেন সুদীপবাবুকে। শেষ পর্যন্ত দপ্তরবিহীন মন্ত্রী করে তাঁরা দিদিকে বাঁধতে চাইলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ থেকে আদবানি সাহেব সুদীপবাবুকে আশীর্বাদ করলে দিদির তো বদহজম হবেই। কোনো কারণ ছাড়াই সুদীপবাবুকে কাঁটা বলে স্থির করলেন। তাঁকে জব্দ করলে তা থেকে অন্যেরা এমন শিক্ষা পাবে যে আগামী দিনে শান্তিতে রাজত্ব করা যাবে।

কিন্তু শুধু কাঁটা তুলে উনি খুশি নন, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চান। কলকাতার মেয়র ছাড়া আর ভালো কাঁটা কোথায় পাওয়া যাবে। সেই দপ্তর বণ্টন থেকে শুরু করে হকার ইস্যু নিয়ে সুব্রত মুখোপাধ্যায় যখনই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চেয়েছেন তখনই দিদি তাঁকে দাবড়েছেন। উলটে জরুরি মিটিংগুলোর সময়ে সুব্রতবাবু কলকাতা ছেড়ে গেছেন নানান অছিলায়। এসব মেনে নিলেও মেনে নেননি দিদি। তাছাড়া এখন আর দলের কয়েকজনকে দাদা বলে সমীহ করার ইচ্ছে হয় না। সুদীপবাবুর আসনে সুব্রতবাবুকে বসিয়ে দিলে দু'জনকেই টাইট দেওয়া যাবে।

সুদীপবাবু যদি দল ছেড়ে নির্দল হয়ে দাঁড়ান তাহলে তাঁর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আর তিনি ভোট কেড়ে নিলে সুব্রতবাবু ধরাশায়ী হবেন। কলকাতার এক-চতুর্থাংশ মানুষ যদি তাঁকে না চায় তাহলে মেয়র পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দিতে দিদি দেরি করবেন না।

আচ্ছা এসব তথ্য কি সুব্রতবাবু বা সুদীপবাবু জানেন না?

জানেন। তবু সুদীপবাবুকে আজও দিদির স্তুতি করতে হচ্ছে, যদি শেষপর্যন্ত আসনটা তাঁকে ভিক্ষে দেন! তাঁর স্ত্রীকে বলতে হচ্ছে, দিদিই তাঁকে রাজনীতিতে এনেছেন তাই তাঁর প্রতি তিনি অনুগত।

আর সুব্রতবাবু? জানেন, পানীয়ে বিষ মেশানো আছে, কিন্তু ভাবছেন শিবের মতো তা গলায় ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে বেঁচে থাকবেন। নিজের ওপর বিশ্বাস থাকা ভালো তবে অন্ধকে কে দিন দেখাবে!!

(এক)

আমাদের পাড়ার জগুবাবু মারা গিয়েছেন। ওঁর নামের পাশে কোনো এ বি সি ডি নেই। কিন্তু মানুষটিকে আমরা পছন্দ করতাম বলেই শ্মশানে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম জগুবাবুর আগে আরও তিনজন সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন। দু'জন ইলেকট্রিক চুল্লিতে জ্বলছেন। তাঁরা ছাই হয়ে গেলে দু'জন ঢুকবেন। তারপর জগুবাবুর সুযোগ। অর্থাৎ ঘণ্টা দেড়েক তাঁকে শুয়ে থাকতে হবে এখানে।

কয়েকজন গেল শ্মশানের অফিসে নাম লেখাতে। আর তখনই বিরাট ট্রাকে ফুলে ফুলে শোভিত হয়ে আর একজন এলেন। তাঁকে যাঁরা নিয়ে এলেন তাঁদের চালচলন বলে দিচ্ছিল, ক্ষমতা হাতের মুঠোয়। এবং তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে গেল, যাঁরা এখন চুল্লিতে জ্বলছেন তাঁদের জ্বলুনি শেষ হয়ে গেলেই নবাগত ভেতরে ঢুকবেন। 'অপেক্ষা' শব্দটির ধার ধারেন না ওঁরা।

অতএব তর্কবিতর্ক শুরু হল। রাঘববোয়ালের মতো দেখতে ওঁদের এক নেতা বললেন,—অ কথা বাড়াবেন না। দাদা জীবনে কখনও লাইনের দু'নম্বরে দাঁড়াননি; ডেডবডি হয়ে যাওয়ার সেই বদনামে জড়াতে দিতে পারি না আমরা। বুঝতেই পারছেন আমাদের হাত অনেক ল

সেটা টের পেলাম শ্মশান-কর্মীর কথায়। বেমালুম বলে দিলেন,—আপনারা আসার অনেক আ উনি খবর পাঠিয়ে নাম্বার বুক করে রেখেছেন। গোলমাল করে কোনো লাভ নেই, আমি চ খোয়াতে পারব না।

অতএব ড্যাংডেঙিয়ে নবাগত ডেডবাবু চুল্লির ভেতরে ঢুকে গেলেন।

(দুই)

বন্ধুর জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়েছিলাম বোলপুরে। গিয়ে হোটেলে উঠেছি। কথা ছিল বি চারটের সময় পাত্রীপক্ষ এসে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। আমরা দু'জন স্নান-খাওয়া সেরে করছি। শুনেছি পাত্রী স্কুলে পড়ান। সুন্দরী। এই সময় দরজায় টোকা। একটি যুবক ঘরে ঢুকে বলল দাদা আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

দাদা এলেন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা তিরিশের কোঠার মানুষ। এসে জিজ্ঞেস করলেন,— আপন দু'জনের মধ্যে পাত্র কে?

বন্ধুকে দেখিয়ে দিলাম। বললেন,—কলকাতা থেকে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

—দেখুন, আমার মা চাইছে আমি বিয়ে করি। বহুত মেয়ে দেখলাম, কিন্তু একটাকেও হয়নি, হঠাৎ গতকাল যাকে একপলক দেখলাম, তাকে মনে ধরে গেল। কিন্তু শুনলাম আজ কল থেকে পাত্র আসছে তাকে দেখতে। আমি থাকি সিউড়িতে। আপনারা পাত্রী দেখে পছন্দ করে আমি তো ওই পাত্রীকে বউ হিসেবে পাব না। তাই আপনাকে দুটো প্রস্তাব দিচ্ছি। এক, পাত্রী বলবেন, আদৌ পছন্দ হয়নি। 'গিয়ে জানাব' বলবেন না। নয়তো, একটু পরেই কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্স আসবে, তাতে আপনি কলকাতায় ফিরে যান।

অবাক হলাম,—ফিরে যাব?

—আপনি যাবেন না, পাত্র যাবেন। আমি আপনার বন্ধু হয়ে পাত্রী দেখতে যাব। আপনি আমার বন্ধু হবেন।—মাথা নাড়ল লোকটি।

প্রতিবাদ করলাম,—এসব কী বলছেন? ওর নাড়িনক্ষত্র পাত্রীপক্ষ জানেন।

—জানতেই পারেন। ওকে তো চোখে দেখেননি। আমায় দেখবেন।

—আপনি নিশ্চয়ই পাগল, নইলে এরকম প্রস্তাব কেউ দেয়?

—পাগল কি না তা টের পাবেন কথা না শুনলে। বীরভূমে আমার কথা না শুনলে কী তা ওকে জিজ্ঞাসা করুন।

যাকে দেখানো হল সেই ছেলেটি তখন দরজায়। ঠোঁট বেঁকাল সে।

শেষপর্যন্ত স্থির হল, আমরাই পাত্রী দেখতে যাব এবং নাকচ করে আসব। আর নাকচ যে কা সেটা বোলপুর ছাড়ার আগেই এঁরা যাতে জানতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। কীভাবে হবে তাও আমাদের জানিয়ে দেওয়া হল। পাত্রী দেখার পরই লোকটির সঙ্গী সেখানে হাজির জানতে চাইবে বিয়ের দিন কবে ঠিক হল। পাত্রী-পক্ষের সামনে আমাদের বলতে হবে, বিয়ের কে কথাই ওঠে না, কারণ পাত্রী পছন্দ হয়নি।

সেই বিকেলে আমরা পাত্রী দেখতে গিয়েছিলাম। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী, শান্ত স্বভাবের। আ বন্ধুর খুব পছন্দ হয়েছিল। আমি তাকে সাহসী হতে উৎসাহিত করেছিলাম। ছেলেমেয়েকে কিছু

আলাদা কথা বলার সুযোগও দেওয়া হল। তারপরেই হাজির হল ওই ছেলেটি। এসেই বলল,—তোমরা আমাকে ফেলে চলে এসেছ! যাকগে, বিয়ের দিন কবে ঠিক হচ্ছে?

আমার বন্ধু কিছু বলার আগেই পাত্রী বললেন,—বিয়ে? অসম্ভব। আমি এখানে বিয়ে করতে পারব না বাবা।

পাত্রীর বাবা হতভম্ব—সেকি! কেন মা?

—ওঁর সঙ্গে কথা বলে মনে হল উনি খুব ভিতু। এখানে বিয়ে দিলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

পাত্রী ভেতরে চলে গেল।

হোটেলে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যেই খবর পেয়ে গেছেন সিউড়ির নায়ক। এসে বললেন,—খুব বেঁচে গেলেন। আরে, মেয়েরা চিরকাল সাহসীদের চায়, বুঝলেন?

ফেরার পথে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম,—নিভৃতে কী কথা হয়েছিল তোদের?

বন্ধু বলল,—বলেছিলাম ওঁকে আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু হোটেলে একজন মাস্তান এসে আমাকে শাসিয়েছে, পছন্দ হয়নি বলতে হবে। বাধ্য হয়ে আমি তাই বলব। উনি যেন কিছু মনে না করেন।

জিজ্ঞেস করলাম,—এসব শুনে উনি কিছু বললেন?

—একটা কথাও না।

আমি জানিনা সেই বীরপাত্র ওই পাত্রীকে সিউড়িতে নিয়ে যেতে পেরেছেন কি না।

(তিন)

যখন এম.এ. পড়তাম তখন দুটি বিষয় খুব খারাপ লাগত বলে পড়িনি। পরীক্ষা এগিয়ে এলে বুঝলাম ওই দুটিতেই ডাহা ফেল করব। যিনি পড়াতেন ও পরীক্ষক ছিলেন তিনি আমাদের হস্টেলের সুপার ছিলেন। খুব কড়া মানুষ। দু-চোখে দেখতে পারতেন না আমাদের। কিন্তু ক্লাসের সুন্দরী মেয়েদের দেখলে জল হয়ে যেতেন। তাঁদের মধ্যে যে মেয়ে সুন্দরী সে ওঁর অফিসঘরে গিয়ে গা ঘেঁষে বসলেও রাগ করতেন না। খবর রটল—সেই সুন্দরীকে তিনি ওই দুটি বিষয়ের সব প্রশ্ন সাজেশন হিসেবে জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা ছুটলাম সেই সুন্দরীর কাছে। তিনি সরু ভ্রূ ধনুকের মতো বাঁকিয়ে বললেন,—উনি আমাকে ভালোবেসে যা দিয়েছেন তা আপনাদের কেন দেব?

কাকুতি-মিনতিতেও কাজ হল না। খবর পেলাম, অন্য একটি বিষয়ের সব প্রশ্ন আর এক সুন্দরী প্রৌঢ় অধ্যাপকের চেয়ারের হাতলে বসে সংগ্রহ করে ফেলেছেন। তিনিও আমাদের পাত্তা দিতেন না। তখন খুব আফশোস হত, কেন মেয়ে হয়ে জন্মালাম না। আর যেসব মেয়ে সুন্দরী নন অথবা ভালো পড়াশোনায়, তাঁরা বলতেন, এত খেটে পড়ছি আর ওই বেহায়া মেয়েদুটো মুখস্থ করে উত্তর লিখে আমাদের থেকে বেশি নম্বর পাবে।

আমাদের হস্টেলটির বয়স হয়েছিল। জীর্ণ দশা চোখে পড়ত। অতএব সবাই সই করে আনন্দবাজারে চিঠি ছাপালাম, যে-কোনো দিন আমরা চাপা পড়ে মরতে পারি। এখনই হস্টেল ভেঙে ফেলা হোক। তখন যিনি বার্তা সম্পাদক ছিলেন তিনি সুপার-অধ্যাপককে চিনতেন। চিঠি ছাপাবার ব্যাপারে তাঁর সাহায্য কাজে লেগেছিল।

হস্টেল ভেঙে গেলে সুপার গৃহচ্যুত হবেন। তাই চিঠি ছাপামাত্র তিনি ছুটে এলেন ঘরে। গালাগাল দিয়ে আমাদের ভূত ভাগানোর চেষ্টা করলেন। বললেন এখনই আবার চিঠি লিখে ক্ষমা চাইতে। বলতে হবে, বাড়াবাড়ি হয়েছে, হস্টেল ঠিকই আছে।

কিন্তু অত শাসানিতেও আমরা অনড়।

সেই রাত্রে আবার যখন তিনি আমাদের কাছে এলেন তখন তাঁর গলার স্বর একটু নরম। সেই

সুযোগে বললাম,—স্যার, আপনার পেপার পড়া হয়নি। অথচ ওই সুন্দরী সব উত্তর ঠিকঠাক লি আর আমরা বঞ্চিত হব?

তিনি বললেন,—তোমরা চিঠি লেখো, আমি দেখছি।

বললাম,—স্যার প্রশ্ন জানতে না পারলে কেউ চিঠি লিখতে চাইছে না।

উনি তখন দশটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে বললেন,—এরপর যদি ভ্রম সংশোধন না করো তাহলে দেখার সময় বুঝবে মজা।

পরীক্ষার সকালে হঠাৎ সেই সুন্দরী এসে হাজির। তাঁর কানে খবর পৌঁছেছে। আদুরে ভ ভঙ্গিতে বললেন,—স্যারদের তো বিশ্বাস নেই, আমাকে যা দিয়েছেন তার সঙ্গে আপনাদেরটা না মেলে—!

আমরা মেলালাম। দেখলাম একটা বাদে সব প্রশ্ন আলাদা। জানার পর তিনি চোখ বড় করলে দেখলেন? কী অসভ্য! এখন কোনটা সত্যি?

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বলল আমাদেরটা মিথ্যে নয়।

পরে চিঠি ছাপা হলে স্যার আমাদের ধন্যবাদ জানাতে এসে সুন্দরীর কথা জানালাম। যে স্যার সঠিক প্রশ্ন জানাননি এইজন্যে সে অসভ্য বলেছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন,—বল সে তোমাদের নিজের বানানো প্রশ্ন দেখিয়েছে। অসভ্য মেয়েমানুষ। খাতা দেখার সময় টের প

(চার)

লক্ষ্য করেছি, ক্ষমতায় যাঁরা থাকেন তাঁদের চারপাশের চেয়ার আগে থেকেই দখল করে নে কায়দাটা কারও কারও চমৎকার জানা থাকে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে সারাবছর পাওয়া যায় না। সর কর্মে ব্যস্ত থাকেন। বইমেলার সময় তিনি মেলায় এলে গিল্ডের অফিসে খানিকক্ষণ বসেন। তাঁর চারপাশের চেয়ারগুলোয় বসে যাঁরা সবসময় মুখে হাসি মাখিয়ে থাকেন তাঁদের কেউ একদা লিখতেন, পাঠকের মন জয় করতে পারেননি। কেউ কেউ মানের বই ছাপেন, কিন্তু সময় বড় প্রকাশক হয়ে যান। তখন পরদা সরিয়ে ওই ঘরে ঢুকলে সবাই এমন চোখে ত যে প্রত্যেককে উচ্চপদস্থ সিকিউরিটি অফিসার মনে হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ঠিক পাশের আসন সচরাচর কেউ বসেন না। যেন জায়গাটাকে অপবিত্র করতে কেউ চান না। বুদ্ধদেব গুহের মানুষ, যিনি মনের কথা মুখে বলতে অস্বস্তি বোধ করেন না, তিনি সেখানে বসলে যেসব বলেন তাতে লোকগুলো গম্ভীর হয়ে যান, যদিও মুখ্যমন্ত্রী সেটা উপভোগ করেন। লক্ষ্য কা বুদ্ধদেবদা কতক্ষণে উঠে যাবেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে, সেইজন্যে উদ্‌গ্রীব থাকেন সবাই। প্রথ আমি ওই ঘরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর (তখনও তিনি মুখ্যমন্ত্রী হননি) পাশে বসে জিজ্ঞেস করেছিলা কেমন আছ?

তিনি জবাব দিয়েছিলেন,—চলছে! আপনি?

কিছুক্ষণ কথা বলার পর যখন বেরিয়ে এলাম তখন একজন প্রকাশক পেছন পেছন এসে অনুযে গলায় বলেছিলেন,—ওঁকে 'তুমি' বললেন; আগে চিনতেন?

বললাম,—হ্যাঁ। ওঁর দাদা আমার বন্ধু। ছাত্রাবস্থা থেকে চিনি।

—তা হোক। এখন তো উনি ভাবী মুখ্যমন্ত্রী, এখন ওঁকে 'তুমি' বলাটা ঠিক হল না। প তো মর্যাদা আছে!

—এখানে কি উনি মন্ত্রী হিসেবে এসেছেন? বুক সেলার্স গিল্ড তো স্ব-শাসিত সংস্থা। তা মন্ত্রী বলে আমার বন্ধু কি ওর ভাইকে 'আপনি' বলে থাকে?—জিজ্ঞেস করেছিলাম।

হ্যাঁ। মুখ্যমন্ত্রী যখন সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকবেন তখন ব্যক্তিগত পরিচয়ের সূত্রে তাঁর

কথা বলা উচিত নয়। কিন্তু তিনি একজন মানুষ, একজন রোমান্টিক পাঠক ও লেখক, এটা এইসব স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির মগজে ঢোকে না।

হ্যাঁ, সরকারের প্রয়োজন হয় কিছু মানুষকে। নাটকের ক্ষেত্রে দু-চারজনকে বেছে নেন তাঁরা, যাঁদের মাধ্যমে ওই শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা যায়। সিনেমা, খেলা, এমনকী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমন নির্বাচন ইদানীং ঘটছে। এই বেছে নেওয়ার ব্যাপারে যে ভুল হচ্ছে না তা নয়। কিন্তু বাছাই হওয়ার জন্যে যাঁরা লাইন দিয়ে বসে আছেন তাঁরা জানেন, কাজ হয়ে গেলে লাঠি ঘোরাবার সুযোগ পাবেন। সেক্ষেত্রে তিনি দীর্ঘকাল ধরে যা লিখেছেন তা পাঠকরা বর্জন করলেও কিছু এসে যায় না। প্রতিভাবান উত্তরসূরিদের তাঁর কাছে এসে মাথা নোয়াতে হবে, এর চেয়ে আনন্দ তো লিখে তাঁরা পেতেন না!

ফেব্রুয়ারি ২০০৪

প্রবোধবন্ধু অধিকারীর নাম এখন ক'জন মনে রেখেছেন? যাত্রাশিল্পের মানুষজন তাঁকে এক 'যাত্রাবন্ধু' বলত, কারণ আনন্দবাজার পত্রিকার নাটক-যাত্রার পাতাটি তিনি সম্পাদনার সূত্রে যাত্রাশি আধুনিক চেহারা দিতে চেষ্টা করেছিলেন। শুধু সম্পাদক হিসেবে দূরে থেকে যাননি, মাঠেঘাটে পড়েছিলেন। আনন্দবাজারের এক-দুই পাতা জুড়ে যাত্রাদলের যে বিজ্ঞাপন ছাপা হত তার চল হয়ে তাঁরই হাতে। আমি সামনে বসে তাঁকে সেইসব যাত্রাপালার বিজ্ঞাপনের খসড়া করতে দে বিডন স্কোয়ারে যাত্রা উৎসব শুরু করেছিলেন তিনি। কিন্তু ওটাই তাঁর পরিচয় ছিল না।

ষাটের দশকে যে দশ-বারোজন তরুণের হাতে দুর্দান্ত ছোটগল্প ছিল, তাঁদের মধ্যে যেমন দী বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, তেমন প্রবোধবন্ধু অধিকারী—বিমল কর যাঁর সম্পর্কে ছিলেন অ আশাবাদী। 'দেশ'-এ তাঁর লেখা বিখ্যাত গল্পগুলোর কথা এখনও মনে পড়ে। সেই দশ-বারোজ অনেকেই আজ হারিয়ে গিয়েছেন অথবা নেই; প্রবোধবন্ধুও চলে গিয়েছেন। কিন্তু যাওয়ার আ তিনি সরে গিয়েছিলেন সাহিত্যের জগৎ থেকে।

সে এক সময় ছিল যখন আমি, দুলেন্দ্র ভৌমিকেরা সাহিত্যের নেশায় আকৃষ্ট হয়ে আড্ডা মা যেতাম প্রবোধদার কাছে। বিকেল পেরোলেই আগেকার আনন্দবাজারের ছাদের ক্যান্টিনে বসত আ শেষ হত রাত সাড়ে এগারোটায় পবিত্র পাঞ্জাবি রেস্টুরেন্টে। টলস্টয় থেকে রবীন্দ্রনাথ, মোরা থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—কী না ছিল আলোচনার বিষয়। আনন্দবাজারে কাজ করতেন প্রবো কিন্তু তখন যাত্রা তাঁর বিষয় হয়ে ওঠেনি।

এক বিকেলে হাজির হতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—সকাল থেকে একটা কথা মনে আস একটাই তো জীবন, তার সময়সীমাও বেশি নয়, আমি যদি সিরিয়াস হয়ে লেখালেখি করি তা কতটা দাগ রেখে যেতে পারব?

—তার মানে?

—আজ যেমন আমরা তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণকে মনে রেখেছি, পঞ্চাশ বছর পরে কতজন আম মনে রাখবে?

—এটা বলা সম্ভব নয়, সময় বিচার করবে।

—দূর! সেই বিচার কী হল তা জানতে তো আমি থাকব না। নাঃ, অত ধৈর্য আমার নে যাকিছু করতে হবে তা খুব দ্রুত করা উচিত।

—কিন্তু দাদা, সাহিত্য তো ওভাবে হয় না!

—কীভাবে হয়? আচ্ছা, বলো তো, ক'জন শিক্ষিত বাঙালি সাহিত্য পড়েন?

—শিক্ষিতদের টেন পার্সেন্ট।

—তোমার মাথা খারাপ; এক কোটি শিক্ষিত বাঙালির টেন পার্সেন্ট হল দশ লক্ষ। তার এক পার্সেন্টও পড়ে না। কাদের জন্য লিখবে?

এক বন্ধু গাড়ি কিনেছে। বিকেলে আমরা তাতে চাপলাম। তখন কলকাতা এতবড় ছিল না। পনেরো মিনিটের মধ্যে মাঠ, চাষের খেত, গ্রামবাংলা। শুনশান রাস্তা। একটা কালভার্টে কয়েকজন আড্ডা মারছেন, গ্রামের মানুষ। প্রবোধদার অনুরোধে গাড়ি থামল। প্রবোধদা ওঁদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা ভাই, শরৎবাবুর নাম শুনেছেন, শরৎবাবু?

—কোন শরৎবাবু?—লোকটি বিড়ি টানছিল।

—শরৎচন্দ্র।

—ও, শরদ্দা! সামনের বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে সোজা গেলেই ওঁর দোকান দেখতে পাবেন। তবে এখন দোকান বন্ধ, পাঁচটার পর খুলবে।

—না না ওঁর কথা জিজ্ঞাসা করছি না, যে শরৎচন্দ্র লিখতেন। এই নভেল-নাটক—

—অ! তাই বলুন। সিনেমার পোস্টারে নাম দেখেছি। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি'। তবে যাই বলুন, আমাদের ভৈরববাবুর কাছে কেউ লাগে না।

—ভৈরববাবু?

—একি? নাম শোনেননি? ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়। যে-কোনো অশিক্ষিত লোকও ওঁকে একডাকে চেনে। হ্যাঁ, কলম বটে। কী সংলাপ! লেখক তো ওই একজনই।

গাড়ি চালু হল। প্রবোধদা আমার দিকে তাকালেন। তারপর হো হো শব্দে হেসে উঠলেন,—কী হে! সময়বাবু কী বিচার করল? না না, ওই লোকটাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তোমাদের কফিহাউসের অনেকেরই বক্তব্য, শরৎচন্দ্র পড়া যায় না; ট্র্যাস, সিলি। ব্যস, বিচার হয়ে গেল?

মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ক'দিন বাদে আনন্দবাজারের আড্ডায় গিয়ে শুনলাম প্রবোধদা গল্প-উপন্যাস লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। বললেন,—দূর! কী হবে? আমি একটা দাগ রেখে যেতে চাই।

—কীভাবে?

—সেটাই তো ভাবছি। পথ খুঁজছি।

পোকাটা আমার মাথায় ঢুকে গেল। সে এক সময় ছিল, যখন শিক্ষিত বাঙালির সঙ্গে আলাপ হলেই প্রশ্ন করতাম,—তিতাস পড়েছেন?

—তিতাস? কার যেন লেখা? সন অফ দ্য সয়েল, আই মিন রিভার? নামটা ভুলে গিয়েছি ভাই। বই-এর নাম মনে আছে, পড়া হয়নি।

—রঙ রুট?

—বাংলা বই?

—হ্যাঁ। বরেন বসু হলেন লেখক।

—ওয়েল, নাঃ।

—হাঁসুলি বাঁক?

—সময় পাই না, বিশ্বাস করুন, একদম সময় পাই না।

শেষপর্যন্ত একটা লিস্ট বানালাম। বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তর, রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, তারাশঙ্করের হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, বিভূতিভূষণের আরণ্যক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি, সমরেশ বসুর টানাপোড়েন, অদ্বৈত মল্লবর্মনের তিতাস একটি নদীর নাম, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পারাপার, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে, প্রফুল্ল রায়ের কেয়াপাতার

নৌকো, মুজতবা আলির দেশে-বিদেশে, আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম প্রতিশ্রুতি, সুনীল গাঙ্গুলির সময়।

কোনো শিক্ষিত বাঙালির সঙ্গে আলাপ হলেই ওই লিস্টের একটা কপি তাঁর হাতে তুলে বলতাম,—দয়া করে এই কয়েকটা বই পড়ে ফেলুন, তামাম বাংলা সাহিত্য পড়তে হবে না, ওই ক'টি; না পড়লে আপনার সঙ্গে কথা বলতে আমার খুব লজ্জা করবে।

কতটা কাজ হয়েছিল জানি না, তবে কেউ কেউ আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ প্র করেছিলেন। যাঁদের তালিকা দিতাম তাঁরা কিন্তু আমাকে দেখলেই এড়িয়ে চলতেন।

প্রবোধদা লেখাপত্র ছেড়ে দিয়ে যাত্রা নিয়ে পড়লেন। যাত্রা সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালির উন্নাসি ছিল, কখনোই তাকে সম্মান দেয়নি। শিল্পের হরিজন হিসেবে দেখতেন বিদ্বজ্জনেরা। অথচ দেখতে গ্রামের লোক সবসময় আগ্রহী। প্রবোধদা যাত্রাদলের মালিকদের সঙ্গে বসে ওই শি আধুনিক চেহারা কীভাবে দেওয়া যায় তা নিয়ে পরিকল্পনা করতে লাগলেন। নতুন বিষয়, আঙ্গিক এবং প্রচারের চমক ছাড়াও নাটক এবং সিনেমার অভিনেতাদের যাত্রায় সামিল করা ফলে খবরের কাগজগুলো তখন যাত্রার বিজ্ঞাপনে ভরে গেল। শুধু রথের দিনে নয়, ষষ্ঠী থে জ্যোষ্ঠি, প্রতিদিন আমরা জানতে শুরু করলাম কোথায় কবে কোন পালা হচ্ছে।

প্রবোধদার সঙ্গে দেখা হল। ইদানীং এত ব্যস্ত, কথা দূরে থাক, দেখাও হয় না। বিভিন্ন য দল তাঁকে নিয়ে রোজ পালার আসরে ছুটছে। খবরের কাগজে ছবি ছাপার কারণে যাত্রাশি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখ আমরা চিনে ফেলেছি, সেটা ওঁরই জন্যে।

প্রবোধদা বললেন,—খুব ব্যস্ত, সময় পাচ্ছি না। কী বুঝছ?

—দারুণ!

—যাত্রার লোকজন আমাকে মনে করবে?

—ওঁরা তো 'যাত্রাবন্ধু' বলেন আপনাকে। কিন্তু গল্পবন্ধু, উপন্যাসবন্ধু এখনও পর্যন্ত কাউকে হয়নি।

—ঠাট্টা করছ? দেখো, একদিন যাত্রাই একনম্বর হবে; সিনেমা-নাটক পেছনে পড়ে থাকবে। ত তোমরা বলবে, লিখে সময় নষ্ট না করে লোকটা ঠিকই করেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই যে লোক যাচ্ছে, যে-কোনো একজনকে ডেকে নিয়ে এসো, বলো রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ম বলতে। দশ হাজারে একজনও পারবে না। ওই বাঙালির জন্যে সাহিত্য করা মানে আত্মহত্যা ব তোমার গোঁ চেপেছে আত্মহত্যা করার, করো।—প্রবোধদা গাড়িতে উঠলেন।

প্রবোধদা মারা গিয়েছিলেন অকালে। বেঁচে থাকার সময়েই তাঁর বিরোধীরা যাত্রাদলে ম তুলেছিল। আর এখন ওই রথের দিনে সামান্য, অন্যদিকে একটিও যাত্রার বিজ্ঞাপন খবরের কাগ দেখা যায় না।

মে ২০০৪

অর্ধ শতাব্দীর একটি সাম্রাজ্য

অল্প বয়সে শুনতাম একজন লেখকের লেখা যদি কাল অতিক্রম না করে তাহলে তিনি কালজয়ী লেখক নন, তাঁর লেখা না-লেখার মধ্যে তফাত নেই। যেমন বঙ্কিম, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ। যেমন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ। তখন মনে প্রশ্ন জাগত, কাল মানে কত বছর? এক যুগ নাকি বারো বছরে হয়। এক কাল? এক বন্ধু বলেছিল, পঞ্চাশ বছর। তখন ভাবতেই পারতাম না আমার কোনো লেখা পঞ্চাশ বছর পরেও পাঠক কিনে পড়বে। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসুর মতো ক্ষমতাবান লেখকদের বই এখনও বিক্রি হয়। কিন্তু কত বই? রচনাবলির কল্যাণে হয়তো কিছু কিছু। এখন বছরে দু-তিন হাজার বিক্রি হওয়া বই-এর লেখককে জনপ্রিয় লেখক বলা হয়ে থাকে। সম্ভবত তার থেকে কম। শুনেছি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিক্রির পরিমাণ ওর চেয়ে ঢের বেশি। তাঁকে তো ইতিমধ্যে কালজয়ী লেখক বলা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আমার ধন্ধ আছে। আর সেই ধন্ধটা বেড়ে গেছে যাঁর জন্যে তিনি হলেন শংকর, মণিশংকর মুখোপাধ্যায়।

আমি যখন স্কুলের নিচু ক্লাসে পড়ি তখন 'দেশ' পত্রিকায় শংকরের প্রথম রচনা "কত অজানারে" প্রকাশিত হয় ধারাবাহিকভাবে। বাড়ির বড়রা ওই লেখা নিয়ে আলোচনা করতেন। সাগ্রহে অপেক্ষা করতেন পরের সংখ্যার জন্যে। আমি বইটি পড়ি ক্লাস এইটে পড়ার সময়। তখনই বইটি দিল্লির একটি সাহিত্য পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশের সময় ধরলে "কত অজানারে"র বয়স এখন পঞ্চাশ।

এই একটি বই শংকরকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলে দিল। হাওড়ার একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের কৌতূহলী তরুণের চোখে আমরা আমাদের চারপাশের ধনী ব্যক্তিদের জীবন দেখতে শুরু করলাম। "চৌরঙ্গী" যখন 'দেশ'-এ প্রকাশিত হচ্ছে তখন বিক্রির নিরিখে ওঁর আশেপাশে কেউ নেই। যে সময় অন্য কোনো বিখ্যাত লেখকের বই বাইশশো ছেপে প্রকাশক বিক্রি করতে হিমসিম খেতেন তখন শংকরের বই ছাপা হত দশ হাজার। একশো ষাট পাতার বই হলে অন্য প্রকাশকরা যখন নামী লেখকের বই-এর দাম রাখতেন চল্লিশ টাকা তখন শংকরের বই-এর দাম থাকত দশ টাকা। একসঙ্গে অনেক বেশি ছাপা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বইয়ের দাম কমে যেতে বাধ্য। প্রকাশক ঝুঁকি নিতে পারতেন, কারণ তিনি জানেন শংকরের বই নয়-দশ হাজার বিক্রিতে থেমে থাকবে না।

সম্ভবত "চৌরঙ্গী" থেকেই শংকরের এই জয়যাত্রা শুরু হয়ে যায়। আমার বারংবার মনে হয়েছে শংকর চাইছেন পাঠকদের হাতে কম দামে তাঁর বই তুলে দিতে। এই কারণে ছাপার খরচ তোলবার জন্যে বই-এর পেছনে বিজ্ঞাপন ছেপে দাম কমাবার চেষ্টাও করেছিলেন। এবং সেই কারণে একটি অজ পাড়াগাঁয়ের মুদির দোকানে গেলে অন্তত তিনটি বই পাওয়া যেত। ধারাপাত, বর্ণপরিচয় এবং শংকরের যে-কোনো একটা বই। এখন আমার প্রায়ই একটা কথা মনে হয়। তরুণ বয়সে শুনতাম কোনো লেখক জনপ্রিয় মানে তাঁর লেখা সেইসব পাঠক গোগ্রাসে গেলেন যাঁদের বোধবুদ্ধি খুব

কম। বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র। দেখেছি তাঁকেও ওই জনপ্রিয়তার কারণে বুদ্ধিজীবীদের অবহেলা সহ্য করতে হয়েছে। গল্প-উপন্যাসে নাটকীয় ঘটনা অথবা কান্নাকাটি থাকলে ব্যঙ্গ করা হত—একেবারে শরৎচন্দর। ভদ্রলোক কবে মারা গিয়েছেন তবু এখনও তাঁর বই কী পরিমাণ বিক্রি হচ্ছে, একই গল্পের চার যুগ ধরে চার রকমের ছবি হচ্ছে। ওইসব বুদ্ধিজীবীদের ধরে চাবকানো হয়। ওঁদের বই তো বছরে একশো কপি বিক্রি হয় না। কথা বলার সাহস পান কী করে?

হ্যাঁ। হঠাৎ জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠে কিছুদিন পরে হারিয়ে যেতে দেখেছি যাঁদের তাঁদের সঙ্গে শংকরের তুলনা চলে না। যাযাবরের "দৃষ্টিপাত" পড়েননি এমন বাঙালি তখন খুব কম ছিলেন কিন্তু "জনান্তিকে"ই তাঁর পতন শুরু। ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের "চিতা বহ্নিমান" নাকি দারুণ বিক্রি হয়েছিল এবং বই একটাতেই শেষ। শশধর দত্তের মোহন সিরিজের জনপ্রিয়তা ভোলার নয়। এমনকী আট আনা দামের স্বপন কুমার? কোথায় গেলেন তাঁরা?

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জীবিতকালে যত জনপ্রিয় ছিলেন না, মারা যাওয়ার পর তাই হয়েছেন এবং এখনও একই জায়গায় রয়েছেন। কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে যে মানুষটি বাঙালি পাঠকের কাছে গৃহীত হয়ে আছেন তাঁকে অস্বীকার করার প্রবণতা প্রথমে দেখা গেল অধ্যাপককুলের মধ্যে, যাঁরা পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা লেখেন। অন্যের বই-এর সমালোচনা লিখে এঁরা দিব্যি নাম করেছেন এঁদের একজন, যাঁকে সমালোচক সম্রাট বলা হয়, যিনি দু-লাইন ভালো লিখলে নাকি লেখক জাতে ওঠেন, তিনি একদা লিখেছিলেন, নবারুণ ভট্টাচার্য এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। অথচ ভদ্রলোকের বই দু-একটি ছাড়া কোনো দোকানে পাওয়া যায় না, ওঁর পাড়ার পড়ুয়া ছেলেমেয়েরাও নাম শুনেছে কি না সন্দেহ আছে। বড় কাগজে সমালোচনা লিখে এঁরা সহজেই বিভিন্ন পুরস্কার কমিটিতে বিচারক হয়ে যান। তখন গলা কাটতে বাধা কোথায়? তুমি জনপ্রিয়? লোকে টাকা দিয়ে তোমার বই কেনে কেন কেনে? কারণ তুমি চটুল লেখো। রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। উনি হিসেবের বাইরে। হরিপদ কেরানিরা যখন তোমার বই কেনে তখন তুমি সাহিত্যিক নও। ওই বিনোদনের খোরাক জোগানে লেখক। এঁরা শংকরকে সেই পর্যায়ে রেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে একনাগাড়ে পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হয়ে থাকা মানে অন্তত দশটি প্রজন্মের হৃদয় জয় না করে সম্ভব নয়। ক'জন জীবিত লেখক পারেন? প্রফুল্ল রায় এ ব্যাপারে শংকরের কাছাকাছি আছেন। কিন্তু তাঁকেও তো অবহেলায় পেছনে ফেলে রেখেছে এই গাঁয়ে না মানা মোড়লের দল।

অথচ "নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরী"র মতো উপন্যাস আমি বাংলা ভাষায় পড়িনি। ভাষা, বিষয় এবং বক্তব্যে শংকর যে-কোনো মাস্টারপিস লেখার মানে নিয়ে গেছেন উপন্যাসটিকে। আচ্ছা ভাই, "চৌরঙ্গী"র মতো একটা উপন্যাস লিখে দেখান তো! সত্যজিৎ রায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ বুদ্ধিমান ছিলেন, (আপনাদের মতে ছিলেন তো?) তিনি শংকরের দুটি উপন্যাস নিয়ে ছবি করেছেন। কেন করেছেন? যে মানুষ "পথের পাঁচালী", "অশনি সংকেত" করেন তিনিই তো শংকরের বইতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। আমি উনিশশো চুরাশিতে "কালবেলা" উপন্যাসের জন্যে আকাদেমি পেয়েছিলাম। তারপর কুড়ি-কুড়িটা বছর পার হয়ে গেল, এখনও শংকর বা বুদ্ধদেব গুহকে আকাদেমি দেওয়া হয়নি। এই আর একজন লেখক, বুদ্ধদেব গুহ, এপার বাংলা, ওপার বাংলার পাঠক তো বটেই, বিদেশেও ওঁর পাঠক আমি দেখেছি। অথচ সমালোচক বাহিনী ওঁর নাম ভুলেও উচ্চারণ করেন না। ওঁর অপরাধ—উনি জনপ্রিয়।

যে কথা বলছিলাম, শংকরকে পুরস্কৃত না করে প্রতি বছর এমন অনেককেই পুরস্কৃত করছেন আকাদেমির কর্তারা, যাঁদেরকে পাঠকরা বর্জন করেছে। এটা আকাদেমিরই লজ্জা। যখন কোনো ব্যবসায়িক সংস্থা সাহিত্য পুরস্কার দেয় তখন আমরা সুবিচার আশা করি না। তাঁদের পাঁঠা তাঁরা কোনদিক দিয়ে কাটবেন সে অধিকার তাঁদের আছে কারণ টাকাটা তাঁরা দিচ্ছেন। আজ যাঁকে ঢাকঢোল

দিয়ে পুরস্কৃত করছেন কাল তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করছেন না। কিন্তু স্বয়ংশাসিত হলেও আকাদেমি একটি সরকারি সাহায্যপুষ্ট সংস্থা। তাঁদের চোখ ঝাপসা হলে আমরা ক্ষুব্ধ হবই। কেন, কী কারণে আমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছিল তা আজও জানি না। মাত্র সাতটি উপন্যাস লিখেই ওই পুরস্কার পেয়ে যতটা আনন্দিত হয়েছিলাম, ঠিক ততটাই লজ্জিত হয়েছিলাম। কারণ তখনও শংকর, প্রফুল্ল রায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ পুরস্কৃত হননি। আমি এঁদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র লেখক। "নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরী", "কেয়াপাতার নৌকা", "নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে", "সাহেব বিবি গোলাম", "সেই সময়", "যাও পাখি", "কোজাগর"-এর তুলনায় "কালবেলা" কোনো ক্ষেত্রেই (অন্তত আমার কাছে) দারুণ লেখা নয়। আমি ধরে নিচ্ছি ওটা দুর্ঘটনা। "কালবেলা" আজ প্রায় এক লক্ষ কপি বিক্রি হবে—এই খবর আগাম জানলে নিশ্চয়ই তখন পুরস্কৃত হত না। অবশ্য আকাদেমি পেলে বই ভালো বিক্রি হয়। কিন্তু ইদানীং তাও হচ্ছে না।

অল্প বয়সে শুনতাম, কাল বিচার করবে। সেই 'কাল' নামক বিচারকটি শংকরকে এখনও যদি বিচার করতে না পারেন তাহলে দয়া করে তিনি চিতায় উঠে বসুন। বাঙালি পাঠক তাঁকে এখনও প্রিয় লেখকের সম্মান দিয়ে চলেছেন।

এর চেয়ে একজন লেখকের আর কী চাই!

জুন ২০০৪

ঐতিহাসিক ভুল ক'বার হ

ছাত্রাবস্থায় আমি যখন ছাত্র ফেডারেশনের সমর্থক ছিলাম তখন ছাত্র পরিষদের ছেলেমেয়েদের কিছু শত্রু বলে মনে হত না। মাঝে মাঝেই আমাদের মিছিলে যেতে হত। বিভিন্ন ইস্যুতে প্রতিব মিছিলে আমরা শূন্যে ঘুসি ছুঁড়তাম। ইংরেজরা যাওয়ার আগে একটা ভারতীয় বুর্জোয়া পার্টির হ ভারতবর্ষকে তুলে দিয়েছে আর সেই বুর্জোয়ারা বড়লোকদের সেবা করছে বলে আক্রোশে জ্বলত মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন পড়া হয়ে গিয়েছিল। এদেশের সব মানুষ দু'বেলা খেতে পাবে, গা বড়লোকের সমান অধিকার থাকবে, এরকম দেশের স্বপ্ন দেখতাম। বন্ধু শৈবাল কবিতা লি লাইনটা বোধহয় এইরকম—'আঁধার সাগর পার হবে আজ ক্ষুদিরামের ভাই / আলোক দেখায় স্তালিন, চিনের চৌএন লাই।' তারপর চীন ভারত আক্রমণ করল। কম্যুনিস্ট পার্টি বলল, সী সংঘর্ষ। আমরা ধন্দে পড়লাম। চীন বলল, সিকিম ভারতের নয়। অথচ আমরা গ্যাংটক থেকে পাস ছাড়াই ঘুরে এলাম। পার্টি ভাগ হল। লোকে বলল, বেশিরভাগ বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পী, যাঁরা পার্টি ছিলেন, তাঁরা সিপিআই-এ থেকে গেলেন। সিপিএম হল মেহনতি শ্রমিকদের পার্টি। তারপর বা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যুক্তফ্রন্ট এবং শেষে বামফ্রন্ট তৈরি করে ক্ষমতায় চলে এলেন ; তাঁরা প্রায় তিন দশক রাজত্ব চালাচ্ছেন। আজ মনে হয়, স্বাধীনতার পর তিরিশ বছরের মধ্যেই দেশে কম্যুনিস্ট আন্দোলন শেষ হয়ে গেছে। আমরা যা পড়েছিলাম, যা ভেবেছিলাম, যে স্বপ্ন আমা দেখানো হয়েছিল—তা বেমালুম ভুলে যেতে হয়েছে সরকার চালাতে গিয়ে। এই তিন দশকে হয়েছে প্রচুর কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সরকার এবং পার্টি ক্রমশ স্পর্শকাতর হয়ে উঠে পুলিশ, সরকারি কর্মচারী এবং পার্টির ইমেজকে বজায় রাখতে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে হ ঠিক যেভাবে বুর্জোয়া সরকার তাঁদের সরকার চালান।

শুরু থেকেই বামফ্রন্ট সরকারের স্লোগান ছিল কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। সবকিছুর জন্যে তাঁরা কে সরকারের সমালোচনা করেছেন, কেন্দ্রের অসহযোগিতার জন্যে রাজ্যের উন্নতি বন্ধ হচ্ছে বলে তা পদত্যাগ দাবি করেছেন। সাধারণ মানুষ লোকসভার ভোট দেওয়ার সময় জানেন সিপিএম কিছু দিল্লির ক্ষমতায় আসবে না, তাই তাঁরা ভোট দিয়েছেন কংগ্রেস বা তৃণমূলকে, অথচ সেই এলা বিধায়ক হিসেবে তাঁরা নির্বাচিত করেছেন সিপিএম প্রার্থীকে। কিন্তু এবার সব বদলে গেল। সিপি যে কলকাতা দখল করল, লোকসভায় অন্যান্য বারের চেয়ে বেশি আসন পেল তা কেবল তৃণম বিমুখতার জন্যেই। কংগ্রেস তার জায়গায় থেকে গেল।

এর আগে যখন কেন্দ্রে সরকার গঠনের সময় কেউ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি তখন সিপিএ কে সঙ্গে নিয়ে একটা ফ্রন্ট তৈরির কথা হয়েছিল, তার নেতৃত্বে থাকতেন জ্যোতি বসু। সংখ্যাগরি

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সিপিএমের পলিটব্যুরো সেই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিল। বোঝাই যাচ্ছিল, যে-ই যাক, সরকার টিকবে না। যদিও জ্যোতিবাবু ওটাকে 'ঐতিহাসিক ভুল' বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রথম এবং শেষ সুযোগ হারিয়ে বৃদ্ধ পার্টির সমালোচনা করতে ছাড়েননি, যা কিনা নিয়ম-বিরুদ্ধ।

এবারের লোকসভার ফলাফল বুঝিয়ে দিল, সাধারণ মানুষ বিজেপিকে চাইছে না। পশ্চিমবাংলার মানুষ মৌলবাদ অপছন্দ করেছে এবং চাটুকারদের বর্জন করেছে। কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি আসন পেলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হল না। কিন্তু তারা মৌলবাদের সাথে হাত মেলাতে রাজি নয়। এই একটি ইস্যুতে সিপিএম এগিয়ে এল কংগ্রেসকে সমর্থন করতে। সিপিএম-সম্পাদক উদ্যোগী হলেন। আর আমরা, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নড়েচড়ে বসলাম, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম।

সিপিএম যখন ঘোষণা করছেন তাঁরা আগামী পাঁচ বছর কংগ্রেসকে ক্ষমতায় রাখবেন সাম্প্রদায়িকতাকে ঠেকাতে—অর্থনীতি এবং শ্রমনীতির ব্যাপারে তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে কংগ্রেসকে। তাহলে ওই একই শর্তে মন্ত্রীত্বে যেতে অসুবিধে কী? জ্যোতিবাবু, সুরজিৎরা সরকারে যেতে চাইলেন। পলিটব্যুরোতে আলোচনা হল। এবং প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেল। যা বলা হল তার মর্মার্থ—আমরা জলে নামব কিন্তু বেণী ভেজাব না।

কেন এই সিদ্ধান্ত? যতদূর জানি, কংগ্রেসের সঙ্গে সরকারে গেলে পার্টির লক্ষ লক্ষ কর্মী লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেন। কার বিরুদ্ধে স্লোগান দেবেন তাঁরা? এতদিনকার অভ্যস্ত কথাবার্তা যে গিলতে হবে তাঁদের। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন আসছে। তখন তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই-এর সময় কী বক্তৃতা দেবেন? দেশ, মানুষ সব ধুয়েমুছে গেল, পার্টিই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। দ্বিতীয়ত, এতদিন ধরে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা বলে জনগণকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে তাঁরা দায়ী নন, ক্ষমতায় গেলে সেকথা বলার সুযোগ থাকছে না। তখন কী হবে?

অতএব সিপিএম বাইরে থেকে সমর্থন করবে। তাঁদের লোকসভার নেতা স্পিকার হলেন এবং বললেন, আমি এখন স্পিকারের মতো আচরণ করব, পার্টির সদস্য হিসেবে নয়। এটুকু গিলতে হল পার্টিকে। আর আমরা? মহম্মদ সেলিম, সুধাংশু শীল-রা যদি মন্ত্রী হতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের জন্যে যে কাজই করতেন তাতে রাজ্যের সরকারের সহযোগিতা পেতেন। প্রচুর বেকার যুবক-যুবতীর চাকরি হত, থেমে-থাকা প্রকল্পগুলো চালু হত, নতুন নতুন শিল্পের কথা ভাবতেন এদেশি অথবা বিদেশি শিল্পপতিরা। সিপিএমের সাংসদরা মন্ত্রীসভায় থাকলে প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মতামত দিতে পারতেন। নিজের দপ্তরকে শক্তিশালী করার সুযোগ তাঁদের ছিল এবং এই প্রথমবার পশ্চিমবাংলার হয়ে সরকারে বেশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ এসেছিল। মনে রাখতে হবে এঁরা কেউ জলু মুখার্জি বা তপন শিকদারের মতো তৃতীয় সারির মন্ত্রী হতেন না।

কিন্তু সিপিএম তো শুধু পশ্চিমবঙ্গের মানুষদের জন্যে নয়। তাঁদের চলতে হয় কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নেতাদের কথায়। অতএব পার্টির স্বার্থে জনকল্যাণ বাতিল হল। তবে কংগ্রেসকে সমর্থন করবে সিপিএম, আমাদের এই আশ্বাস দেওয়া হল।

বেশ কয়েক বছর থেকে দেখছি পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতৃত্ব যখন কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হন তখন জ্যোতিবাবুকে স্মরণ করেন। যে-কোনো অভিযোগকে তাঁরা ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। বানতলা ঘটনার পর জ্যোতিবাবু বলেছিলেন, "এমন তো হতেই পারে"। অবশ্য এই হিটলারি মন্তব্য, যেখানে সহানুভূতির 'স' নেই, তা করার সাহস অনিল, বিমান পাননি এখনও। তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে হয়তো বলতেন, কই আমরা তো কোনো রিপোর্ট পাইনি! জেলা সেক্রেটারিকে বলেছি ব্যাপারটা দেখতে,

রিপোর্ট পেলে বলব। ব্যস, হলে গেল। ওঁরা ভালো করেই জানেন, এরকম কথা জনগণের লাগবে না, তাই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বুদ্ধদেববাবু সুস্থ স্ব মানুষের মতো কথা বলে এবং আচরণ করে মানুষের মন জয় করেছিলেন। কুচবিহারে যে মা গণধর্ষণ করা হল তার সম্পর্কে বিমান বসু বললেন, "মহিলাটির চরিত্র খারাপ ছিল"। যেন খারাপ হলে তাকে সবাই মিলে ধর্ষণ করা যেতে পারে। বুদ্ধদেববাবু বললেন, চরিত্র ভা মন্দ সেটা বিচার্য নয়, ধর্ষণ একটা ক্রাইম এবং সেটাই করা হয়েছে। ব্যস। জনগণ বুদ্ধদে নিজের লোক বলে মনে করল। কেন করবে না? এই মানুষটি জ্যোতিবাবুর মন্ত্রীসভাকে চে মন্ত্রীসভা বলে বেরিয়ে এসেছিলেন। এই হিম্মত কার ছিল? সাদা পাঞ্জাবি এবং সহাস্য মুখে ব কথা ওঁর মতো আর কে বলতে পারে? প্রয়োজনে রিকশায় চড়েছেন, পুলিশকে ফুটবল বলেছেন। এই একটি মানুষের ইমেজের কাছে মমতা নস্যাৎ হয়ে গেলেন। মহিলাকে লোকে ব স্বার্থান্বেষী, মন্ত্রীত্বের জন্যে লালায়িত এবং অকারণে চিৎকার করতে দক্ষ ছাড়া কিছুই ভাবতে না আজকাল। পাশাপাশি বুদ্ধদেব স্মিত, মিষ্টি হাসেন, জীবনানন্দ পড়েন, লেখেন।

কিন্তু সময় কথা বলবেই। নির্বাচনের পর আঁতাত হয়ে গেলে বুদ্ধদেববাবু আচমকা খোলস বেরিয়ে এসে বললেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বকে আমরা যেমন চালাব তেমনি চলবে। অর্থাৎ চালি তাঁদের হাতে, না চাইলে কংগ্রেসকে চলে যেতে হবে। আমরা তাজ্জব। সবে মন্ত্রীসভা গঠিত এখনও কোনো মতভেদ হয়নি, হঠাৎ আগাম নিজেদের ক্ষমতা জাহির করা কেন? এ যেন, নেমন্তন্ন করে খেতে বসিয়ে বলা,—'আমি যা দেব তাই খাবেন!' কেউ বলে? সৌজন্যে ৎ না?

তার ক'দিন বাদে দিল্লি থেকে ফিরে এসে উলটো গান গাইলেন—দিল্লি তো শপিং যে তিনি জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিলেন! আমরা চমকে উঠলাম।

আমলাশোলের মানুষ যে না খেয়ে মরছেন তা এখন পৃথিবীর সবাই জানেন। শুধু বা মন্ত্রী মুর্মুসাহেব, সরকারি অফিসাররা জানেন না। বুদ্ধদেববাবু একটু বেশি জানেন,—আপন আমলাশোল আমলাশোল বলে চ্যাঁচাচ্ছেন, এই কলকাতার বস্তিগুলোতে কত মানুষ না খেয়ে তার খবর রাখেন? কথাগুলো বলার সময় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঠোঁটে যে হাসি ফুটে উঠেছি অর্থ একটাই—আপনারা সাংবাদিকরা শুধু প্রশ্ন করতেই জানেন, সরকার চালাতে তো হয় ন মধ্যে সাধারণ মানুষ জ্যোতিবাবু-বিমান-অনিলবাবুর মিশ্রিত মুখ বুদ্ধদেববাবুর মুখে যদি দেখ তাহলে ভুল হবে কি?

মনমোহন সিং ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে তিনি বা তাঁর মন্ত্রীরা যখনই সিঁ ইচ্ছের বিরুদ্ধে পা ফেলবেন তখনই সুতোয় টান পড়বে। ওঁরা পা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে সুতোর অন্য প্রান্তে আছে মন্ত্রীসভার আড়ালে বসে থাকা বুদ্ধদেব-কারাতদের হাতে। দক্ষ বাঁ হাতে যেমন পুতুল নাচে তেমনি নাচবেন মনমোহন সিংরা। যদি সুতো ছিঁড়ে বেরিয়ে যে তাহলে আছাড় খেয়ে মরবেন।

শেষ মুহূর্তে এটা বুঝতে পেরেছিলেন সোনিয়া গান্ধী। বুঝেছিলেন, জ্যোতিবাবু-সুরজিৎদে সিপিএমের শেষ কথা নয়। অথচ ভোটের ফলাফল তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল, মানু কংগ্রেসকে সুযোগ দিয়েছে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী না হয়ে তিনি সজ্জন পণ্ডিত ম সিংকে এগিয়ে দিলেন, কিছুদিন আগেও কংগ্রেস মহলে যাঁকে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ বলে বে করতেন না।

কিন্তু দক্ষ বাজিকর হয়ে পশ্চিমবঙ্গের উপকার না করলেও সিপিএমের কি লাভ হয়েছে? না। পাঁছবছরের মধ্যে যেদিন মন্ত্রীসভা ভাঙবে সেদিন কিন্তু সব দায় তাঁদের ওপর চাপবে। আজ পেট্রলের দাম দু'টাকা লিটারে বাড়লেও তাঁদের বলতে হচ্ছে, এমন কিছু বাড়েনি, বিজেপি অনেক বাড়াত। কিন্তু ক'দিন এই ভালোমানুষি দেখাতে পারবেন এঁরা? পার্টি যাদের শেষ কথা তাদের পক্ষে কমরেডদের সক্রিয় রাখতে তো এতদিন একটাই পথ খোলা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও!

মনে রাখতে হবে, সিপিএমের সুতোর বাঁধনে রয়েছেন মনমোহন সিং, সোনিয়া গান্ধী নন। তিনি ফাঁদে ঢুকতে চাননি। তাই তাঁর মন্ত্রীসভায় না-যাওয়াটা কংগ্রেসের পক্ষে আশীর্বাদ, সিপিএমের অস্বস্তি।

জুলাই ২০০৪

ভালোমানুষের

অনেকদিন আগে একটি বাংলা ছবি দেখেছিলাম। ছবির নায়ক ছিলেন একজন ডাক্তার, যিনি দক্ষ সঙ্গে চিকিৎসা করায় ওই এলাকায় খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই ডাক্তার অর্থপিশাচ ছিলেন না। গরিব খুব সাহায্য করতেন, মাঝরাতে খবর পেলে রোগীর পাশে হাজির হয়ে যেতেন।

নিজের সংসার ঠিকঠাক চলে যাওয়ার পর কিছু ওষুধ কেনার টাকা রোজগার করতে যে অর্থ দরকার তা জোগাড় হলেই তাঁর চলে যেত। ভদ্রলোক নিয়মিত মেডিক্যাল বুলেটিন পড়ে জটিল অসুখ হলে টেলিফোনে কলকাতার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরামর্শ করে সরকারি হাসপাতালের ডাক্তাররা বেশ আনন্দে ছিলেন, কারণ ওঁর কারণে তাঁদের কাজের চাপ কমে গিয়েছিল। তবে যে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার তাকে তিনি রোগের বিস্তা বিবরণ এবং চিকিৎসার পথ জানিয়ে চিঠি লিখে যখন পাঠাতেন তখন হাসপাতালের ডাক্তাররা বি হতেন। যেন ভদ্রলোক অনধিকার চর্চা করছেন। পরে যখন দেখা গেল ভদ্রলোক ভুল লে তখন আর ডাক্তাররা বেশি মাথা ঘামাতেন না। ওঁকেই স্মরণ করতেন।

হঠাৎ একজন ডাক্তার হাসপাতালে বদলি হয়ে এলেন। দু'দিনের মধ্যে তিনি জানালেন, ডাক্তার তাঁর সহপাঠী ছিলেন এবং মেডিক্যাল পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তিনি কোনো কারণে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতএব ডিগ্রি পাওয়ার কোনো সুযোগ তাঁর হয়নি। এবং ডিগ্রি পেলে কাউকে ডাক্তার বলা আইনবিরুদ্ধ। অতএব ইনি ওই মফস্‌সল শহরে যা করছেন তা ব কোনো এক্তিয়ার তাঁর নেই। এরকম কথা ছড়িয়ে পড়তে খুব কম সময় লাগে। একদল মনে করলেন ওই ডাক্তারের চিকিৎসায় তাঁরা যে সুস্থ হয়েছেন তা নিতান্তই ভাগ্যগুণে সম্ভব হ মারাও যেতে পারতেন। যে অনেকদিন ধরে ভুগছে সে ভাবল লোকটা ডাক্তার নয় বলে সে চিকিৎসায় সুস্থ হচ্ছে না।

ব্যাপারটা পুলিশের কানে যেতে তাঁরা তদন্তে নামলেন। ছবিতে বোধহয় ছিল, নিজেকে বাঁচ জন্যে নায়ক গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। ডাক্তার না হয়ে ডাক্তারি করার জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে প্রত ইত্যাদি অনেক মামলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। তার পরের কাহিনী অন্য খাতে রয়েছে। মফস্‌সল শহ মানুষেরা কিছুদিনের মধ্যেই ওই ডাক্তারের অভাব টের পেলেন। হাসপাতালে গিয়ে তাঁদের ছাড়ছে না। ডাক্তাররা কিছু করতে না পেরে কথায় কথায় কলকাতায় যাওয়ার উপদেশ দি রোগীর আর্থিক অবস্থানুযায়ী চিকিৎসা করার শিক্ষা তাঁরা পাননি। রোগীরা বুঝতে পারছেন না নায়ক-ডাক্তার যা পারতেন এঁরা তা পারছেন না কেন।

এতদিন বাদে ছবির গল্প মনে পড়ল। পাঠক, বুঝতেই পারছেন, পবিত্র সরকারকে জড়িয়ে কাগজে যা বের হচ্ছে, তাই পড়ে, মনে এল গল্পটা। পবিত্রদাকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে জানি না। অনেকদিন থেকেই। দেখা হলেই হাসিমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। কখনও কোনো লেখা

কথা বলেছেন। আমাদের দু'জনের দুই মেয়ে। এ নিয়েও রঙ্গ-রসিকতা হয়েছে। কোনো কোনো সভায় একসঙ্গে গিয়েছি। ওঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শুনে মুগ্ধ হয়েছি। কথা বললেই বোঝা যায়, উনি গভীর মনের মানুষ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, উপাচার্য ছিলেন, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় ক্ষমতা পেয়েছিলেন। ইংরেজি নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন। একজন পণ্ডিত মানুষের সব ভাবনার সঙ্গে সবাই একমত হবেন, এটা তো সম্ভব নয়! হয়ওনি।

এই পবিত্র সরকার নামের আগে ডক্টর লিখতেন। আগে দেখতাম, কোনো কোনো লোক নামের পাশে অর্জিত উপাধির গায়ে ব্যাকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লিখতেন; যেমন—অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ইত্যাদি। আমাদের চা-বাগানে একজন টাইপবাবু চাকরিতে এসে ঘরের দরজায় নেমপ্লেট লাগিয়েছিলেন। নামের পাশে ব্রাকেটে 'ক্যাল' লেখা ছিল। ওটা যে ক্যালিফোর্নিয়া নয় ক্যালকাটা, তা জেনে অবাক হয়েছিলাম। হয়তো অক্সফোর্ড থেকে কলকাতার দূরত্ব আর কলকাতা থেকে সেই অজ চা-বাগানের দূরত্ব এক ভেবে তিনি ওই কাণ্ডটি করেছেন। কিন্তু অনেক পণ্ডিত বা ডক্টরেট, এমনকী নামী অধ্যাপককেও প্রবন্ধ লেখার সময় নামের আগে ডক্টর অথবা অধ্যাপক লিখতে আমি দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলে হেসে বলেছেন, ওগুলোর প্রয়োজন চাকরির জন্যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে লিখলে কি লেজ গজাবে? রবীন্দ্রনাথকে অনেক নামী বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট দিয়েছিল। ভাবুন তো, ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতবিতান লিখেছেন!!

আমি এখন স্পষ্ট মনে করতে পারছি না, পবিত্র সরকার যখন প্রবন্ধ লিখেছেন, বিভিন্ন বই-এর সমালোচনা করেছেন তখন কোথাও নামের আগে ড এবং বিসর্গ লিখেছেন কি না। শুধু পবিত্র সরকারই মনে করতে পারছি। এই লেখাগুলোতে রুচি এবং শোভনতাবোধ তীব্র ছিল। জানলাম, তিনি ছদ্মনামে কিছু লিখতেন এবং সেখানে রুচির পরিচয় রাখতেন। আমার সৌভাগ্য, সেইসব লেখা আমার পড়ার সুযোগ হয়নি। যদি লিখে থাকেন তাহলে ধরে নিতে হবে মানুষটির দুটো চরিত্র ছিল, দুটো মুখ। এটা আমাদের সবার থাকে, আমরা লুকিয়ে রাখি।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করে গবেষণাপত্র জমা দিয়ে শেষ মুহূর্তে চলে এসেছিলেন বলে ডক্টর হয়ে ফিরতে পারেননি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, তাঁর গবেষণা স্বীকৃতি পাচ্ছে। ফলে ধরেই নিয়েছিলেন তিনি ডক্টর পবিত্র সরকার। এই 'ধরে নেওয়াটা' যুক্তিযুক্ত কি না, সেই প্রশ্ন করেননি কেন যাঁরা তাঁকে চাকরি দিয়েছিলেন? যে কমিটি তাঁকে ডক্টরেটের জন্যে নির্বাচিত করেছেন, শঙ্খ ঘোষকে করেননি, তাঁদের তো আগে কাঠগড়ায় তোলা উচিত।

এখন শোনা যাচ্ছে, পবিত্র সরকার তখন গবেষণাপত্র জমাই দেননি, দিয়েছেন সম্প্রতি। এবং এ বছর যদি শিকাগো তাঁকে ওই উপাধি দেয় তাহলে এতদিন তিনি ডক্টর-হীন হয়েছিলেন! যাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, ডক্টর না হয়েও পবিত্র সরকার নিজেকে ডক্টর বলে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঠকিয়েছেন, অন্যদের বঞ্চিত করেছেন, ছাত্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সমীহ আদায় করেছেন তাহলে সেটা অবশ্যই অপরাধের পর্যায়ে পড়ে; তার জন্যে আইন আছে। কিন্তু আমি ভাবছি সেইসব মূর্খদের কথা, যাঁরা তাঁকে বিভিন্ন পদে বসিয়েছেন শিকাগোর কাগজপত্র যাচাই না করে। কেউ বলল, আমি এম.এ. পাশ,—তার কথাই বিশ্বাস করা হবে, কাগজ দেখতে চাওয়া হবে না!

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একটা কথা খুব চালু ছিল। যেসব ছেলে দারুণ মেধাবী, তাদের কলেজে চাকরি পেতে অসুবিধে হয় না। চাকরি করতে করতে তারা গবেষণা করে ডক্টর হয়। আর যাদের নম্বর খুব কম, কিছু করার নেই, তারা ম্যানেজ করে গবেষণা করার অনুমতি জোগাড় করে। এই ধরনের ছেলেমেয়েকে বলা হয় কীট। 'মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে পশুদের যৌনজীবন', 'উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে রান্নাবান্না' জাতীয় গবেষণা করে (তত্ত্বাবধায়ক-অধ্যাপক দয়া করে এগিয়ে দিতেন) একটা উপাধি পেয়ে কলেজে ঢুকে যেত। পবিত্র সরকার সে চেষ্টা করেননি। কিন্তু তিনি কেন কোনো ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা না করে শিকাগোতে দৌড়ে গেলেন, সেটাও

আমাদের অজানা। তবে খুব পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনো ডক্টরেট ডিগ্রি এ ব্যাপারটা এখন আলোকিত।

পবিত্র সরকার ডক্টর কী ডক্টর না তাতে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার আমি অনুভব ওঁর ছাত্রছাত্রীরাও সে কারণে বঞ্চিত হয়েছেন বলে শুনিনি। তাঁর অর্ধসত্য বলার জন্যে বঞ্চিত হ প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সমগুণাসম্পন্ন মানুষ। সিনেমার ডাক্তার-নায়কের মতো জানাজানি পর তিনি গা-ঢাকা দেননি, কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কথা বলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী কথা না বললে ব্যাপারটা এত জটিল এবং জমকালো হত কি না তাতে আমার আছে।

মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে মাঝে মাঝেই আবেগ তীব্র হয় এবং তখন তিনি যেসব কথা বলেন অতিরঞ্জন থাকবেই। পবিত্র সরকার অন্যায় করেছেন কী করেননি সে বিষয়ে মন্তব্য না করে বলেছেন, ওঁর মতো আর একজন পণ্ডিত এই মুহূর্তে বাংলায় নেই। এনে দিতে বলেছেন পবিত্র বা তাঁর থেকে বেশি পণ্ডিতকে। পবিত্র সরকারও তাঁর স্বমহিমা হারিয়ে বলে বসেছে কিছু বলবেন না, যা বলার মুখ্যমন্ত্রী বলবেন।

সেই সময় ডাক্তারকে যদি পুলিশ ধরত তাহলে তিনি বলতেন, 'আমি কিছু বলব না, আমার উকিল বলবে!' আর উকিল যদি সওয়াল করতেন,—'ওঁর মতো ভালো ডাক্তার এই নেই, এনে দিন তো আর একজনকে!'—তাহলে বিচারক কী বলতেন?

আমি যে-পবিত্র সরকারকে চিনতাম তিনি নিশ্চয়ই মুখমন্ত্রীর এই মন্তব্যে খুব লজ্জা কলকাতা শহরে তো বটেই, ভারতবর্ষে ওই গুণসম্পন্ন পণ্ডিতের সংখ্যা অনেক। তাঁরা যদি না থ শুধু পবিত্র সরকারই বুঁদির গড় আগলাতেন, তাহলে তার চেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? কার সঙ্গে কথা বলে জানতে পেয়েছেন পবিত্র সরকারের সমতুল্য আর কেউ নেই? ওঁ এঁদের পাণ্ডিত্য যাচাই করা সম্ভব নয়। উনি কবিতা বুঝতে পারেন, প্রবন্ধ সম্পর্কে ভালে আছে, কিন্তু সেটাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য যাচাই করার পক্ষে যে যথেষ্ট নয়, তাও তাঁর জান তবু তাঁকে বলতে হয় এসব কথা। আর এগুলো যত বলছেন তত তিনি নেমে এসেছে মানুষ তাঁকে একদিন আশার এভারেস্টের চূড়ায় বসিয়েছিলেন। নামতে নামতে তিনি এখন ত্রিকূট পাহাড়ে চলে এসেছেন। আমাদের অনুরোধ, আর নামবেন না।

পবিত্র সরকার সম্পর্কে আমাদের কোমল মনোভাব আছে। কিন্তু যেহেতু কোনো মানুষ ঊর্ধ্বে নন তাই তাঁকে আদালতের সামনে দাঁড়াতে দিন। উকিলরা তাঁদের মক্কেলকে বাঁচাতে মিথ্যে বলেন, ওটাই ওঁদের প্রফেশন, কিন্তু একজন সৎ মুখ্যমন্ত্রী আবেগে তাড়িত হয়ে বে রকম আচরণ করবেন?

ভেবে দেখুন, বিধানচন্দ্র রায়, যিনি রোগীর মুখ দেখেই অসুখটা বুঝে যেতেন, কোনে তাঁর যদি ডিগ্রি না থাকত তাহলে কি জ্যোতি বসুরা ছেড়ে দিতেন? বলতেন, নিয়ে আ একজন বিধান রায়কে!!

আগস্ট ২০০৪

'উপ'-র উপদ্রব

আমি যে পাড়ায় থাকি সেই পাড়ার বিধায়ক সাংসদ হয়ে যাওয়ায় নতুন বিধায়ক খুঁজতে উপ-নির্বাচন হয়ে গেল। এ নিয়ে প্রথম দিকে কেউ মাথা ঘামায়নি, যেহেতু আসনটিতে প্রবীণ ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা প্রথম থেকে নির্বাচিত ছিলেন তাই এটি ফরোয়ার্ড ব্লকের আসন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সারাবছরে আমরা ফরোয়ার্ড ব্লকের কোনো অস্তিত্ব পাড়ায় খুঁজে পাই না। এখানে বামফ্রন্ট মানে সিপিএম। সিপিএমের কর্মীরা যদি মাঠে না নামেন তাহলে ফরোয়ার্ড প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। ছেলেবেলায় দেখেছি বাড়িতে দূর- সম্পর্কের আত্মীয় গেড়ে বসেছেন এবং এমন কানকাটা যে অল্পস্বল্প অপমান গায়ে না মেখে দিব্যি পেটপুরে খেতেন।

নির্বাচনের আগে যখন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হল তখন দেখতে পেলাম বেপাড়ার লোকদেরকে রাজনৈতিক দলগুলো আমাদের প্রতিনিধি করার জন্যে দাঁড় করিয়েছেন। তৃণমূলের যিনি প্রার্থী তিনি থাকেন দক্ষিণ কলকাতায়, ট্যাক্সি ইউনিয়নের সম্পাদক। সম্প্রতি বড় নেতারা অভিমানী হওয়ায় দিদির কাছাকাছি হয়ে যে-কোনো প্রতিবাদী মিছিলের সামনে রঙ-বেরঙা পাঞ্জাবি পরে হাঁটছেন। একসময় তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি রাত বেশি হলে অন্যের কাঁধে ভর করে বাড়ি ফেরেন। তা তিনি বললেন, রাজীব, সোনিয়া যদি বাড়ি থেকে অনেক দূরে গিয়ে প্রার্থী হতে পারে তাহলে আমি পারব না কেন? জ্যোতিবাবুও তো বরাহনগরে দাঁড়িয়েছিলেন। আমার বাড়ি থেকে শোভাবাজারে পাতাল রেলে দশ মিনিটে পৌঁছনো যায়। কংগ্রেসের যিনি প্রার্থী তিনি মিনমিন করে বললেন, কবে কখন নাকি এ পাড়ার কাছাকাছি থাকতেন। আর ফরোয়ার্ড ব্লক যাঁকে প্রার্থী করলেন তাঁর নাম দেখে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বললেন, ও তো চুল্লুখোর! সেই চুল্লুখোর ব্যক্তিও এলাকার বাইরে থাকুন। সিপিএমের প্রবল চাপ সত্ত্বেও ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী পালটালেন না। কেউ কেউ ভাবলেন, খোদ বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান যখন বামফ্রন্টের প্রার্থীকে চুল্লুখোর বলেছেন তখন পাবলিক ওঁকে ভোট দেবে না। পঞ্চাশের দশকে কোনো রাজনৈতিক দলের সম্পাদক যদি তাঁর দলের প্রার্থী সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে এমন মন্তব্য করতেন, সে চোখে অন্ধকার দেখত। কিন্তু ফরোয়ার্ড ব্লক জেদ ধরায় বাধ্য হল সিপিএম "চুল্লুখোর" শব্দটি গিলতে। তাদের ক্যাডাররা মাঠে নেমে গেল, ফরোয়ার্ড ব্লকের কোনো কর্মী আছে বলে মনে হল না। ক্যাডাররা প্রচার চালালো—জনদরদি মাটির মানুষ, আপনার ঘরের ছেলেকে জয়যুক্ত করুন। আশ্চর্যের ব্যাপার, বিরোধী দলগুলো কোনো পোস্টারে লিখল না—"ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী চুল্লুখোর—বিমান বসু।" তাঁরা নিজেদের নেতা বা নেত্রীর ছবি ছাপালেন। ভোটের আগেই আমরা জেনে গেলাম, ফুটবল খেলাটা হচ্ছে ব্রাজিল বনাম ভারতের।

কিন্তু এই উপনির্বাচন কেন? তিন তিনটি উপনির্বাচন হয়েছে, কারণ আগের বিধায়করা সাংসদ হয়ে গেছেন। কেন তাঁদের সংসদে যাওয়ার জন্যে প্রার্থী করা হল? সংসদে গিয়ে তাঁরা কী এমন মহামূল্যবান কাজ করেছেন যা আমাদের সপ্তম স্বর্গে তুলে দিয়েছে? বামফ্রন্ট তো জানতেন এক-

একটা উপনির্বাচনে খরচ কত হবে। সরকারি খরচ তো বটেই, নির্বাচনী প্রচারের খরচও (আর এই টাকা তো শেষ পর্যন্ত মানুষকেই দিতে হবে। এই অপচয় জেনেশুনে করার (যুক্তি আছে তা আমি জানি না। সুধাংশু শীল সংসদে গিয়ে সোমনাথ চ্যাটার্জীর মতো বক্তৃ সরকারের ত্রুটিগুলো উন্মোচন করবেন—এমন স্বপ্ন কোনো শিশুও দেখবে না। তিনি এ কাউন্সিলর, বিধায়ক এবং সাংসদ ছিলেন বলে গিনেস বুকে নাম তুলতে ব্যস্ত। মহম্মদ একটিই পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর সাদা পাঞ্জাবি আরও সাদা দেখাচ্ছে সাংসদ হওয়ার পর। আত্মীয়কে এতদিন শ্যামপুকুরের লোক চোখে দেখেনি, তাঁর এখনকার ভোটাররাও আগা বছর দেখবেন না।

ব্রামফ্রন্টে যোগ্য প্রার্থীর সংখ্যা অনেক। তাই এই বেহিসেবি খরচ না করলেই হত। এ এখন, পশ্চিমবাংলায় কয়েকটি আসন বাদে সর্বত্র কুমোরটুলির মূর্তি স্বচ্ছন্দে জিতে যাবে যাচ্ছে সিপিআই, ফরোয়ার্ড ব্লকের সমর্থক সংখ্যা কমতে কমতে যেটুকুতে পৌঁছেছে তা দি কলেজ ইলেকশন জেতা যাবে কি না সন্দেহ। সিপিএম আভাসে ইঙ্গিতে বোঝাচ্ছে এ ওরা সিপিএম-কে ছেড়ে গেলে কী হবে তা জেনেছেন ভালোভাবেই। তবু যখন মাঝে ম করেন তখন মানুষ হতভম্ব হয়, কমিক দৃশ্য দেখছে বলে মনে করে।

এ দিন মানুষের মনে হত তৃণমূল সবচেয়ে বড় সিপিএম বিরোধী শক্তি। গত লোকসভ থেকেই সেই ভুল ভেঙেছে। একজন মহিলার ইচ্ছা অনিচ্ছায় যদি একটা দলকে চলতে হ তার আয়ু বেশিদিন হতে পারে না। যত দিন যাচ্ছে তত মহিলার আচার-আচরণ কথাবার্তায় স্পষ্ট হচ্ছে। স্টার থিয়েটার পুনর্নির্মাণ করে সুব্রত মুখোপাধ্যায় বাহবা পাবেন এটা ওঁর না। ঠিক যেভাবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদবানি সাহেব কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব দিতে চাইলে গিয়েছেন ঠিক সেইরকম প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন স্টারের ব্যাপারে। তিনি সবসময় চাইছেন নেতারা পায়ের কাছে বসে থাকুক। দলের কেউ জনপ্রিয় হতে চাইলে বা সেইরকম ব তাঁর গোঁসা হয়। তিনি বললেন, সুব্রতবাবু তথা কর্পোরেশন স্টার থিয়েটারের উদ্বোধ মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলে তিনি অনুষ্ঠানে যাবেন না। অদ্ভুত কথা। মুখ্যমন্ত্রী এ প্রধান পরিচালক। তিনি সংস্কৃতি দপ্তরও দেখেন। কোনো পার্টিনেতা হিসেবে নয়, মুখ্যম অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি যথেষ্ট গুরুত্ব এনে দেয়। স্টারের মতো ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানকে প্রা থেকে টেনে এনে আবার জীবন্ত করার পেছনে যে ইতিহাস তাতে সুব্রতবাবুই জানিয়েছে সাহায্য ছিল। মুখ্যমন্ত্রীও প্রকাশ্যে জানিয়েছেন, তাঁরা যা পারেননি সুব্রতবাবু পেরেছেন। ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে ওঁরা যে একত্রিত হয়েছিলেন তাতে আমরা হ মমতা খুশি হননি। তিনি অনুষ্ঠানে শুধু আসেননি তাই নয়, সেই একই সময়ে তাঁর ডেকে দলীয় সদস্যদের হুমকি দিয়েছেন, কেউ যেন স্টারে না যায়। অথচ স্টারের অন দল পরিচালিত কলকাতার কর্পোরেশনের। নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করতে মমতা। সুব্রতবাবু নগরপিতা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দেননি, সারাক্ষণ মঞ্চে ছিলেন, ম মেয়র পরিষদের সুস্থ মস্তিষ্কের সদস্যরা। মমতার হুমকিকে উপেক্ষা করেই।

পরের সপ্তাহে আর একটি প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসে সুব্রতবাবুর চেয়ারের জন্যে নির্দিষ্ট চেয়ারে না বসে দূরে বসে রইলেন একা, মুখ ঘুরিয়ে। যেন সুব্রতবাবুর পাপ। ওঁর এই ছবি ছাপা হয়েছে কাগজে। একসময়ে বাঙালির একান্নবর্তী সংসারে একজন কুচুটে স্বভাবের বিধবা পিসিমা থাকতেন যিনি ভাইয়ের বউদের সব কাজে ত্রুটি দেখতেন কাশীবাসী হওয়ার হুমকি দিতেন। ঠিক তাঁর মতো ভঙ্গি। পায়ের তলার মাটি যত সরে ত তত মরিয়া হয়ে উঠছেন। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, এই মরিয়া ভাবটা দেখাতে হচ্ছে নিজের আড়াল করার জন্যে। অসহায় বলে নিজের আহত মুখ দেখাবেন না বলে রুমালে ঢ

ফটোগ্রাফার দেখে, রুমাল না থাকলে খবরের কাগজে। এই মুখ ঢাকাঢাকির দৃশ্য দেখতেই পাঠকের মনে পড়ে যায় আদালতে তুলতে ভ্যান থেকে বের করা আসামিরাও মুখ ঢাকেন ছবিতে ধরা পড়ে যাবেন বলে।

মমতা একদিন আক্রমণ করেছিলেন জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। বামফ্রন্টের বিভিন্ন দলের সম্পাদকদের সম্পর্কে সৌজন্য দেখিয়েছেন। তারপর গালাগাল করেছেন নিজের দলের লোকদের। সেখানে অজিত পাঁজা, সুদীপ ব্যানার্জী তো ছিলেন, সুব্রতবাবুও বাদ যাননি। এই সুব্রতবাবু, যিনি মমতার সুব্রতদা, যাঁকে সিপিএমের চামচে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে 'তরমুজ' বলেছিলেন, তাঁকে কতবার সহ্য করতে পারেননি মমতা তার ইয়ত্তা নেই। প্রায়ই মনে হত, এই দল থেকে তাড়িয়ে দিলেন বুঝি! কিন্তু দিতে পারেননি। যিনি সবার মুণ্ডু কাটছেন তিনি সুব্রতবাবুর বেলায় কেন আটকে যাচ্ছেন তা তিনিই জানেন। স্টারের উদ্বোধনের আগে মমতা যে হুংকার ছেড়েছিলেন তাতে মনে হয়েছিল সর্বনাশ হয়ে যাবেই। স্টার মঞ্চে সুব্রতবাবুর হাসিমুখ দেখে মনেই হল না তিনি চিন্তিত। শেষ পর্যন্ত গোঁসা করেও সেটা গিলে ফেললেন মমতা। একে একে অনেক নেতাই সরে যাচ্ছে অথবা তিনি তাড়াচ্ছেন দল থেকে। এই উপনির্বাচনে তাঁর দলের অবস্থা করুণ হয়েছে। জোড়াবাগানে তাঁর দলীয় সম্পাদকের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। একে একে নিভিছে দেউটি। তার ওপর তাঁর দলের লোকজন 'পুরশ্রী' নামে কর্পোরেশনের যে পত্রিকা বের করে সেখানে যা লেখা হল তাতে সরকার উদ্যোগী হলে মমতা গৃহচ্যুত হতে পারেন। ছেপে বের হওয়া পত্রিকাটি নিজেদের হলেও তাই দলীয় নেতারা অস্বীকার করলেন, 'ওতে ভুল লেখা হয়েছে।' নিজেরাই কেন ভুল লিখছেন তার কৈফিয়ৎ নেই।

এই মুহূর্তে জনপ্রিয়তা নেমে গেছে হু হু করে। নামিয়েছেন মমতা। অথচ সিপিএমের বিরোধী শক্তি হিসেবে কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে তাঁকেই মানুষ নির্বাচিত করেছিল। শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকলে শাসক দল স্বৈরাচারী হয়। মমতার বাসনা ছিল মুখ্যমন্ত্রিত্ব। না পেয়ে বিজেপি-র সঙ্গ ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের বায়না ধরে শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন। একজন এম পি হিসেবে থাকতে তাঁর মন ভরে না। আর তখনই তিনি জনসাধারণের ইচ্ছেকে অসম্মান করতে শুরু করলেন। আর এই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে কবর থেকে উঠে আসতে চাইছে কংগ্রেস।

এই উপনির্বাচন আমাদের ওপর প্রচুর টাকার কর চাপাবে। এই উপনির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে কেউ শিক্ষা নিতে চাইবেন না, কেউ দেওয়াল লিখনটাকে বদলাতে চেষ্টা করবেন না, এটাই আপশোস।

নভেম্বর ২০০৪

লেখকের দাম ফুলের তো

'আনন্দলোক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রূপক সাহা টেলিফোনে জিজ্ঞাসা করলেন আমি 'আনন্দবাজা পুজো সংখ্যায় ছাপা বিশেষ একটি উপন্যাস পড়েছি কি না। তখন ঢাকার কাগজের ঈদ সং জন্যে লেখা চলছিল, পড়ার সময় পাইনি। রূপক আমাকে অনুরোধ করলেন, উপন্যাসটি যেন ফেলি।

ব্যাপারটা ভালো লাগল। রূপক এককালে স্পোর্টস রিপোর্টার ছিলেন। তখনই গল্প-উপ লেখালেখি শুরু করেন। অন্তত আমার চোখে পড়ে। একটু অন্য ধরনের লেখা, তাই পাঠকের ন পড়ে যান। তবে এখনও সেই পাঠক তৈরি করতে পারেননি যাঁরা বই বের হলেই কিনে হাজার কপি এক-দু'মাসে বেরিয়ে যায়। কিন্তু রূপকের ফোন পেয়ে খুশি হয়েছিলাম এই ভে একজন লেখক আর একজন লেখকের লেখা নিয়ে ভাবছেন এবং তাঁর সিনিয়রকে পড়তে বল এটা আগে খুব দেখা যেত। অচিন্ত্যকুমার, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ অন্যের পড়তেন, ভালো লাগলে সবাইকে ডেকে জানাতেন। বস্তুত, একটু-আধটু ঝগড়াঝাঁটি থাক সাহিত্যিকরা সেসময় সবাই সবাইকে চিনতেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও কাকু-জেঠু বলত। সি বিমল করের বাড়িতে টালিগঞ্জের বরেন গঙ্গোপাধ্যায়কে প্রায়ই আড্ডা মারতে দেখা যেত। ঝগড়াও হত। একটি ঝগড়ার কথা বিমল মিত্রের মুখেই শুনেছি। তখন বিমল মিত্রের বেশ হয়েছে। আমায় জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি তো ভালোই লেখো, বলো তো, রবীন্দ্রনাথের, শরৎ পরে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখক কে?

ফ্যাসাদে পড়লাম। বললাম, কোনো একজনকে শ্রেষ্ঠ না বলে—

—না না, একজনকে বলতে হবে।—তিনি মাথা দোলালেন।

—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

—এ্যাঁ!—চোখ বড় করলেন বিমল মিত্র—বলছ কী? লোকে 'অশিক্ষিত' বলবে।

—তার মানে?

—সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আর একজন সাহিত্যসম্রাট ছিলেন। বামুনের ছেলে ব বোধহয় একটু নোলা বেশি ছিল। লাভপুরের জমিদারি চলে যাওয়ায় বাংলা সাহিত্যের জমিদার চেয়েছিলেন।

বুঝলাম উনি কার কথা বলছেন। বললাম, তারাশঙ্করবাবু তো সত্যি বড় লেখক।

—কোনো বড় লেখক নিজের জন্মদিনে ম্যারাপ বেঁধে লোক খাওয়ায়? বলো!

—আমি ঠিক জানি না।

—ওই তোমাদের স্বভাব। সত্যি কথা বলতে ভয় পাও, 'জানি না' বলে কাটাও। শোনো, সকালে কলেজস্ট্রিটের প্রকাশকের কাছে গিয়েছি। সঙ্গে গাড়ি ছিল না। প্রকাশক বললেন, 'আ

চেতলায় যাব, আপনাকে নামিয়ে দিতে পারি।' বললাম, 'বেশ, চলো।' কিন্তু সে বলল তার মিনিট কুড়ির একটা কাজ আছে নর্থ ক্যালকাটায়, সেটা যাওয়ার আগে সেরে যাবে। আমার তাড়া ছিল না। তা দেখলাম গাড়ি শ্যামবাজার মোড় পেরিয়ে পাকপাড়ার দিকে যাচ্ছে। 'কোথায় যাচ্ছ'—জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল, 'আজ তারাশঙ্করের জন্মদিন। দু'মিনিটের জন্যে দেখা করে যাব।' তা বাড়ির সামনে গিয়ে আমার চক্ষুস্থির। বিশাল ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। লোকজন প্রচুর। আমি গাড়ি থেকে নামলাম না। প্রকাশক নেমে গেল। ওই বয়সে কেউ নিজের জন্মদিন করছে দেখে মাথা গরম হয়ে গেল। হঠাৎ দেখি তিনি আসছেন। খালি গায়ে কাছে এসে বললেন,—একী! আপনি গাড়িতে বসে আছেন কেন? নামুন, নেমে আসুন।

বললাম, না। কাজ আছে। তাছাড়া আমি তো নিমন্ত্রিত নই!

—আমি তো তেমনভাবে কাউকে বলিনি। এরাই জোর-জবরদস্তি করে করছে। তা একটু মিষ্টিমুখ করবেন না?

—না। বাড়ি গিয়ে লিখতে হবে।

শুনে তিনি হাসলেন,—ও। আচ্ছা, আপনি শুধু পুরোনো দিনের কাহিনী লেখেন কেন বলুন তো? আজকের সমস্যা, আজকের ছেলেমেয়েদের নিয়ে লিখতে কি অসুবিধে হয়?

প্রকাশক এসে গিয়েছিল বলে মুখের ওপর জবাব দিতে পারলাম না। বাড়ি ফিরে প্রতিজ্ঞা করলাম, এর উপযুক্ত জবাব দিতে হবে। লিখতে শুরু করলাম—'কড়ি দিয়ে কিনলাম'। একেবারে আজকের কথা।

বিমল মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল আমি একটি শিশুকে দেখতে পাচ্ছি। মতান্তরের কারণে যদি একটি উপন্যাসের জন্ম হয় তবে তার চেয়ে আর কী বেশি কাম্য হতে পারে? মনে পড়ছে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর যখন মোটা বই বের হল তখন আমরা ঠাট্টা করতাম—কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম। যেন অত বড় বই লেখাটাই খুব খারাপ ব্যাপার। তখন বই ছাপা হত হ্যান্ড কম্পোজিং-এ, পাইকা, স্মল পাইকায়। সে সময়ের পাঁচশো পাতার বই এখনকার আধুনিক মুদ্রণ-পদ্ধতির কারণে তিনশো পাতা হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কী, 'সাতকাহন', 'গর্ভধারণী', 'পূর্ব-পশ্চিম', 'প্রথম আলো', 'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর চেয়ে অনেক বেশি শব্দসংখ্যার উপন্যাস। ঠাট্টাটা গিলতে হয়েছে আমাকে, ভাগ্যিস আমাকে নিয়ে কেউ অন্য ঠাট্টা করেনি!

এখন আমরা, লেখকরা, যে যেমন পারি দ্বীপের মতো বাস করি। একটা ব্যাপার তখনও ছিল, কিন্তু এখনকার মতো এত চোখে পড়ত না। লেখা থেকে নাম, অর্থ, কারও কারও প্রতিপত্তি হচ্ছে। ঘন ঘন বিদেশে যাচ্ছেন লেখকরা। কিন্তু ক'জন? বড়জোর চার কী পাঁচ। বাকিরা অনেক পেছনে। চিরকাল যা হয়েছে, যাঁরা জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তাঁদের সম্পর্কে চমৎকার উপেক্ষা করে গেছেন পাঠক-অপ্রিয় লেখকেরা। আবার এই জনপ্রিয় লেখকদের কেউ যদি বড় কাগজের গল্প-কবিতা সম্পাদক হন তবে তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছে গোষ্ঠী। তাঁর চরণতলে কে আগে প্রাণ দান করবে তার জন্যে হুড়োহুড়ি।

সেদিন একজন প্রবীণ সাহিত্য-প্রেমিক অপেক্ষা করে বললেন,—আগেকার সাহিত্যিকরা নেমন্তন্ন করলেই যেতেন, ভাষণ দিতেন। কখনও একা, কখনও দল বেঁধে। তা সে কুচবিহার হোক আর কটকই হোক। প্রবাসী বা মফস্সলের মানুষ তাঁদের দেখা পেতেন, কথা শোনার সৌভাগ্য হত। এখন জনপ্রিয় লেখকরা কিছুতেই কটক বা কুচবিহারে যেতে চান না। তাঁদের বদলে দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকদের নিয়ে যেতে হয়। এঁদের নাম শুনেছে স্থানীয় লোকেরা, বই পড়েনি।

স্বপক্ষে একজন জনপ্রিয় লেখক বললেন,—আচ্ছা বলতে পারো, কেন যাব? আমি সব কাজ

ফেলে দু'রাত ট্রেনে কাটিয়ে কুচবিহারে গিয়ে বক্তৃতা দিলাম। সেই সঙ্গে সই। আর গোটা পঞ্চাশে তরুণ কবির বই উপহার নিয়ে ফিরে এলাম, যার একটি কবিতাও মনে রাখার নয়! কেন? এ দু'দিন বাড়িতে ঘুমোলেও শরীর ভালো থাকত। অথচ একজন উঠতি গায়ককে নিয়ে যেতে ও দশ থেকে বিশ হাজার টাকা অনায়াসে বের করেন। একজন লেখকের বেলায় সেটা মনে আ না!

হ্যাঁ, একবার আমি ঠিক করেছিলাম, কেউ সভায় যেতে বললে বলব, কলকাতার মধ্যে হ পাঁচশো টাকা, পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে হলে সাতশো, একশো মাইল হলে হাজার টাকা পারিশ্রমি দিতে হবে। কিন্তু ওঁরা যখন আসেন তখন ওঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য অজুহাত দেখাই। টাক কথা বলতে পারি না। ভয় হয়, যদি কেউ চট্ করে রাজি হয়ে যান! গত মাসে আমার কাছে বারো সাহিত্যসভার নেমন্তন্ন এসেছিল। সেগুলো পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলাশহর ছাড়াও, আগরতল গৌহাটি, ভুবনেশ্বরে ছড়িয়ে ছিল। হ্যাঁ, উদ্যোক্তারা ট্রেনের ভালো টিকিট কেটে দিতেন, যত্ন ক অভ্যর্থনা করে হয় কারও বাড়িতে বা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করতেন। বিকেলে সাহিত্যসভায় গি সেই যে চেয়ারে বসতাম, রাত দশটার আগে মুক্তি নেই। সেই সময় আমাকে জনা পঞ্চাশেক কবি কবিতা শুনতে হত। তাঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বাস করেন যে তাঁরা ভালো লেখেন, নিজের পয়সায় অনুদানের টাকায় বই ছাপিয়েছেন। শুধু কলকাতার বড় পত্রিকা বা প্রকাশকরা তাঁদের মূল্য বুঝে পারছে না। দু-একজন এমন গল্প পড়বেন যে তন্দ্রা আসতে বাধ্য। তারপর আমাকে বক্তৃতা দি হবে। একই কথা বারোটি অনুষ্ঠানে বলতে কোনো অসুবিধে নেই! কারণ দু-তিনজন ছাড়া কে মন দিয়ে শুনবেন না। একটা ফুলের তোড়া এবং একবাক্স মিষ্টি এমন ভঙ্গিতে আমার হাতে তু দেওয়া হবে যাতে মনে হবে বিশাল কিছু দিচ্ছেন। তারপর হোটেলে নিয়ে গিয়ে ভালো করে খাই ওঁরা ফিরে যাবেন। সকালের ট্রেন ধরাতে আসবেন কোনো নবকুমার।

আমার বাড়ি থেকে স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া-আসার ট্যাক্সিভাড়া না-চাইতে পারায় বারোটি জায়গা যাওয়ার জন্যে অন্তত বারোশো টাকা পকেট থেকে যাবে। আসা-যাওয়ার জন্যে খুব কম করে চব্বিশ দিন বাড়ির বাইরে থাকতে হবে। না যেতে চাইলে লোকে বলবে দাম্ভিক। চব্বিশ দিন লিখতে পার না ভাবলেই খারাপ লাগে। তাই আজকাল মিথ্যে বলি।—কবে? বাইশ তারিখে? কলকাতা আশেপাশে হলে বলি—সেদিন তো বাইরে যাচ্ছি ভাই। আর বাইরে হলে 'কলকাতায় প্রোগ্রাম থাকে। সেবার একজন উদ্যোক্তা মাসখানেক আগে গৌহাটি থেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কথাবার্তা খুশি হয়েছিলাম। দিন দুই যখন বাকি তখন টেলিফোন এল—কীসে আসছেন বলুন, আমরা রিসিভ করতে যাব।

বললাম, আপনারা তো এখনও টিকিট পাঠাননি।

—ওহো, আচ্ছা আপনি আসার টিকিট কেটে নিন, এলেই দাম দিয়ে দেব।

—আমি এখন টিকিট পাব কোথায়?

—চেষ্টা করুন না দাদা। আপনি না এলে আমরা বেইজ্জৎ হয়ে যাব। এত প্রচার হয়েছে।

—বলা বাহুল্য, আমি যাইনি। লাইন দিয়ে টিকিট কেটে সভা করতে যাওয়ার কারণ খুঁজে পাইনি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র বলতেন, যাওয়ার ভাড়া দিয়েছে, টিকিট কেটে গিয়েছি, বাড়িতে রেখে খু আপ্যায়ন করেছে, কিন্তু ফেরার সময় সবাই হাওয়া। গ্যাঁটের টাকায় টিকিট কাটতে বাধ্য হয়েছি হে

একটা অভিযোগ প্রায় ওঠে—আমরা বাঙালি লেখকরা কখনোই রি-অ্যাক্ট করি না। আমাদে যুদ্ধের কবলে পড়তে হয়নি, কিন্তু প্রতিদিন দেশে এত অন্যায় কুকর্ম হচ্ছে অথচ তার বিরুদ্ধে কলম ধরি না। অনিল বিশ্বাস সত্যিকে মিথ্যে বলে যখন উড়িয়ে দেন, মমতা গায়ের জোরে যখন কিছু আমাদের ওপর চাপিয়ে দেন, তখন আমরা বলি না—আপনারা অন্যায় করছেন। আমরা যে যার মতো রয়েছি। সম্ভবত এখন আমরা কেউ অন্যের লেখাও পড়ে দেখি না। কোন লেখা ভালো

বা মন্দ তা অন্যের মুখে জানতে পারি। যদি বা পড়ে ফেলি, ভালো লেখার জন্যে আগবাড়িয়ে প্রশংসা করি না। খারাপ লাগলে বলি, না ভাই, এখনও পড়ে উঠিনি। অথবা উদাসীন গলায় বলি— ঠিক আছে, ভালোই তো। এটা বললে গা বাঁচানো যায়। অপ্রিয় সত্যি বলে শত্রু বাড়াতে বড় অনীহা।

'আনন্দলোক'-এর সম্পাদক আমাকে অনুরোধ করেছেন। সচরাচর কেউ এমন অনুরোধ করেন না। ধরা যাক উপন্যাসটি পড়ে আমার খারাপ লাগল। সত্যি কথা বললে সেটা কাগজে ছাপা হবে বলে অনুমান করছি। আক্রান্ত হতে হবে তখন। আবার ভালোও তো লাগতে পারে। লাগলে গলা ফুলিয়ে বলব। দেখা যাক!

ডিসেম্বর ২০০৪

বাঘের ঘরে ঘোগের ব

সংবিধান তৈরির পর থেকে এযাৎকাল আদালতের ওপর আস্থা এবং শ্রদ্ধা রাখাটাই কর্তব্য মনে করেছি আমরা। নিচের আদালতে সুবিধা না পেলে মানুষ আরও ওপরের আদালতে আ করে, শেষপর্যন্ত হাইকোর্টে যায়। তাতেও সন্তুষ্ট না হলে দিল্লির সুপ্রিম কোর্টের দরজা খোলা অ সেই সুপ্রিমকোর্ট যা বলবে, তাই শেষ কথা।

রাজনৈতিক দলগুলোর দ্বিচারিতা, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভ্রষ্টাচারের চাপ থেকে আত্মর একমাত্র অবলম্বন হল আদালত, তা মানুষ মনেপ্রাণে জেনেছিল। কখনো কখনো একজন বিচারা বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এবং তাঁর পদচ্যুতির কথা শোনা গেলেও সেটাকে বিরল দৃষ্টান্ত হিসে ভেবেছে মানুষ। এমনকী মামলা চলাকালীন আদালতকর্মীদের বখশিশ চাওয়ার বাড়াবাড়িকেও উপেক্ষা করেছে, এই ভেবে বিচারক ন্যায়বিচার করবেন।

বিভিন্ন আদালত, তা নিম্ন হোক বা সুপ্রিমকোর্ট হোক, বিচারক হিসেবে কারা দায়িত্ব বহন করে শুধু আইনে পণ্ডিত এবং স্বচ্ছ দৃষ্টান্তের অধিকারী হলেই চলবে না, তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দি হবে। প্রবীণ আইনজ্ঞের কাছে শুনেছি, বিচারকের পদে যোগদানের আগে পুলিশকে দিয়ে যা করা হত তাঁর চরিত্র সম্পর্কে। দেখা হত, কোনো রাজনৈতিক দলের তিনি সদস্য বা সক্রিয় সম কি না। হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের আমরা মহামান্য বলি। বিভিন্ন অরাজনৈতিক অনুষ্ঠ তাঁদের সসম্মানে নিয়ে আসি। ভারতীয় সংবিধানের রক্ষক হিসেবে আমরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধানি

এদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কেউ কাউকে সহ্য করে না। এমনকী স্বার্থ মেটাতে ফ্রন্ট তৈ করেও বড় ছোটকে উপেক্ষা করে, ছোট বড়র প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে থাকে। ভারতীয় জনগণ তাঁ অভিভাবক হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং যা কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের আছে, এইরকমই ভাবগতি একই অপরাধ অন্যদলের কেউ করলে চিৎকার করে ধমকান, আর নিজের দলের লোক কর অস্বীকার করেন। বড়জোর বলেন, তদন্ত করে দেখছি। কিন্তু এতদিন তাঁরা আদালতের সঙ্গে ঝামেল যেতে চাননি। মুখে বলেছেন, আদালতকে আমরা শ্রদ্ধা করি, আদালত যা রায় দেবে তা অবশ মেনে নেব। কথাগুলো শুনে আমরা খুশি হয়েছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ভেবেছিলাম এ যেন অনেক সেইরকম কথা বলল এরা। আমি মিথ্যে বলব না, কাউকে খুন করব না, গাড়ি চালাতে গিয়ে ই করে কাউকে চাপা দেব না, যিনি বলেন তাঁকে নির্বোধ ভাবতে বাধ্য হই আমরা। এগুলো ঘোরতর অন্যায় তা লোকটির জানা নেই বলেই বড় গলায় কথাগুলো বলছে। রাজনৈতিক দলগু যে অঙ্কের মতো আচরণ করছেন এমন ভাবার কোনো কারণ না থাকলেও আমরা খুশি হয়েছিলা মনে হয়েছিল, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলতে হয়, 'মিথ্যে বলব না', এও তেমন।

বিচারপতি অমিতাভ লালা সিপিএমের মিছিল পথ জুড়ে চলায় ঠিক সময়ে কাজে যেতে পারেননি। এদেশে মিছিলের অত্যাচারে হাসপাতালে যেতে না পেরে অসুস্থ মানুষ মারা যায়, যাত্রীরা ট্রেন ধরতে পারে না, সঠিক সময়ে অফিস পৌঁছাতে পারেন না অফিসযাত্রী, জরুরি অপারেশন করতে পৌঁছাতে পারেন না ডাক্তার। এসব বহুদিন ধরেই আমরা জানি। বিচারপতি লালাও জানতেন। আমাদের সহ্যশক্তির ওপর কড়া পড়ে গেছে বলে এ নিয়ে কথা বলি না। হয়তো বিচারপতি লালার সেদিন খুব জরুরি কাজ ছিল অথবা জীবনে প্রথমবার তিনি মিছিলের শিকার হয়েছিলেন। একজন হাইকোর্টের বিচারপতি যখন কৈফিয়ত চান তখন সেটা ব্যক্তিবিশেষের চাওয়া থাকে না, সেটা গোটা হাইকোর্টের সম্মানের সঙ্গে জড়িয়ে যায়।

ওই মিছিল যদি কংগ্রেস বা এসইউসি-র হত তাহলে বামপন্থীরা আনন্দিত হত। কিন্তু যেহেতু মিছিলটি সিপিএমের ছিল তাই বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বললেন, 'মিছিল করা গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। আমরা রাস্তা বন্ধ করে মিছিল করিনি। রাস্তার এক পাশ দিয়ে ভদ্রভাবে করেছি।' এখানেই তিনি থেমে থাকেননি। ছড়া কাটলেন, 'বিচারপতি লালা, বাংলা ছেড়ে পালা।'

সঙ্গে সঙ্গে আদালত অবমাননার দায়ে পড়ে গেলেন বিমানবাবু। অতীতে এরকম ঘটনা ঘটলে লোকে ভয়ে কাঁপত। পাঁচ-সাত বছর জেল হওয়া তো স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বিমানবাবুর মুখ ছবিতে দেখে মনে হয়েছে, তাঁর হাতে ভুবনের ভার, তিনি ভয় পাবেন কেন? মামলা শুরু হল। প্রতিবারেই তারিখ পড়ে চার-ছয় মাস পরে, এই তারিখ দিতে গিয়ে একসময় বিচারপতি লালা অবসর নেবেন, পরিণত বয়সে বিমানবাবুও দেহ রাখবেন, কিন্তু মামলার শুনানি হবে না। কেন হবে না, কীভাবে সেই হওয়াটা আটকানো যায়, তা জনসাধারণ জেনে গেছেন। আদালতে কোনো মামলা উঠলে তার পরের শুনানির দিন ধার্য হয় দু-তিন মাস পরে। ক্রিকেট বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলাটা সুপ্রিমকোর্টে এ বছরে উঠবেই না। ধনঞ্জয়ের ফাঁসির হুকুম হওয়া সত্ত্বেও বহু বছর তা ফাইল-চাপা পড়েছিল। আর কোনো বাড়ি জমি বিষয়ক মামলা লোয়ার কোর্টে শুরু হয়ে তা হাইকোর্টে গিয়ে শেষ হতে পঞ্চাশ বছর লেগে যাওয়া খুব স্বাভাবিক ব্যাপার, এদেশে। অতএব বিমানবাবু নিশ্চিত, তিনি জামিন নিয়ে যেমন ছিলেন আমরণ থাকতে পারবেন।

আদালতের বিরুদ্ধে বক্রোক্তি করলে আদালত ব্যবস্থা নিতে উদ্যোগী হয়েছে, এই ছবিটা দেখে কেউ কেউ স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু বিমানবাবুর আচরণ সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ফেলবে তা কেউ কি জানত?

হাতকাটা দিলীপ ধরা পড়ল ষষ্ঠী দুলের গ্রামের বাড়ি থেকে। সেখানে ওই খুনি লুকিয়েছিল কয়েক মাস। এই লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে সাহায্য করেছে ষষ্ঠী এবং তার পরিবার। সেটা স্বেচ্ছায় না ভয়ে—তা তর্কসাপেক্ষ। আইনে আছে যে-কোনো অপরাধীকে সাহায্য করলে সেটাও গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। হাতকাটা দিলীপকে গ্রেপ্তারের পর আমরা দেখলাম, শুধু ষষ্ঠী এবং তার বন্ধু দীপঙ্করকে ধরা হল। কিন্তু ওই একই অপরাধে অপরাধী ষষ্ঠীর বাড়ির লোকজন, পাড়া-প্রতিবেশী, যারা জানত, তাদের গায়ে আঁচ লাগল না।

ষষ্ঠীদের ধরার পর অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল, যা এদেশে আগে হয়নি। অপরাধ যেখানে পরিষ্কার, সেখানে তাদের খেলোয়াড় জীবনের কথা ভাবা হল। ময়দানের মাতব্বররা, মন্ত্রীমশাই থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতারা চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন ওদের মুক্তির জন্যে। ওদের জায়গা মাঠে, আদালতে নয়—বলে আবদার করা হল ওদের খেলতে দিতে। এতে প্রভাবিত হয়ে সরকারি উকিল জামিনের বিরোধিতা করলেন না। তবু বিচারক জামিন দিতে অস্বীকার করলে তাঁকে গালাগাল দেওয়া হল।

শেষ পর্যন্ত আপিল করে জামিন নেওয়া হল। অবাক হয়ে দেখলাম, আদালত এই ব্যাপারে জোয়ারি ব্যাপার মেনে নিলেন। আজকে যদি দাউদকে আমি আমার বাড়িতে লুকিয়ে রাখি লোকটা ধরা পড়লে আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে পাঠকরা চেঁচান—লেখককে লিখতে দেওয়া ওর জায়গা আদালতে নয়, তাহলে আদালত কি আমাকে ছেড়ে দেবে? জামিন দিয়ে বলবেন, ইচ্ছে লেখো! ভাবলেই শিউরে উঠছি।

আর এইসব কাণ্ড যখন ঘটছে তখন এসইউসি বন্‌ধ ডাকল। তেলের দাম বেড়েছে, জিনিস দামও। সেই কারণে বন্‌ধ ডেকে ওরা মানুষের উপকার করবেন। আর কাজ না করলে যারা পায় না, তারা শুকিয়ে থাকল। তার পরেই বন্‌ধ ডাকল নকশালপন্থী কিছু সংগঠন। দেখা কিছু মানুষ সেই সুযোগে বাড়িতে বসে থাকতে পছন্দ করছে। এর পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একই অজুহাত দেখিয়ে বন্‌ধ ডাকলেন। প্রথমে সেই ডাক ছিল ২৪ ঘণ্টার। যেদিন তিনি দে অচল করতে চাইলেন, সেদিন আবার ছিল প্রতিবন্ধী দিবস। কে শোনে কার কথা! একদিন অচল করে দিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে সপ্তম স্বর্গে তুলে বদ্ধপরিকর। হাইকোর্টে আবেদন বন্‌ধ বন্ধ করতে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিলেন মমতা বা তাঁর পার্টিকে হাজির হতে। বাড়িতে বসে সমন না নিয়ে তাঁরা বলতে লাগলেন, সমন পাইনি, বা পেলেও কেন আদালতে যাব। শে আদালত এই বন্‌ধকে বে-আইনি ঘোষণা করে মমতাকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বন্‌ধ তুলে বললেন। স্বাধীনতার পর প্রথম একজন রাজনৈতিক নেত্রী ঘোষণা করলেন, তিনি আদালতের অ মানবেন না।

আমরা স্তম্ভিত! তারপর আমাদের অসাড় করতে এগিয়ে এলেন অনিল বিশ্বাস এবং কোম্প তাঁরা বললেন, 'আদালতের আদেশ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ বন্‌ধ হল শ্রমিকের হাতি আদালত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে পারেন না।' অবাক হয়ে দেখলাম, এই ইস্যুতে সিপি তৃণমূলের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী। ভাবা যায়?

এ বছর প্রথম বন্‌ধ ডেকেছিলেন ৩রা ফেব্রুয়ারি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্যু ছিল, বামফ্র চাপিয়ে দেওয়া ট্যাক্স। ২৪শে ফেব্রুয়ারি সিটু ডাকে শিল্প ধর্মঘট। ২রা আগস্ট তৃণমূল আবার ডাকে আইনি বিলের বিরুদ্ধে। বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের, তেলের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে এসই সিপিআই(এম এল) বন্‌ধ ডাকে ১৭ই এবং ২২শে নভেম্বর। এতেও ক্ষান্ত না হয়ে তৃণমূল ডাকল ৩রা ডিসেম্বর।

প্রবীণ কম্যুনিস্ট নেতা বিনয় কোঙার অনুরোধ করেছিলেন বন্‌ধ জিনিসটা হাস্যকর না তুলতে। তাতে তার ধার কমে যাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'বন্‌ধ ডাকাটা কীরকম হা পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।' অথচ তাঁর দলই আদালতের বিরুদ্ধে যাচ্ছে বন্‌ধ-এর সমর্থনে। তবে কেউ বন্‌ধ ডাকলে তাঁরা বলছেন, অকারণে ডাকছে। নিজেরা ডাকলে সেটা নাকি যুক্তিযুক্ত। দেশে গাড়ির চাকা অচল করে সিটু কী পেলেন তাঁরাই জানেন।

কিন্তু মূল কথা হল, মমতা আদালতকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আদ অবমাননার মামলা শুরু হলে বিমানবাবুর মতো এ জীবনে শেষ হবে কি না তা জানি না। স মধ্যেই ভূত আছে, তা ওঁরা জানেন। একটা মামলাকে কীভাবে সুদীর্ঘকাল জিইয়ে রাখা যায় কায়দা ওঁদের আয়ত্তে। হাইকোর্টের পর সুপ্রিম কোর্ট আছে। তার পরেও আপিল করার পথ খে

সুপ্রিমকোর্ট দেশের সবচেয়ে বড় আদালত। ভারতবাসী মাত্রেই জানে, এই কোর্ট সঠিক বি করে। কিন্তু মানুষ অবাক হয়ে দেখল একজন বিচারপতি তাঁর প্রভাব খাটিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কে

সল্টলেকে জমি পেয়েছিলেন বলে সুপ্রিমকোর্ট তাঁর বাড়ি জমি নিলাম করতে বলেছেন। ভালো কথা। কিন্তু যে ঘুষ দেয় সে যেমন দোষী, যে ঘুষ নেয় সেও সমান দোষী। যাঁর ওপর ভদ্রলোক প্রভাব খাটালেন এবং যিনি ওঁকে জমি দিলেন তাঁর সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। এরকম দৃষ্টান্ত মানুষকে ব্যথিত করে। এতে শ্রদ্ধা কমে যেতে বাধ্য।

আজ যে আদালতকে উপেক্ষা করার প্রবণতা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার জন্যে দায়ী কিন্তু আদালতই। দীর্ঘকাল মামলা ফেলে না রেখে দ্রুত নিষ্পত্তি করা উচিত। এতকাল যে শ্রদ্ধার জায়গায় মানুষ তাঁদের বসিয়ে এসেছে সেই জায়গাটিকে কলুষিত হতে দেওয়া উচিত নয়। তার জন্যে প্রয়োজনে কঠোর হওয়া দরকার। নইলে মানুষের মনে ধারণা তৈরি হবে, এক্ষেত্রেও বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা তৈরি হয়ে গিয়েছে।

জানুয়ারি ২০০৫

পুলিশ ও ভাই পু

স্বাধীনতার আগে পুলিশের চাকরি যাঁরা করতেন তাঁরা মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য হ ইংরেজরা তাঁদের মাধ্যমে দেশ চালাত। অতএব একজন পুলিশ চাবুক, লাঠি এবং রিভলভার ব্যবহারের অধিকারী ছিলেন। থানার বড়বাবু মানে একজন অর্ধশিক্ষিত বুলডগ, যিনি ইংরে পদলেহন করেন এবং সাধারণ মানুষকে চাকর-বাকরের অধম বলে মনে করেন—এই রকমে ছিল।

স্বাধীনতার পর এই পুলিশবীররা বিপাকে পড়লেন। যাঁদের ওপর তাঁরা এতকাল ছড়ি ঘুরি তাঁরাই এখন প্রভু হয়ে এসেছেন। কিন্তু গিরগিটির চেয়ে দ্রুত তাঁরা রঙ বদলে ফেললেন। সা থেকে কয়েকটা বছর খুব কষ্টে কাটালেন ওঁরা। কাউকে বিনা কারণে ধরলে খবরের কাগজ করেছে। চোর-ছ্যাঁচড়দের পেঁদিয়ে কোনো সুখ নেই। ওদের অবস্থা এত খরাপ যে আমদানি ভালো হয় না। তাই এলাকার কালোবাজারিদের সঙ্গে সঙ্গত করে কংগ্রেসি নেতাদের সামনে হেঁ হেঁ করে চলে যাচ্ছিল দিনগুলো। মুশকিল হত একটি ব্যাপারে; বিয়ের সময় ভালো পাত্রী বেশ মুশকিল হত। ভদ্র, শিক্ষিত পরিবারের মেয়েকে পুলিশ-পাত্রের হাতে তুলে দিতে অভিভাবকরা কিছুতেই চাইতেন না। অত্যন্ত গরিব পরিবারের মেয়েকে বরপণ না নিয়ে বিয়ে ধন্য করতেন তাঁরা।

পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত পুলিশ মানেই চর্বি-থলথলে অথবা খেঁকুড়ে একটি শরীর, চোখের কমলালেবুর কোয়া, নিষ্ঠুর, ঘুষখোর, লম্পটের মুখ মনে আসে। জনসাধারণের ভালোবাস দূরের কথা, তাদের প্রশ্রয় পুলিশ কর্মচারীরা নিজেদের ইতিহাসের জন্যেই তেমনভাবে প

মাঝে একবার কম্যুনিস্ট পার্টিকে যখন বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছিল তখন সদ্য স্বাধীন দেশ, টালমাটাল অবস্থা, তাই পুলিশকর্মীরা কম্যুনিস্টদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেনি ব্যাপ সেই সুযোগ এনে দিল খাদ্য আন্দোলন। তখন তাদের উপোসী অভ্যেস কিছুটা ব্রিটিশ স্বাদ মিটিয়ে নিতে পারল কম্যুনিস্টদের ওপর লাঠি চালিয়ে, বাড়ি থেকে চুলের মুঠো ধরে টেনে এনে হাতের সুখ করে। ব্যাপারটা কম-বিস্তর চলছিল। এর মধ্যে কংগ্রেস গেল, এল। এবং তার পরেই সুসময়ের শুরু।

নকশাল আন্দোলন। এই প্রথম পুলিশ দেখল প্রতিপক্ষের হাতে পাইপগান, বোমা, কখনও মাংস পেছনে ঝুলিয়ে গাড়ি চালিয়ে রেসের কুকুরগুলোকে ছোটানো হয়। এক্ষেত্রে প্রতিপক্ষে ব্লেড দেখে তলোয়ার নিয়ে ছুটে গেল পুলিশবাহিনী। বামফ্রন্ট সরকারের নীরবতা তাদের উ করল। আদর্শের আবেগে ঘর ছেড়ে বের হওয়া শয়ে শয়ে ছেলেমেয়েকে নতুন নতুন উপ করে পুলিশ ব্রিটিশ আমলের স্বাদ নতুন করে পেল। চল্লিশ সালে পুলিশে ঢোকা এক ব্যক্তি

নিয়েছিলেন তিয়াত্তরে। তাঁর মুখে শুনেছি,—ব্রিটিশ আমলে গুলি খরচ করে এসে কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিতে হত। নকশাল আমলের কিছুদিন সে বালাই ছিল না। ভ্যান থেকে নামিয়ে 'বাড়ি যাও' বলে পিছন থেকে ব্রিটিশ আমলের পুলিশ গুলি চালিয়ে কাউকে মেরে ফেলেনি!

জরুরি অবস্থা শেষ হয়ে গেলে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর দেখা গেল ব্রিটিশ আমলের পুলিশদের অসবর নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। বামফ্রন্ট যত তাদের পুলিশ বাহিনীর রাশ টেনে ধরেছেন তত এঁরা অগ্রণী হয়েছেন। একজনকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে এলেই নেতারা ফোন করে ধমক দেয় ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। না দিলে সুন্দরবনে বদলি করে দেওয়া হতে পারে। এখন চাকরি করে সুখ কোথায়? ট্রাম পোড়ানোর কারণে যাকে পেঁদিয়ে হাতে সুখ করেছিলেন তিনি থানায় এলে এখন উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট করতে হয়।

এই সময় থেকে পুলিশ বাহিনীতে নতুন রক্তের আগমন। পড়াশোনায় ভালো ছেলে-মেয়েরা, যাঁরা অধ্যাপনা করতে পারতেন, স্বচ্ছন্দে তাঁরাই আই পি এস পাশ করে পুলিশে এলেন। যে পুলিশ কখনোই বই পড়ত না, সেই পুলিশ-কর্তারা অবসর সময়ে জীবনানন্দ দাশ পড়ছেন, এই দৃশ্য আমি দেখেছি। নিচের দিকে গ্রাজুয়েট ছেলেরা সাব-ইন্সপেক্টর হয়ে ঢুকে ওসি, এসি হচ্ছেন। তাঁরাও আসছেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। ব্রিটিশ আমলের সেই বুলডগীয় মুখগুলো ক্রমশ মানুষের মুখে পরিণত হচ্ছিল।

এই সময় থেকে পুলিশের বড়কর্তাদের সামাজিক মানুষ বলে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করলাম আমরা। দেবেন বিশ্বাস, সন্ধি মুখার্জী, নজরুল ইসলামদের সঙ্গে কথা বলার সময় আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। কলকাতার কোনো রাস্তায় কোনো সময় নো এন্ট্রি চালু হয়ে যায় তা জানা না থাকায় গাড়ি ঢুকিয়ে সেপাইদের আক্রমণের মুখে পড়লে, সার্জেন্ট এলে বুঝিয়ে বললে তিনি শুধু সতর্ক করে ছেড়ে দেন।—এ দৃশ্য ষাট সালে ভাবা যেত না।

তার মানে পুলিশ একেবারে ভদ্রলোক হয়ে গেছে? না। এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। জেলায় বা গ্রামে যান। এলাকার কোনো প্রতিপত্তিশালী লোকের ছেলে কুকর্ম করলে সাধারণ মানুষ ডায়েরি করতে গেলে মফস্‌সল বা গ্রামের পুলিশ সেটা নিতে চাইবে না। পার্টির বড় নেতা হলে তো নয়ই। পুলিশ ক্রমশ শাসকদলের চরণে নিবেদিত প্রাণ হয়ে উঠেছে। কেউ মাথা সোজা করে কাজ করলে তাকে মফস্‌সলের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যা দেখে ক'জন আর সাহস পাবে মাথা সোজা রাখার? এই সেদিন কাগজে পড়লাম কলকাতার একটি এলাকায় পোস্টিং পাওয়ার জন্যে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে আগ্রহী অনেক উপোসী পুলিশ অফিসার। সেই পোস্টিং পেলে তিনি কি সেখানে গিয়ে শুধু জনসাধারণের উপকার করবেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন,—থানায় থানায় পুলিশের উচিত এলাকার মানুষের সঙ্গে ফুটবল খেলা! অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে বলেছেন তিনি। কে কার কথা শোনে!

শিক্ষিত মানুষরা পুলিশে আসার পরে বুলডগের চেহারাটা বেশ বদলেছে, কিন্তু পুলিশেরই কিছু মানুষ মানুষের সঙ্গে দূরত্ব রাখতে বদ্ধপরিকর।

সেদিন দু'জন ব্যক্তির সংলাপ কানে এল। একজন আয়কর অফিসার, আর একজন পুলিশের ওসি। দু'জনেই অবসর নিয়েছেন। পানশালায় বসে পান করছেন ওঁরা। প্রাক্তন আয়কর অফিসার বললেন,—আমার কোনো চিন্তা নেই। পেনশনের টাকায় মদ খাই, রেস খেলি। বিভিন্ন নামে বিভিন্ন ব্যাংকে পঞ্চাশ লাখ রেখেছি। তার সুদে রাজার মতো আছি।

প্রাক্তন পুলিশের অফিসার বললেন,—পঞ্চাশ লাখ? তাই আপনার চিন্তা নেই।

—মানে?—প্রাক্তন আয়কর কর্তা অবাক হলেন।

—আমার যে দু'কোটি টাকা। অন্য কারও নামে যে ব্যাংকে রাখব তা বিশ্বাস করতে না। দেশে বাড়ি জমি করেছি চাকরির সময়ে। এখন টাকাগুলো কোথায় রাখি তাই ভেবে ঘু

—কেন? স্ত্রী, ছেলে, মেয়েজামাই, বউমার নামে রাখুন।

—দূর! নিজের ছায়াকেই বিশ্বাস হয় না, তো ওরা!

পুলিশের প্রাক্তন কর্তা এক ঢোঁকে গেলাস শেষ করলেন।

ফেব্রুয়ারি ২০০৫

মেড ফর ঈচ আদার

বিশাল পালঙ্ক পাঠিয়েছিল শ্বশুরবাড়ি থেকে। ত্রিদিবের সদ্য ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে তুলে দিল কুলিরা। অনেকগুলো দামি কাঠের টুকরো। সঙ্গে লম্বা লম্বা মোটা স্ক্রু। ঠিকঠাক জোড়া দিয়ে স্ক্রু ঢুকিয়ে টাইট করতেই চমৎকার খাট, গদি-তোষক পেতে ফেললে চোখ বুঁজিয়ে ঘুম আসবেই।

খাটটাকে খাড়া করার চেষ্টা করছিল কুলিরা। শেষমেশ বলল,—বাবু, লাগতা নেহি।

—লাগতা নেহি মানে?—ত্রিদিব সমস্যার গন্ধ পেল।

—ইয়ে ইস্‌ক্রু ঘুষতা নেহি।

ত্রিদিব চেষ্টা করল। খাটের একটি অংশ দিয়ে স্ক্রু ঢুকিয়ে অন্য অংশকে বন্দি করা যাচ্ছে না। তাহলে খাটটা দাঁড়াবে কী করে? না দাঁড়ালে শোওয়া যাবে না। এমন খাট জয়তীর বাবা পাঠালেন কী করে?

ফোন করল সে। জয়তীর দাদা বললেন,—সেকি? খাট জোড়া লাগছে না?

—না।—গম্ভীর গলায় জানাল ত্রিদিব।

—তখনই বাবাকে বলেছিলাম,—কিনো না। এতবড় খাট আজকাল কেউ কেনে না। এখন কী হবে। দাঁড়াও, দোকানে ফোন করছি।

—তার মানে?

—যার সঙ্গে যার জোড়া লাগবে তাদের নিচের দিকে একই নাম্বার লেখা আছে। একের সঙ্গে এক, দুই-এর দুই, ঠিকঠাক মুখে মুখে লাগালে ইস্ক্রু ঢোকাতে কুলিরা উৎফুল্ল হল,—লাগ গিয়া বাবু! এবার ঝটপট খাটটা খাট হয়ে উঠতেই ফোন এল— এনি প্রব্লেম স্যার?

—না। ঠিক আছে।

—বসে দেখুন। দুলুন একটু। দেখুন, খাপে-খাপ কি না?

কানে খট্ করে লাগল। অশ্লীল মনে হল শব্দ দুটোকে। তার পরেই মনে হল, সদ্য বিয়ে করেছে বলে তার মনে কু-ভাব এসেছে। এ তো মেড ফর ইচ আদার। যেমন, যে খাপে যে তলোয়ার ঢোকে তা অন্য খাপে ঢুকবে না অথবা ঢল ঢল করবে। আঙুলের মাপেই তো আংটি। অতটা অশ্লীল আর মনে হচ্ছিল না ত্রিদিবের।

এ তো গেল আসবাবের কথা। আমরা ক'জন আর শত্রুভাবে ভজনা করতে চাই? সবাই চাই বন্ধুভাবে। আমার মনের সঙ্গে মিল আছে এমন একজনকেই সঙ্গী হিসেবে পেতে চাই। পরশুরামের

সেই বিখ্যাত গল্প মনে পড়ছে। বিয়ের আগে পছন্দ যাচাই করে নেওয়া। তা ধরুন, পাত্রী বল আমি লিকার চা খাই।

পাত্র বললেন,—সর্বনাশ। আমি দু'চামচ চিনি আর দুধ ছাড়া চা খাই না।

—উঃ।—পাত্রী চোখ বুঁজলেন,—ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে—মিষ্টি খান?

—খুব। রসগোল্লা। আপনি?

—ম্যাগো। এক গ্রাম ওজন বাড়লে আমি কেঁদে ফেলব। সিনেমা দেখেন?

—নাঃ। সময় পাই না, ইচ্ছেও হয় না।

—আমি রোজ একটা সিনেমা দেখি, টিভিতে।

এই ধরনের মতপার্থক্য দেখলে মনে হবে এরা পরস্পরের জন্যে উপযুক্ত নয়। একসঙ্গে রোজ ঝগড়া হবে। কিন্তু কে বলতে পারে ভবিষ্যতের কথা?

বিয়ের পর অশান্তি এড়িয়ে চলতে চান না কে? স্বামী না স্ত্রী?

আমাদের দেশের বেশিরভাগ স্ত্রীরাই এখনও গৃহবধূ। বাড়ির যাবতীয় ঝামেলা তিনিই স্বামী, অন্তত নয়-দশ ঘণ্টা বাড়ির বাইরে কাজের কারণে থাকতে হয় বলে সেগুলো নি ঘামান না। মাথা ঘামাতে হলে ঘরে-বাইরে জেরবার হয়ে যেতেন। ফলে তিনি চাইবেন এড়াতে। ওই নয়-দশ ঘণ্টায় কত কথা মনে জমে তা স্বামী ফিরলেই উগরে না-দেওয়া প নেই স্ত্রীর। সেসব কথায় অসংলগ্নতা দেখলে স্বামী প্রতিবাদ করলেই কুরুক্ষেত্র তৈরি হ বাড়িতে ওই ভদ্রলোক মুখ বুঁজে থাকেন অভিজ্ঞতা হওয়ার পরে। স্ত্রী স্বামীকে তাঁর নিজস্ব মনে করায় জরুরি অবস্থা জারি করেন কিন্তু পরিচিতদের কাছে স্বামীনিন্দা করতে ছাড়েন স্ত্রীকে ঐ অধিকার দেন, কারণ তাতে তাঁর জীবনে ঝামেলা থাকে না। বাইরে থেকে দে হবে ওঁরা একেবারে মেড ফর ঈচ আদার।

কিন্তু মেড ফর ঈচ আদার মানে কি হুবহু পরস্পরের সম্মিলন? রামের সঙ্গে লড় লোক রাবণ ছাড়া আর কে ছিল? হিটলারকে সামলাতে চার্চিল যা করেছেন তা আর ে পারত? বিধান রায়কে তটস্থ রাখতে জ্যোতি বসু ছাড়া কেউ কি পেরেছেন? প্রতিদ্বন্দ্বি না, যদি ঠিকঠাক প্রতিপক্ষ না থাকে। ব্রাজিলের সঙ্গে ভারতের ফুটবল ম্যাচ হলে সেটা আলুনি হবে। জম্পেশ ম্যাচ দেখতে চাইলে ব্রাজিল আর আর্জেন্টিনার খেলা দেখতে হে তো এক ধরনের মেড ফর ঈচ আদার।

বাবুরা চামচেদের প্রশ্রয় দেন। কেন দেন? চামচে থাকলে তাঁর প্রচার বাড়বে। যাঁর য তাঁর তত প্রচার। চামচেদের বাবুর দরকার হয়, কারণ বাবুকে না ভাঙিয়ে তারা কিছু করতে পারে না। সেই রোজগার মানে শুধু টাকা উপার্জন নয়, যোগাযোগের সুযোগ বাড়াে উপভোগ করা। কিন্তু মুশকিল হয় বাবু যদি ঠিকঠাক চামচে নির্বাচন না করেন। গায়ে প বলা, নিজেকে নিয়ে বড়াই করা চামচে বাবুর ইমেজ নষ্ট করে। বুদ্ধিমান বাবুরা একজন বেশিদিন পাশে রাখেন না। ধরা যাক একজন লোক চামচেগিরি করে বিখ্যাত হয়েছে। বা থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় এসেছে। সেই চামচেকে ধরলেই সহজেই বাবুর কাছে পৌঁছ এই তথ্য জেনে একজন এন আর আই তাঁর কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলেন। পরের বছর এসে খুব খাতির করার পর খবর পেলেন, বাবু ওই চামচেকে ত্যাগ করেছেন। শোনামাত্র তি

করলেন লোকটিকে। তাই সঠিক চামচে এবং বাবুর মিলনকে নিঃসন্দেহে মেড ফর ঈচ আদার বলা যায়।

এই যে শেখর পত্রপাঠ বের করছে, ধরা যাক, আমি বৈষ্ণব পদাবলী নিয়ে নিবন্ধ লিখে জমা দিলাম, শেখর কি ছাপবে? পত্রপাঠের চরিত্রের সঙ্গে একটুও মিল নেই—এমন লেখা কী করে ছাপা হতে পারে? এখানে লিখতে হবে পাঠককে হাসাতে এবং ফাঁসাতে। লেখায় হুল থাকতে পারে, পড়ে অনেকেই জ্বলতে পারে। আমরা বলব—যেমন কাগজ ঠিক তেমনি লেখা। মেড ফর ঈচ আদার। যেমন প্রদীপবাবুর কার্টুন এবং পত্রপাঠ। মেড ফর ঈচ আদার।

তবে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধহয় বুনো ওলের আর বাঘা তেঁতুলের। চমৎকার কম্বিনেশন।

মার্চ ২০০৫

ঘুষের

শরীর ব্যবহার করতে দিয়ে নিরাপত্তা কেনার কৌশল নাকি পৃথিবীর শুরু থেকেই। বোধহয় আদিম ঘুষ। জঙ্গলে বা পাহাড়ে মানুষ যখন প্রায় বনমানুষ, যখন ভাষা তৈরি হয়নি কিন্তু প্রবল তখন যে শক্তিশালী, তার ছায়ায় থাকলে যে কিছুটা নিরাপদে থাকা যাবে তা মানুষ বুবে আমরা জানি না তখনকার নারীর হৃদয়ে প্রেম এসেছিল কি না। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, সে স মা হয়েছে। পুরুষের সঙ্গে মিলনের সময় (অনিচ্ছায় হলেও) শরীর রোমাঞ্চিত হয়েছে, শ সেই ভাষা একবার শিখে ফেলার পর সে জেনেছে, শক্তিমান পুরুষকে ঘুষ দিয়ে দখল করার তার আছে, যা কোনো পুরুষের নেই।

বলা হয়েছে, বেশ্যাবৃত্তি পৃথিবীর আদিমতম পেশা। বাঁচার জন্যে একাধিক পুরুষের সঙ্গে শ সম্পর্ক তৈরি করা যদি বেশ্যাবৃত্তি হয় তাহলে পরিবার গঠনের আগে সব নারীই একই করেছিলেন। নিজের কাজ গোছানোর জন্যে শরীর দেওয়াকে আমি (সে সময়ের পটভূমিতে) বেশ না বলে ঘুষ দেওয়া বলাই সংগত মনে করি।

চালু কথাটা হল, যে পুজোয় যে মন্ত্র। কোন্ দেবতাকে কী দিয়ে সন্তুষ্ট করা যায় তা না জ কাজ হয় না। মিস্টার মুন্সী ক্ষমতাবান অফিসার। তাঁকে দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে হলে নগদ পৌঁছে দিতে হবে। সোজা কথা। মিস্টার রায়কে টাকা দিতে গেলে তিনি ক্ষেপে উঠবেন। ফোর স্টার হোটেলের ঘর দুপুরে বুক করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে বিশ্রাম নেওয়ার ত আর তাঁকে সে কাজে সাহায্য করতে হাজার পাঁচেক দিয়ে এক লাস্যময়ীকে ভাড়া করে সেই রেখে দিতে হবে। মিস্টার রায় লিফ্‌টে ওপরে উঠে ঘরে ঢুকবেন। ঘণ্টা দুয়েক পরে গম্ভীর বেরিয়ে যাবেন। পরের দিন তাঁর সই করা মনোমতো অর্ডার পেতে অসুবিধে হবে না। ত মিস্টার দত্তগুপ্তকে নিয়ে যেতে হবে পুতাপুত্তি। সাঁইবাবার দর্শন যাতে সামনে থেকে পান তার ব করে দিতে হবে। ব্যস, অর্ডারে সই হবেই। টাকা বা নারীর প্রস্তাব তাঁর কাছে দিলে হিতে বি হবে।

এখন কথাটা হল, এই যে যাঁরা ঘুষ নেন তাঁরা কারা? অবশ্যই যাঁরা মাথা কাটতে পারেন ইচ্ছে হলে রাখতেও, তাঁরাই। ঘুষের টাকা কোথায় রাখেন তাঁরা? পঁচিশ বছর ঘুষ নিয়ে গিয়ে এমন এক ব্যক্তিকে গল্পটা করেছিলাম। তিনি বললেন, 'প্রথম প্রথম যা পেতাম খরচ করত বউকে গয়না, শাড়ি, বছরে দু'বার বেড়াতে গেছি, রাজার মতো। তারপরেও যখন টাকা আ লাগল স্রোতের মতো তখন নানান নামে রিজার্ভ ব্যাংকের বন্ড কিনতে লাগলাম; দু-তিনটে ফ্ল্যা বেনামে। কিন্তু বুকের ভেতর ধুক্‌পুকুনি শুরু হয়ে গেল। প্রেসার বাড়ন্ত। রেইড হতে পারে এই ভয়ে একটা মাইল্ড অ্যাটাকও হয়ে গেল। আমারই এক কলিগের বাড়িতে জুতোর বাক্সের আশি লক্ষ টাকা খুঁজে বের করল আয়কর দপ্তর। লোকটার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল!

ঘুষ দেন কারা? যাঁরা জেনেশুনে অন্যায় করছেন, করে ভেবেছেন পার পেয়ে যাবেন কিন্তু পাচ্ছেন না, তখন সেই অন্যায় করে যতটা লাভ করেছেন তার কিছুটা অংশ ঘুষ হিসেবে দিয়ে পার পেতে চান। এই অবস্থায় শুনেছি, যাঁরা ঘুষ নেন তাঁদের বিবেক নাকি পরিষ্কার থাকে। তাঁরা বলেন, আমরা তো কাউকে বিপাকে ফেলে চাপ দিয়ে টাকা নিই না। যে অন্যায় করে রোজগার করছে এবং সরকারকে বঞ্চিত করছে তাদের কিছু ছাড় দেওয়ার বদলে টাকা নিই।

কিন্তু যে ছেলেমেয়ে দুটো ভিক্টোরিয়ার সামনে সন্ধেবেলায় প্রেম করছিল তাদের অন্যায়টা কোথায়? তবু থানায় নিয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়ে টাকা নেওয়ার অভ্যেস এ দেশের পুলিশের আছে। এই একটা সরকারি দপ্তর যেখানে সাদা টাকা কালো হয়ে ঢোকে, কালো টাকা আরও কালো হয়। যে কনস্টেবল্‌টি টেম্পো বা লরির ড্রাইভারের কাছ থেকে হাত পেতে একটা টাকা প্রকাশ্যে নেয় তাকে প্রশ্ন করলে সে বলেছিল,—স্যার, ওই ড্রাইভার খুব গরিব। ওর বিরুদ্ধে কেস দিলে ওর কামাই নষ্ট হবে। তাই এই অল্প শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি।

—কিন্তু শাস্তির টাকাটা তো আপনার পকেটে যাচ্ছে।

—না স্যার। এই একটা টাকার অনেক ভাগ হবে।

আমেরিকার হাইওয়েতে বন্ধুর গাড়িতে বসে জিজ্ঞেস করেছিলাম,—আপনাদের এখানকার পুলিশ কীরকম ঘুষ নেয়?

—ওপর মহলে মাঝে মাঝে কেলেঙ্কারির কথা শোনা যায়। যারা ধরা পড়ে তারা জেলে যায়। নিচের তলার পুলিশ ঘুষ নিচ্ছে—এমনটা চোখে পড়েনি।

—সেকি! পুলিশ, অথচ ঘুষ নিচ্ছ না?—আমি অবাক।

—নির্দিষ্ট স্পীডের চেয়ে বেশি জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলাম। মামা এসে ধরল। বলল,— লাইসেন্স দাও। বুঝলাম অন্তত একশো ডলার পৌঁছে দিতে হবে সরকারি কোষাগারে। অনুরোধ করলাম, এবার মার্জনা করুন। লোকটা বলল, আর একবার ওই কথা বললে জরিমানা দ্বিগুণ করে দেব। বুঝুন। আমার এক পরিচিত সবসময় লাইসেন্সের মধ্যে কুড়ি ডলারের নোট রাখতেন। ভুল জায়গায় পার্কিং-এর দোষে পুলিশ ওঁর লাইসেন্স চাইলে তিনি বের করে দিলেন। অফিসার এটা খুলতেই কুড়ি ডলারের নোট দেখতে পেয়ে বলল,—তোমার উচিত পার্স ব্যবহার করা। এটা ডলার রাখবার জায়গা নয়। নোটটা ফেরত দিয়ে ফাইন করল লোকটা।

এসব গল্প বলে মনে হয় আমাদের কাছে। হয়তো আমার বন্ধু শুধু সৎ অফিসারদের দেখে এসেছেন।

কিন্তু শুধু অর্থ, নারী বা ব্যক্তিগত সুখের জন্যে লোকে ঘুষ নেয়? না। অনেক যশপ্রার্থী কবি বা গল্পকারদের দেখা যায়, বাজার থেকে দামি মাছ বা অনেকটা মিষ্টি নিয়ে হাজির হচ্ছেন সম্পাদকের বাড়িতে। যাতে তাঁর লেখা বিখ্যাত কাগজটিতে ছাপা হয়। নৈহাটি স্টেশনে একটি তরুণ লেখককে দেখলাম, হাতে নকুড়ের সন্দেশের বিশাল বাক্স, সঙ্গে তাঁর সদ্য প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। রিকশাওয়ালাকে বলছেন, যে বাড়িতে যাবেন সেই বাড়িতে বাংলা সাহিত্যের তাবড় সমালোচকের বাস। তিনি যদি দৈনিক পত্রিকায় ওই বইটি সম্পর্কে কয়েক লাইন প্রশংসাবাক্য লিখে দেন তাহলে তরুণ লেখক জাতে উঠে যাবেন। কলকাতায় বিদেশি মদ অঢেল পাওয়া যায়। তার একটা দু'হাজার টাকায় কিনে লজ্জা লজ্জা মুখ করে কবি-সম্পাদকের বাড়িতে গিয়ে নিবেদন করার সময় তরুণ কবি বলেন,—আমার মামা জার্মানি থেকে এসেছেন। উনি দিলেন আপনার জন্যে।

এরপর কবিতা ছাপা হবেই, এমন ধারণা কবি করতেই পারেন। তরুণী কবি, সম্পাদক-কবির ছায়ায় মিশে থাকছেন; লোকে কুকথা বলছে। বলুক। ঘন ঘন কবিতা তো ছাপা হচ্ছে! শুধু লেখার জগতে কেন, সিনেমা, ছবি আঁকার জগতে ঘুষের রমরমা। একজন চিত্রপরিচালক সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন,—আপনাকে আমি আমার ছবিতে সুযোগ দিতে পারি, কিন্তু কেন দেব?

—আমি একটা ব্রেক চাই।

—আপনি তা চাইতেই পারেন। সবাই চায়। আমার কী লাভ!

—আপনি আমাকে সুযোগ দিলে আমি কিছুতেই 'না' বলব না।

দেওয়া নেওয়া হয়ে গেল। এটা এখন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকেই এখন অভিযোগ ব জানেন, লোকটা কাজ দেবে বলে আমি রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু সব হয়ে টয়ে যাওয়ার পর বল এই প্রযোজক রাজি হচ্ছে না, পরের বার দেখব। তাই আমি ঠিক করেছি আগে নেব, ত দেব।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ যাওয়া ঠিক হয়েছে বলে ওয়েটিং লিস্টের টিকিট ঢুকেছি। টিটিকে অনুরোধ করলাম একটা আসনের জন্যে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, টিকিট এসেছেন নাকি?

—হ্যাঁ। ওয়েটিং লিস্টে আছি।

—তাই থাকুন।

কম্প্যুটার বলছে সব আসন ভর্তি, অথচ কী করে কিছু বার্থ খালি থাকে কে জানে। এ পরামর্শ দিলেন,—তাড়াতাড়ি আপনার টিকিট ফেরত দিয়ে রিফান্ড নিয়ে আসুন। সেই রিফ টাকাটা ওঁকে দিলে জামাই আদরে নিয়ে যাবেন উনি। যাদের টিকিট আছে তাদের কাছে তে টাকা পাবেন না উনি!

—এরকম হয়?

—হয় মানে? আমি সেল্‌স্ রিপ্রেজেন্টেটিভ। হঠাৎ হঠাৎ যাতায়াত করতে হয়। আমার প্রচুর লোক রোজ যাতায়াত করে এদের ভরসায়। টিকিট ছাড়াই।

এই যে আমি, আমি কি ঘুষ দিই না? বয়েস বাড়ার পর একটু একটু করে আমি স্বার্থপর চলেছি। এখন সবসময় শুধু নিজের শক্তির কথা ভাবি। আর সেটা পাওয়ার জন্যে ক্রমাগত ছেলেমেয়ের সব অযৌক্তিক বক্তব্যে সায় দিয়ে চলেছি, যাতে ওরা আমাকে একটু শান্তিতে থ দেয়। এটাও তো ঘুষ দেওয়া। কিছু মানুষ ঈশ্বরকে ঘুষ দেন, গুরুদেবকে দেন—যাতে তাঁরা ব বাসনা পূর্ণ করেন। আমি নিজের সন্তানদের দিই। মেয়ে সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে দেখে খুব রাগ হয় তখন চেপে যাই। মুখে বলি, আহা একটু ঘুমোক না! মেয়ের কানে কথাটা খুশি হয়। আমাকে শান্তিতে থাকতে দেয়।

তবু, মনে পড়ে সেই দৃশ্যটা। আয়কর ভবনের একতলার হলঘরে এক বৃদ্ধ রাগে কাঁপছি পরনে ধবধবে ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, হাতে ছড়ি।

জিজ্ঞেস করলাম,—কী হয়েছে?

কটমটে চোখে তাকালেন তিনি,—কী ভেবেছে ওরা? বাড়ির বউ যদি নষ্টামি করে তাহলে বিচার করবে বেশ্যারা?

এপ্রিল ২০০৫

চাকর-চরিত

বাজারে গিয়েছিলাম, রবিবাবুর সঙ্গে দেখা। কলেজে পড়ান, ভদ্র মানুষ। জিজ্ঞাসা করলেন,—ভালো কাজের লোক সন্ধানে আছে?

—কাজের লোক মানে?

—এই, বাড়ির কাজকর্ম করবে, ফাইফরমাশ খাটবে।

বুঝলাম রবিবাবু 'চাকর' শব্দটি ব্যবহার করতে চাইছেন না।

বললাম,—খুব সমস্যার কথা। ভালো কাজের লোক আজকের দিনে প্রায় সোনার পাথরবাটির মতো। তবু বলুন, এফিসিয়েন্ট চান না ইনএফিসিয়েন্ট?

অবাক হলেন রবিবাবু—কীরকম?

—এফিসিয়েন্ট কাজের লোক আপনাকে সবসময় আনন্দে রাখবে। কোনো ত্রুটি পাবেন না তার কাজে। বয়, আপনার আশার বাইরে অনেক কাজ করবে। আর ইনএফিসিয়েন্ট যে তাকে নিয়ে সমস্যায় পড়বেন। সবসময় টিকটিক করতে হবে, এভাবে নয়, ওইভাবে করো, এটা কী করেছ—এইসব।

—না মশাই, যেচে ইনএফিসিয়েন্টকে নেব কেন?

রবিবাবু বললেন,—তা আপনার সন্ধানে এফিসিয়েন্ট কাজের লোক আছে?

—আছে। আমার গিন্নি গত পরশু তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে একজন ইনএফিসিয়েন্ট কাজের লোককে রেখেছেন। চাইলে তাকে খবর দিতে পারি।—বললাম।

—সেকি! উনি অত ভালো লোককে ছাড়িয়ে দিলেন কেন?

—চুরি করত। এমনভাবে চুরি করত যে আমরা দু'বছরেও ধরতে পারিনি। আমার চুরি করে দেশে ধানের জমি কিনে ফেলেছে। যে কাজ জানে সে কাজের ফাঁকফোকর সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। পঁয়তাল্লিশ বাঁচিয়ে দিয়ে দশটাকা চুরি করছে। পরশু ওইরকম চুরি অ্যাকসিডেন্টলি ধরা পড়ে যেতে গিন্নি মাথাগরম করে ছাড়িয়ে দিলেন। আনলেন যাকে সে চুরি করতে জানেই না, কারণ কাজটাই তার অজানা।

—আপনাদের পঁয়তাল্লিশ টাকা কী করে বাঁচাত?

—ধরুন মাছ কিনতে পাঠালাম। পঞ্চাশ টাকার মাছ কিনে এনে বলল,—ষাট টাকা লেগেছে। কিন্তু মাছ এ-ওয়ান। আর ইনএফিসিয়েন্ট বেচারা পঞ্চাশ বেশি মনে করে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে যে মাছ আনবে তা রান্না করার সময় পচা বলে ফেলে দিতে হবে। তাহলে লোকটা আমার পঁয়তাল্লিশ টাকা নষ্ট করল। পঁয়তাল্লিশ বেশি না দশ বেশি তা গিন্নি ভেবে দেখলেন না।—আক্ষেপ করলাম।

—তাহলে আপনি বলছেন এফিসিয়েন্ট চোর চাকর রাখাই উচিত?

—এটা আপনার ফিলজফির ওপরে নির্ভর করছে রবিবাবু।

যেদিন মানুষ ক্ষমতা অর্জন করেছিল সেদিনই সে একটু আরাম চেয়েছিল। তার প্রয়োজ কাজগুলো কেউ করে দেবে এবং সে নিশ্চিন্তে থাকবে। এই ক্ষমতা সে শক্তি, বুদ্ধি এবং দিয়ে উপার্জন করেছিল। বোঝাই যাচ্ছে, তার কাছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে অথবা ভয়ে যে করতে গিয়েছে তার ক্ষমতা উপার্জন করার যোগ্যতা ছিল না। ফলে একদল মানুষ হলেন মা আর বহু মানুষ হয়ে গেলেন চাকর। চাকর কে? যে চাকরি করে তাকেই তো চাকর বলে। লক্ষ টাকা মাসিক মাইনে পাওয়া মানুষও মূলত চাকর, আবার একশো টাকা মাইনের মানুষে চাকরই বলা হয়। বড় চাকর, ছোট চাকর। বড় চাকররা আবার নিজের প্রয়োজনে চাকর রা পারে, কিন্তু ছোট চাকরের ক্ষমতায় সেটা সম্ভব হয় না।

'চাকর' শব্দটির বয়স বেশি নয়। তার আগে প্রচলিত 'দাস' শব্দটি, মহিলা হলে 'দাসী'। ম মাইনের দাসদের কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা ছিল, কিন্তু সারা জীবনের জন্যে বিক্রিত হয়ে যাওয়া দাসের ক সেটা স্বপ্নের মতো অবাস্তব ছিল। এই ক্রীতদাসদের গায়ের রঙ ছিল কালো অথবা ময়লা। স চামড়ার মানুষেরাই তাদের প্রভু।

ক্রীতদাস প্রথা উঠে যাওয়ার পরেও মালিকরা তাদের অভ্যেস পালটাতে পারেনি। সওদাগ অফিসের কেরানিবাবু, যিনি নিজে একটি মুখচোরা চাকর, বাড়িতে যখন চাকর রাখেন তখন দে নেন লোকটা কতটা খাটতে পারে এবং কত কম খায়। ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত খাটিয়ে কেরানিবাবুর গিন্নির তৃপ্তি হয় না। এককালে এইসব চাকররা প্রায় বাড়ির লোক হয়ে যেত। মানুষটা পঞ্চাশ বছর ধরে বাড়িতে কাজ করছে তাকে কাকা, দাদা বলে ডাকতে অভ্যস্ত ছিল পরব প্রজন্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা ব্যবধান থেকেই যেত। বাইরের লোকের কাছে 'অমুক কাকা কে?'- এই প্রশ্নের জবাবে মুখ থেকে বেরিয়ে আসত—আমাদের বাড়িতে কাজ করে। বাবার আমলে লোক।

সেই সময় এই চাকর ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে তার নিজস্ব পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত, (পরিবারের সে সেবা করছে তাঁদেরই একজন বলে নিজেকে ভাবতে চাইত। আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে এসে গোলামি করতে করতে তার বার্ধক্য এসে যেত একসময়। ইচ্ছে থাকলেও বিয়ের কথা ভাবত না। কারণ তার সামর্থ্য হত না বউকে খাওয়াবার, দ্বিতীয়ত যে বাড়ির কাজ সে করছে তার বউকে জায়গা দেবে কেন? আমাদের বাল্যকালে অনেক বাড়িতে এমন অবিবাহিত প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ চাকরকে দেখেছি।

বাড়ির চাকরদের রমরমা শুরু হল যখন একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে ছোট ছোট পরিবার তৈরি হল। সকালে খবরের কাগজ পড়েই নাকেমুখে গুঁজে কর্তা অফিসে ছুটছেন। ফিরতে সন্ধে পার। গিন্নিও যদি অফিস-গামিনী হন তাহলে সংসারের কাজ করবে কে? অতএব লোক রাখা দরকার সেই লোককে বিশ্বাসী হতে হবে। অল্পবয়সি মালিকান হলে পুরুষের বদলে মহিলা কাজের লোক পছন্দ করবেন। এই প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় বাঙালি পরিবারে এখন চাকরের সংখ্যা খুব কমে গিয়েছে চাকরানিরাই পরিবার চালাচ্ছে। একসময় এদের নাম ছিল কালোর মা, লক্ষ্মীর মা, তমুকের মা এখন সুমিত্রা, কাজল, বিন্দু।

কলকাতার অর্থবান বাঙালি পরিবারে যেসব মহিলা চাকরি করে তারা মূলত আসে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে। স্বামী নেয় না বলে পেটের দায়ে কাজে এসেছি, এইটে বারে বারেই শোনা যায়। হাওড়ার বাগনান অঞ্চলও এই ব্যাপারে এগিয়ে আছে। ভোরের ট্রেনে এসে সন্ধের ট্রেনে ফিরে গেলে যদি আটশো টাকা মাইনে হয় তাহলে রাতদিন থাকলে অবশ্যই পনেরোশো। আবার বিভিন্ন এলাকা অনুযায়ী মাইনের হেরফের হয়। শ্যামবাজারে যে মেয়ে পাঁচশো টাকা পায় সেই একই কাজ অথবা কিঞ্চিৎ কম করলে থিয়েটার রোড পাড়ায় পনেরোশো। সাদার্ন অ্যাভিন্যুতে আরও বেশি। সল্টলেকে দুইহাজার তো অবশ্যই। ছেলেমেয়ে বিদেশে, বৃদ্ধ অসুস্থ বাবা-মাকে দেখাশোনা, খাওয়ানোর

জন্যে যে মেয়েটি ক্যানিং থেকে এসে সল্টলেকে কাজে লেগেছে সে তো ক'দিনেই সংসারের প্রায় কর্ত্রী হয়ে ওঠে। বিকল্প লোক পাওয়া যাবে না—এই ভয়ে তার মুখ সহ্য করেন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। চাকরদের পক্ষে যা সম্ভব হয়নি তা মহিলা কাজের লোক দিব্যি সম্ভব করেছে। চাইলে দু-একজন প্রেমিকও তারা জোগাড় করে নেয়। কিন্তু বছরখানেক ভালো খেয়ে, ভালো পোশাক পরার পর চাকর বা ড্রাইভার প্রেমিকের প্রতি আগ্রহ কমে যায়। আশেপাশের বাড়িতে যদি অবিবাহিত প্রৌঢ় থাকে তাহলে সে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে চায়।

আমাদের কলেজে পড়ার সময়ে অবঙালি কিছু পরিবারের সুদর্শন চাকরের খুব চাহিদা ছিল। বাবু সকালে বেরিয়ে যান গদিতে। ফেরেন রাতের বেলায়। বিরাট চর্বিওয়ালা শরীর তখন ক্লান্তিতে ঘুম চাইছে। গিন্নির শরীরেও চর্বির আধিক্য। তিনি খেলার সামগ্রী হিসেবে সুদর্শন চাকরকে ব্যবহার করেন। তখন ওই সম্প্রদায়ের মেয়েরা বাইরে বের হতেন না। নিরামিষ খেতেন, সঙ্গে যতটা সম্ভব ঘি-মাখন। তারপর তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম যখন বাইরে বের হতে লাগল, শরীর থেকে মেদ ঝরাল। জিন্‌স্ পরে কাফে বার-এ বসে চিকেন স্যান্ডউইচ খেতে লাগল ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে, তখন সুদর্শন চাকরদের বিতাড়িত হতে হল। অবশ্য ততদিনে তারা দেশে বাড়ি-জমি তৈরি করে নিয়েছে।

এ তো গেল শ্রমের বিনিময়ে মাইনে পাওয়া চাকরদের কাহিনী। কিন্তু আর এক শ্রেণীর মানুষকে লোকে ব্যঙ্গ করে চাকর বলে থাকে। হিন্দিতে একটা কথা চালু আছে, জরু কা গোলাম। অর্থাৎ বউ-এর চাকর। বউ উঠতে বললে, ওঠে, বসতে না বললে বসে না। একজন সহকর্মীকে বলতে শুনেছিলাম—আমার বউ-এর পাল্লায় পড়লে বুঝতেন! আমাকে একদম ক্রীতদাস করে ছেড়েছে। কোথাও একদিনের জন্যে বেড়াতে যাওয়া হবে। ভদ্রলোক স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে হ্যাঁ বলতে পারতেন না। আবার এরকম সংলাপ তো প্রায়ই শোনা যায়—আমাকে বিনি মাইনের ঝি পেয়েছ বলে যা-ইচ্ছে করব?—অবাধ্য স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের আক্ষেপেও একই প্রতিফলন।

সিনেমায় দেখেছিলাম, নায়ক হাত জোড় করে নায়িকাকে বলছে—তুমি আমাকে ভুল বুঝে সরে যেও না। আমি সারাজীবন তোমার চাকর হয়ে থাকব।—শুনে নায়িকা গর্বিত ভঙ্গিতে নাক ফুলিয়েছিলেন। মুঝে চাকর সমঝো!—চাকর হতে চাওয়ার কী দুরন্ত বাসনা নায়কের!

এ ছাড়াও চাকর আছে। তাদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। মালিকের কাছে সহকর্মীর নামে চুকলি কেটে আস্থাভাজন হওয়ার চেষ্টাকে 'শালা মালিকের চাকর' বলে গালাগাল দেয় সহকর্মীরা।

ক্ষমতাবান দাদা আর এক ক্ষমতাবানের সঙ্গে ঘরের দরজা ভেজিয়ে স্কচ পান করছেন, ভাইরা দরজার বাইরে হুকুমের প্রত্যাশায়। ঠিক যেমন ভাবে আগের জমিদারের ঘরের বাইরে চাকররা তটস্থ হয়ে থাকত হুঙ্কার শুনবে বলে। কিন্তু কেন ভাইদের এই চাকর মনোভাব?

না, টাকাপয়সার ধান্দায় নয়, একটু নামি হতে পারবেন দাদাদের করুণা পেলে। তার জন্যে কিছুকাল চাকর হলে দোষ কী!

মে ২০০৫

রূপকথা বিরু

সেদিন সকালে ডোরবেল বাজল। যাঁরা জানেন ওই সময়টা আমি লেখার টেবিলে থাকি তাঁর বেল বাজাবেন না। আগাম কথা না বলে হুট্ করে যাঁরা চলে আসেন তাঁদের জানিয়ে দেওয় ফোন করে যেন আসেন।—এ পাড়ায় এসেছিলাম তাই ভাবলাম দেখা করে যাই—এরকম দ সংখ্যা প্রচুর এবং তাদের দর্শন দিতে যে সময় চলে যায় তারপর আর লেখা মাথায় থ

সেদিন বেল বাজাতে বাড়ির কাজের লোক কিছু বলার আগেই শুনল,—দাদাকে বলে পার্টি থেকে এসেছি।

পশ্চিমবাংলায় থেকে পার্টির গুরুত্ব বোঝে না এমন নির্বোধ নয় বলেই কাজের লোক ভি লেখার ঘরে বার্তা পৌঁছে দিল।

পার্টির লোক আমার কাছে এসেছে শুনে আমি হুড়মুড়িয়ে নিচে ছুটলাম। এ পাড়ায় যাঁ করেন তাঁরা আমার পরিচিত। দাদা বলেন আমাকে। তাঁরাও জানেন এই সময় আমি লেখ করি। হয়তো পার্টির উঁচুতলার কেউ এসেছেন। দরজায় কয়েকটি হাসিমুখকে দেখলাম। প দেখেছি কিন্তু আলাপ নেই।

—বলুন ভাই।

—দাদা কী লিখছিলেন?

—হ্যাঁ, ওই একটু।

—স্যরি। বেশি সময় নেব না। নিন।

একটা রসিদ এগিয়ে ধরলেন প্রথমজন, তাতে একের পেছনে তিনটে শূন্য দেখলাম। করলাম,—কী ব্যাপার ভাই?

—নির্বাচন আসছে, সেই কারণে এই সাহায্য সহযোগিতা চাই।

—সেকি! আপনারা প্রায় আঠাশ বছর রাজত্ব করছেন, এখনও নির্বাচনের জন্যে সাহায্য হচ্ছে!—আমি অবাক।

—এতকাল আমরা চাইনি। কিন্তু জনগণকে আমাদের সঙ্গে পেতে হলে তাদের ইনভল্ভ হবে। সে কারণেই!

—কিন্তু তাই বলে এক হাজার টাকা?

—দাদা আপনি আপনার স্ট্যাটাসটা ভুলে যাচ্ছেন!

—তার মানে?

—দেখুন আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে এ পাড়ায় কয়েকজন ছাড়া কেউ আপনাকে চিনত না। এখন বাঙালির পঞ্চাশ ভাগ চেনে। তখন আপনার গাড়ি ছিল না, এখন আছে। তখন সভাপতি, প্রধান অতিথি হিসেবে কেউ আপনাকে ডাকত না। এখন পেলে ধন্য হয়। একজন কেরানি বা সাধারণ অফিসার, একজন ব্যবসাদার আপনার স্ট্যাটাসের ধারে কাছে আসতে পারবে না। ওরা যা দিয়ে ইনভলভ্ হবে তা দেওয়া কি আপনাকে মানাবে? ঠিক আছে, আপনি মৃদু আপত্তি করেছেন, ওটা পাঁচশো করে দিচ্ছি। এই বাদল, সামনের রবিবার সকালে এসে টাকাটা নিয়ে যাবি। দাদাকে ডাকতে হবে না। কাজের লোকের কাছেই টাকাটা থাকবে। বুঝলি? আচ্ছা দাদা, চলি।

দলবল বিদায় হল।

বাল্যকালে সবকিছু সুন্দর লাগে। নিজেকে রাজপুত্র ভেবে সরকার কাকার মেয়ে শিউলিকে রাজকন্যা ভাবতে একটুও অসুবিধা হত না, তা শিউলির মুখ যত এবড়োখেবড়ো হোক! রাজপুত্র মানে সাফল্য, রাজপুত্র মানে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় উদ্দাম উড়ে যাওয়া, রাজপুত্র মানে শক্তির চূড়ায় উঠে বসা। সবকিছু কাম্য, সুন্দর। রাজপুত্রের জগতে কোনো অসুন্দর থাকতে পারে না। সে শুধু খারাপ রাক্ষসদের মেরে ফেলে।

কলকাতায় পড়তে এসেও রাজপুত্র হওয়ার ভূত মাথা থেকে নামল না। ততদিনে বুঝে নিয়েছি রাজার ছেলে বলেই রাজপুত্র, এমন ধারণা ভুল। রাজপুত্র হতে গেলে নিজের ক্ষমতা, অধ্যবসায়ে একটি রূপকথার জগতে প্রবেশ করতে হয়। সেই রূপকথার জগৎ যে যার মতো তৈরি করতে পারেন। যেমন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশংকর, সমরেশ বসু। যেমন প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাস, দুর্গাদাস, উত্তমকুমার; যেমন মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। যেমন শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জী। এঁরা যে সবাই রূপকথার নায়ক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সেই রূপকথার জগৎ তাঁদের তৈরি করতে হয়েছিল।

কলেজ জীবনে মনে হয়েছিল রূপকথার রাজপুত্র হওয়ার সহজ পথ অভিনয় করা। নাটকের দলও করেছিলাম। কিন্তু এগোতে পারিনি। নাটক লিখতে গিয়ে গল্প লিখলাম। গল্প লিখে পনেরোটা টাকা পেলাম। আর তখনই স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। এক রূপকথার জগতের স্বপ্ন।

আমি যা লিখছি তাই চাপার জন্য উদগ্রীব প্রকাশকরা। বছরে মোটা টাকা দিচ্ছেন তাঁরা। আমার বাড়ি, গাড়ি হয়ে গেছে। দামি ক্লাবের মেম্বার হয়েছি। দেশ-বিদেশ থেকে ঘন ঘন আমন্ত্রণ আসছে। প্রায় অর্ধেক পৃথিবী তার কল্যাণে দেখে ফেলেছি। কোনো সভায় গেলে অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে যায়। বইমেলায় হাঁটতে চাইলে ভিড়ের অত্যাচারে হাঁসফাস করি। সপ্তাহে পাঁচ দিন বিভিন্ন সাহিত্য-সভায় বক্তৃতা তো আছেই, পাঠিকারা রোজ রাশি রাশি প্রেমপত্র পাঠাচ্ছে। বাঙালির প্রিয় লেখক হয়ে গেছি আমি। সেই স্বপ্ন, যা আমি দেখতাম বছর আটত্রিশ আগে, যাকে রূপকথার জগৎ বলে মনে হত তখন তার রাজপুত্র বলে নিজেকে ভাবতে খুব ভালো লাগত।

সাতষট্টি থেকে চুরাশি, ডিঙি নৌকোয় বর্ষার মাতলা পার হওয়ার চেষ্টা চলেছিল। তখন আমার বই বিক্রি হয় না, সম্পাদক দয়া করে লেখা ছাপেন। সাহিত্য-পত্রিকা থেকে সরিয়ে সিনেমা পত্রিকার পুজো সংখ্যায় লিখতে বলা হত। কোনো সাহিত্য-সভায় ডাক আসত না, বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে যাতায়াত করি। তারপর ওই ট্রিলজিটার কল্যাণে আচমকা সব বদলে গেল।

আমি সেই রূপকথার জগতে ঢুকে পড়লাম। আমার বাড়িতে কোনো পাণ্ডুলিপি পড়ে থাকে না। পৃথিবীর অর্ধেক ঘুরে এসেছি পরের পয়সায়। গল্প লিখে, বই এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে যা রোজগার করেছি তাতে বছরে দু'লক্ষের ওপর আয়কর দিচ্ছি। পাঠিকাদের চিঠি পাই প্রচুর।

সভাসমিতিতে ডাক আসছে স্রোতের মতো। একটু গরম লাগলেই ড্রাইভারকে বলি এ.সি চা ঠিক এই জগৎটাই তো আমার কাছে রূপকথার জগৎ ছিল, যার রাজকুমার আমি।

কিন্তু রূপকথা কি জানা ছিল, বিরূপকথা শব্দটার অস্তিত্ব জানতাম না।

এখন আমাকে প্রতিটি সকালে নিয়ম করে চার ঘণ্টা লেখার টেবিলে বসতেই হয়। আ লিখতে ইচ্ছে করছে না বা একটু আড্ডা মারব বলবার কোনো অধিকার আমার নেই। এ লেখা মানে কথার খেলাপ করা। যে লেখা নিতে আসবে সে ফিরে যাবে মনে মনে দিতে দিতে। একজন প্রফেশনাল লেখক হিসেবে আমি তা হতে দিতে পারি না। ফলে লেখার সময় আমাকে বাধ্য হয়ে রূঢ় ব্যবহার করতে হচ্ছে। কেউ এলে দেখা করি না, খু না হলে ফোন ধরি না। ফলত বিরূপ হচ্ছেন অনেকেই।

প্রথম দিকের কয়েক বছর চেনা অচেনা মানুষের ডাকে বিভিন্ন সভায় গিয়েছি। কাছে এ ফুলের মালা পরেছি, দু'ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়ে পুরস্কার তুলে দিয়েছি কচি-কাঁচাদের হাতে। তা মিনিটের একটা বক্তৃতা সেরে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে বাড়িতে ফিরেছি। মুশকিল হত তখন, মিষ্টি খায় না, মিষ্টি কাকে খাওয়াবো? এই যে যাতায়াত থাকায় প্রায় পাঁচঘণ্টা নষ্ট হল কিন্তু ওঁরা আনন্দিত হলেন। দুর্গাপুরে যাচ্ছি সাহিত্য-সভায়, ট্রেনে পাশের আসনে গুনগুন যে তরুণটি, জানা গেল তিনি একজন গায়ক। ওই একই অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন গান গাইতে। প্রা শিল্পী বললেন,—আট হাজার চেয়েছিলাম, পাঁচে রাজি হয়েছে। বর্ধমান স্টেশনে চুপচাপ নেমে ট্রেনে কলকাতায় ফিরে এসেছি তখন।

রূপকথার জগতে বিরূপকথা ঢুকে পড়ত। দুই ভদ্রলোক এলেন,—দাদা, আমরা রবীন্দ্র করছি, আপনাকে প্রধান অতিথি হতে হবে। বাইশে শ্রাবণ।

—কোথায়?

বারাসতে। নিয়ে যাব, দিয়ে যাব। বড়জোর ঘণ্টা চারেক। যেতেই হবে আপনাকে!

—কেন যাব?

—মানে? সবাই আপনাকে পেতে চায়!

—বেশ তো, তার বদলে আমি কী পাব? ফুলের মালা আর মিষ্টি?

—আপনাকে একটা শাল দেব আমরা।

—এই গরমে শাল! তা আপনাদের কল্যাণে ডজন ছয়েক পড়ে আছে আলমারিতে

—তাহলে? কী গিফ্‌ট্ চান বলুন!

—চার বা পাঁচ ঘণ্টাই হয়ে যাবে। পাঁচ হাজার দেবেন।

—আ—আপনি টাকা চাইছেন—আঁতকে উঠলেন ওঁরা।

—কেন? আমার সময়ের দাম নেই?

ওঁরা ভেবে বলবেন বলে চলে গেলেন এবং আর আসেননি।

বইমেলায় হাঁটছি বন্ধুর সঙ্গে। অনেকদিন বাদে আমরা একত্রিত। হঠাৎ কয়েকজন ছেঁড়া ক্যাশমেমো এগিয়ে দিয়ে বললে,—অটোগ্রাফ। কেউ কেউ আরও পুলকিত,— দুটো লাই দিন প্লিজ!

—আপনারা ভুল করছেন। ভুল লোক ধরেছেন।

—কেন? আপনি সমরেশ মজুমদার নন?

—না না। আমি বুদ্ধদেব গুহর ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে পাবলিক পাতলা। মন্তব্য কানে এল—খানিকটা বুদ্ধদেব গুহর মতো দেখতে। তবে উনি দুধে-আলতা ফরসা আর ওঁর ভাই কালো।

আপনি সাহিত্যিক, আপনাকে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে যেতে হবে। প্রচণ্ড গরমে পুরুলিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যেতে হবে। আপনি মানুন কি না মানুন, পুজোর উদ্বোধনে যেতেই হবে। কেন যাব? ব্যস, একটি প্রশ্ন আপনার চারপাশে বিরূপকথার জগৎ তৈরি করবে। তখন আপনি আর রাজপুত্র নন, একটি রাক্ষস।

আর কে না জানে, রূপকথা ক্রমশ বিরূপকথায় পৌঁছে যায় যখন লেখাগুলো আর লেখা থাকে না, যখন তার ধার ভোঁতা হয়, ভার কমে যায়! তখন একঘণ্টা বসে থাকলেও প্রকাশক এক কাপ চা খাওয়ান না।

অতএব পার্টির ইলেকশন ফান্ডে পাঁচশো টাকা দিতে হবে। ওঁরা জানেন টাকাটা আমি দিচ্ছি না, রূপকথার রাজপুত্র দিচ্ছে। যার স্ট্যাটাস আছে, কেন দেব বলার হিম্মত যার নেই।

জুন ২০০৫

‘পত্রপাঠ কি জয়

প্রতি মাসে সম্পাদক ফোন করে বলেন—লেখাটা কবে পাব? প্রথম প্রথম ঝটপট বলতাম,- দু-তিন দিনের মধ্যে। তখন ভাবতাম, ছেলেটা মন্দ নয়, অনেক খেটেখুটে পত্রপাঠ বের করে লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ঐতিহ্য অনুযায়ী পত্রপাঠ পত্রপাঠ-ই বিদায় হয়ে যাবে। বাড়ির বৃদ্ধ বা বৃ যদি আলতু-ফালতু কথা বলেন তখন যেরকম উদার হয়ে আমরা বলি—আচ্ছা বলতে দাও, ক'দি আর বাঁচবে! পত্রপাঠ-সম্পাদকের ফোন এলে সেরকমই ভাবতাম, দিয়ে দাও একটা লেখা, সামনে মাসে বোধহয় চাইতে পারবে না। পত্রপাঠ-এর গঙ্গাপ্রাপ্তি তো অনিবার্য ঘটনা!

অথচ এবারও, এই জুন মাসে যখন সম্পাদকের ফোন এল তখন মিনমিনে গলায় বললাম,- এবার আমায় বাদ দাও ভাই।

—অসম্ভব! আপনি প্রথম সংখ্যা থেকে লিখে আসছেন, একটা রেকর্ড রেখে আপনাকে যেতে হবে; কোনো কথা শুনব না।—সম্পাদক বললেন।

মাথা ঘুরল, পা দুর্বল হল। রেকর্ড রেখে যেতে হবে মানে? আমি চলে যাব? আমি চ যাওয়ার পরও পত্রপাঠ থাকবে?

কীরকম অসহায় বোধ হল। গত সংখ্যা পত্রপাঠ খুঁজলাম। জানলাম, ওটা বাড়িতে নেই। পাশে বাড়ির বিন্দুবাসিনী নিয়ে গিয়েছে। তার স্বামীর বাত হয়েছে, হাঁটতে পারেন না। ইদানীং তাঁর সশ হাসি শোনা যায়। ও বাড়ির কাজের লোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে, ওটা বিন্দুবাসিনীর স্বামী হাসি। স্ত্রীর কোলের কাছে মিনি বেড়ালের মতো শুয়ে তিনি পত্রপাঠ শোনেন আর হাসেন। আম বাড়িতে আসা পত্রপাঠ নিয়ে গিয়ে স্বামীকে পড়ে শোনান বিন্দুবাসিনী। তখন নাকি লোকটার বাতে ব্যথা কমে যায়।

বিন্দুবাসিনীর সঙ্গে আমার বাক্যালাপ প্রায় তিরিশ বছর বন্ধ। এটা ওর বাপের বাড়ি। বিন্দুবাসি একমাত্র সন্তান। ওই লোকটি ঘরজামাই হয়ে তিরিশ বছর ধরে অনেক সেবা খেয়ে যাচ্ছিল, এ কয়বছর যোগ হয়েছে পত্রপাঠসেবা। অথচ এরকম হওয়ার কথা ছিল না। আমাদের দুই বাড়ির মে একটা দেয়াল আছে, সেটা ভেঙে ফেলার কথা ছিল। ফেললে দুই বাড়ি এক হয়ে যেত। সে চোদ্দো বছর বয়স থেকে কুড়িতে ওঠা পর্যন্ত বিন্দুবাসিনী সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল। কু বছর বয়সে যেই তার মা বায়না ধরলেন, পাশের বাড়ির ছেলেকে বিয়ে করলে সে তো আর ঘরজাম হয়ে থাকবে না, কিন্তু তাঁর ঘরজামাই চাই, সঙ্গে সঙ্গে পালটি খেয়ে গেল সে। এক মাধবী রা বাড়ির ছাদে নারকেল গাছের পাতার ফাঁকে যখন ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিরি ঝিরি হাওয়া বইছে তখন বিন্দুবাসি

আমাকে, 'ভাবছ কেন? আমি কি দূরে সরে যাচ্ছি? জানলায় দাঁড়ালেই আমাকে দেখতে পাবে, সারা জীবন।' সেই রাতে কোনো কথা বলিনি, আজ পর্যন্ত নয়।

মাঝে মাঝে কৌতূহল হয়, বিন্দুবাসিনী কি আমার লেখা কলম পড়ে শোনায় তার স্বামীকে? তবে বিনি পয়সায় পত্রপাঠ নিয়ে যায়, যখন আমি বাড়িতে থাকি না। আমি না লিখলে সম্পাদক কমপ্লিমেন্টারি কপি পাঠাবেন না। না পাঠালে বিন্দুবাসিনীর স্বামী হাসতে পারবে না। ওদের হাসাতে ফাঁসিয়েছেন সম্পাদক। তা হোক, কিন্তু পত্রপাঠ এতদিন ধরে বেঁচে আছে কী জাদুতে?

প্রথম কথা, পত্রপাঠের কোনো মামা নেই। মামা থাকলে বিজ্ঞাপনে পত্রিকার পাতাগুলো ঢেকে যেত। ভাগ্নেটি বৃষ্টিভেজা লাউডগার মতো তরতরিয়ে গতর বাড়াতেন। মামার জোর থাকলে বঙ্গের তাবড় লেখকদের কিনে ফেলতে পারতেন সম্পাদক। সেই সব নাম বিজ্ঞাপিত হলে বঙ্গীয় পাঠককুল হামলে পড়তেন। অচলপত্রের বয়স্ক লেখককুলের রচনায় এখনও যে ধার তা তাবড় লেখকদের ঈর্ষার বস্তু হলেও ভারে তো কাটত! এই নামে বিজ্ঞাপনদাতারা যে কি আকর্ষণ বোধ করতেন তার নিদর্শন তো প্রতি পক্ষে দেখতে পাই।

কিন্তু এসব অলীক কল্পনা। পত্রপাঠের 'কোনো মানা নেই'। এ যুগের বালক-বলিকারা কাকা, জ্যেঠা, পিসিদের চেনে না। তাদের সন্তানদের নামও শোনেনি, কিন্তু তারা মাসি এবং মামাকে আঁকড়ে ধরে থাকে মায়ের সৌজন্যে। এমনকী মাসির জা-এর কুকুরের নামও তাদের মুখস্থ। পত্রপাঠের এখনও ভাগ্নে হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তার মাতৃদেবীর যদি কোনো ভাই না থাকে, মাতামহ যদি পুত্রসন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয়ে থাকেন তাহলে পত্রপাঠের কিছুই করার নেই।

এই অবধি লেখার পর প্রাকৃতিক প্রয়োজনে লেখার টেবিল ছেড়ে যেতে হয়েছিল। সেই সময় পাশের বাড়ি থেকে বিন্দুবাসিনীর কথা ভেসে এল—হ্যাঁগো, আজ কী শুনবে? রামায়ণ না মহাভারত?

ওই বাথরুমে গেলে ও বাড়ির অনেক কথা শোনা যায়। কিন্তু বিন্দুবাসিনীর কথা শোনা মাত্র মনে হল, পত্রপাঠ মাতামহ সূত্রে মামা পায়নি তো কী আছে, মামা জোগাড় করতে তো পারত, যেমন ব্যাসদেব কৌরব বা পাণ্ডবদের পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেছেন, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি রামচন্দ্রদের পৃথিবীর মাটি দেখিয়েছেন। এই ব্যাসদেব বা ঋষ্যশৃঙ্গদের একজনকে যদি সম্পাদক পাকড়াও করতেন তাহলে মামা অথবা মামুর অভাব হত? ভাগ্নেটির চেহারা বদলে যেত তখন। আমার সাহসই হত না লেখা চাইলে গাঁইগুঁই করার। চকচকে নোটের বান্ডিল আমার মুখে ছুঁড়ে মারলে আর সেখান থেকে কি শব্দ বের হত? পত্রপাঠ পুরস্কার নিতে নিতে কে বা আগে প্রাণ করিবেক দান-এর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত।

এতগুলো বছর গেল, পত্রপাঠ এখনও পর্যন্ত তাজ বেঙ্গলে বা সায়েন্স সিটিতে পত্রপাঠ-সন্ধ্যার আয়োজন করতে পারল না। ঠিকঠাক মামু ধরতে পারলে বছর বছর কী জম্পেশ ব্যাপার না হত! আমরা যারা ফাইভস্টারে ঢোকার আগে রুমালে জুতো চকচকে করে নিই তারা পত্রপাঠের আমন্ত্রণপত্র হাতে নিয়ে সেই অমরাবতীতে ছাদনাতলায় যাওয়া বরের মতো ঢুকতাম। সুসজ্জিত হল-এ প্রত্যেকের জন্যে একটি করে ঘেঁটুফুল থাকত। তাই হাতে নিয়ে মঞ্চের দিকে তাকাতাম। সেখানে সম্পাদকের পাশে দীপ্তেন সান্যালের আত্মা হাসিমুখে বসে থাকতেন। তাঁদের ভাষণ শুনে আমরা হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলতাম। তারপর পত্রপাঠ পুরস্কার তুলে দেওয়া হত। কোনোবার মমতা, কোনোবার সুব্রত, কোনোবার সুভাষবাবুর হাতে। তারপর খাওয়াদাওয়া। কী খাওয়া, কী খাওয়া! সঙ্গে কয়েক পেগ দাওয়া! পাঁচতারা হোটেলে তখন—পত্রপাঠ কি জয়!

তার বদলে? ভাবতেই মনে হল, কী করে বলছে? মামাহীন ভাগ্নেটি কী করে প্রতি মাসে আমাদের ফাঁসাচ্ছে? মামা ছাড়া কি ভাগ্নে হয়?

প্রশ্নটির জবাব পেয়ে গেলাম। বিন্দুবাসিনীর স্বামীর শরীর এত খারাপ যে তাঁকে হ নিয়ে যেতে হল। রাত্তিরে বিন্দুবাসিনী অশোকবনে সীতার মতো পড়ে আছে তার বাড়ি দেয়ালের ওপাশে। এতদিন কথা বলিনি, আজ ওর এই দুঃসময়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া নয়? সম্পাদকের ফোন এল,—আপনাকে একটা পত্রপাঠ সংকলন পাঠিয়েছিলাম, পিয়ন আপনার পাশের বাড়িতে দিয়ে এসেছে।

যাচ্চলে! সান্ত্বনা দেওয়ার সঙ্গে বই ফেরত নিতে যাওয়ার আগে বাথরুমে ঢুকলাম। এল, বিন্দুবাসিনী গাইছে—ঘুম ঘুম রাত ঝিকিমিকি তারা এই মাধবী রাত...

স্বামী যার হাসপাতালে সে কী করে এই গান গায়? তিরিশ বছর আগে তো ও আ শোনাত। বুঝলাম, প্রেমিক ছাড়াও যদি প্রেম বেঁচে থাকে তাহলে মামা না থাকলেও ভা পারে।

জুলাই ২০০৫

পার করেগা

পাড়া কাঁপিয়ে, বাঁক নিয়ে, নতুন সাদা শর্টস আর গেঞ্জি পরে যখন ছেলেরা যুদ্ধ জয় করতে যাচ্ছি এমন ভঙ্গিতে তারকেশ্বরে জল ঢালতে যায়, তাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলে—কে কত বিচিত্র এবং বিকৃত ভঙ্গিতে 'ভোলেবাবা পার করেগা' স্লোগান দিতে পারে। বছর কুড়ি আগে দু-একজন বয়স্কা মহিলাকে সসংকোচে তারকেশ্বরে জল নিয়ে যেতে দেখা যেত। এ বছর কাঁড়ি কাঁড়ি জিন্‌স পরা মেয়ে বাঁক নিয়ে ছুটেছে ভোলাবাবাকে স্মরণ করতে করতে।

ফিরে আসার ক'দিন বাদে এরকম একটা ছেলেকে প্রশ্ন করেছি—ভোলেবাবা তোমাকে কি পার করেছেন?

—ধ্যাৎ—এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার। পারাপার আবার কি, কথাটা বললে রক্তে বেশ জোর আসে। নাচতে নাচতে যাওয়া যায়, তাই বলা।—ছেলেটি বলেছিল।

—একটা কথা বলব?

—একি দাদা, আপনি যে কথা বলছেন তাতেই আমি ধন্য।

—সামনের বছর শ্রাবণ মাসে পুরুলিয়ার এক গ্রামে যদি জল নিয়ে যাও এবং সেখানকার শুকিয়ে থাকা মাটিতে সেই জল ঢেলে দাও, তাহলে ভোলেবাবা তোমাদের নিশ্চয়ই পার করবেন।—বললাম।

খবরটা চাউর হয়ে গেল। আমাদের পাড়ার তো বটেই, বেপাড়ার ছেলেরাও খোঁজ নিতে আরম্ভ করল। পুরুলিয়ার খরা কবলিত মাটিতে জল ঢাললে বদলে কী পাওয়া যাবে! প্রশ্নটি ঘুরতে ঘুরতে আমার কাছে এল। সেদিনই একটি ইংরেজি পত্রিকায় পড়ছিলাম, ভারতের পশ্চিমবাংলার খরা কবলিত অঞ্চলে মাটির নীচে প্রচুর তেল মজুত আছে বলে অনুমান করা হচ্ছে। আগামী বছর এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালানো হবে। খরবটা পড়েছি বলে জানিয়ে দিলাম, ভোলেবাবা পার করে দিলে তরল সোনা পাওয়া যাবে। দুশো ফুট মাটি খুঁড়ে পাইপ ঢুকিয়ে দিলে পাইপের ওপরের মুখ থেকে গলগল করে যে তরল পদার্থ বের হবে সেটা সংশোধন করে নিলে বিয়াল্লিশ টাকা পাওয়া যাবে এক লিটারে। কোটি কোটি লিটার পড়ে আছে মাটির নীচে যুগান্তর থেকে। চাউর হল এই খবরও। তরল সোনা থেকে মুখে মুখে সেটা চব্বিশ ক্যারেটে পৌঁছে গেল।

পাড়ায় পাড়ায় বাঁশ বেঁধে ক্যাম্প তৈরি হল। দশ-বারো জনের এক-একটা দল। বেশি লোক একসঙ্গে গেলে সোনা নিয়ে মারপিট হতে পারে বলে একই পাড়ায় দশটা দল হল। মেয়েদের দল হল দুটো। তিনদিন আগে থেকে মাইকে বাবা তারকনাথের গান বাজতে লাগল। কিন্তু তারকেশ্বর বাবার মাথায় জল ঢালতে কেউ যাচ্ছে না এবার, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা মেনে নিতে না পারলেও মৃদু প্রতিবাদের বাইরে কিছু করতে পারলেন না।

যাত্রা শুরু হল। হালুম হুলুম শব্দে পাড়া কাঁপল—ভোলেবাবা পার করেগা। সঙ্গে বাজছে যত রকমের রণদামামা। ছুটল সবাই হাওড়া স্টেশন। পুরুলিয়ার ট্রেনে তিল রাখার জায়গা নেই। রেল কোম্পানি এক্সট্রা গাড়ি দিয়েও কুল পাচ্ছে না। বাসেও ভোলেবাবার শিষ্যদের হুংকার শোনা গেল।

পুরুলিয়া তখন আগুনে পুড়তে পুড়তে প্রায় ছাই হয়ে যাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে গেছে। মাটি চৌচির। সন্ধের আগে ঘরের বাইরে পা দেওয়া যায় না। কিন্তু হাজার হাজার যুবক-যুবতী 'ভো পাব করেগা' বলতে বলতে ছুটে গেল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মাঝখানে। কলসি উপচে ফেলতে লাগল কলকাতার জল পুরুলিয়ায় মাটিতে। যারা যেখানে জল ফেলছে সেখান থেকে নড় প্রথমদিকে জলে পড়ামাত্র শুষে নিচ্ছিল মাটি। তারপর লিটার লিটার, গ্যালন গ্যালন জল এর মতো খেলা করতে লাগল সেই মাটিতে। তৃষিত ধরণীর সব তৃষ্ণা ভরাট যাওয়ায় বাড়তি স্নান করে নিচ্ছিল পাখিরা, এমনকি শেয়াল-ইঁদুরও। এবার মাটি খোঁড়া। যে যা হাতে পেল খুঁড়তে লাগল। জল ঢুকে গেল আরও ভেতরে। ভোলেবাবা পার করেগা।

কিন্তু দশ ফুট মাটি খোঁড়া তো সহজ ব্যাপার নয়। রাম খুঁড়ছে, রহিম খুঁড়েছে। দশ-ফুটের পর হাঁপিয়ে উঠছে সবাই। আমি রইলাম গা ঢাকা দিয়ে। তরল সোনা পেতে গে ফুট খুঁড়তে হবে। তার জন্যে যন্ত্র আনা দরকার। হঠাৎ একটা পনেরো ফুট গর্ত থেকে হু গ্যাস বেরিয়ে এল খানিকটা। বেরুতেই লাগল একটু একটু করে। হই হই পড়ে গেল। বা ত দিয়েছেন। তলায় তরল সোনা আছে বলেই তো গ্যাস বেরুচ্ছে! কেউ সিগারেট-বিড়ি খে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

প্রবল উৎসাহে জনতা কয়েকটা দলে ভাগ হল। এই দলগুলো থেকে মাটি খোঁড়ার ত যন্ত্র আনানো হবে। ততক্ষণ খোঁড়া অবস্থায় না রেখে আবার গর্ত বুঁজিয়ে দেওয়া হোক। স শনিবার সেই যন্ত্র নিয়ে আসা হবে এখানে।

দিকে দিকে এই বার্তা ছড়িয়ে পড়ল। সরকার নড়েচড়ে বসল। সত্যি যদি মাটির নীচে থাকে তাহলে তা সরকারের সম্পত্তি। এরা কারা? কিন্তু এসব বললে বিপ্লব হয়ে যাবে। সোনার গন্ধ পেয়ে কলকাতায় ফিরে গেছে।

সেই রাত্রে, যাদের জমি যারা জলের অভাবে চাষ করতে পারে না, মানুষের ভয়ে সে লোকগুলো সারাদিন সিঁটিয়ে থাকার পরে সন্ধে নামতে নেমে পড়ল মাঠে, জলে ভেজা টু মাটির বুকে যত্নে জমিয়ে রাখা বীজধান ছড়িয়ে দিল। নিচের মাটি ওপরে উঠে এসেছে ত কৃপায়। তার গন্ধ অন্যরকম।

পরের শনিবার কলকাতার লোকেরা আবার কলসিতে জল আর মাটি খোঁড়ার যন্ত্র নিয়ে হল জমির সামনে। কিন্তু একি! কোথায় সেই ফাটা শুকনো মাটি? ক্ষুদে ধানের গাছ শিশুর মুখ করে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে সমস্ত মাঠ জুড়ে। ওই নধর সবুজে যে সারল্য ও তা মোহিত করল কয়েকজনকে। তারা যেন শুনতে পেল, আমরা জন্মেছি। আমাদের বাঁচাও। উপুড় করল তারা। তারপর দেখাদেখি অনেকে। কেউ কেউ ক্ষেপে গেল। মাটি খুঁড়ে কাঁচা বের করার জন্যে আসা। এর মধ্যে ধান লাগাল কী করে?

মাতব্বররা তাদের বোঝাল, এ-ও বাবার ইচ্ছা। এখানকার সবমাটির নিচে তো তেল র তাহলে যে মাটিতে চাষ হয় না, হবে না কখনও, সেখানেই খোঁড়াখুঁড়ি করা ভালো। এরক প্রচুর জমি পড়ে আছে এ জেলায়। তবে এর জন্যে আরও একবছর অপেক্ষা করতে হবে। তো বাবার মাথায় জল ঢালা যায় না! সামনের শ্রাবণের আগে তৈরি হয়ে আসতে হবে এ

মেনে নিল সবাই। আশায় বাস করতে বড় সুখ।

কিন্তু পুরুলিয়ার মানুষ এবার চিৎকার করলেন—ভোলেবাবা পার করেগা।

বাবা তাঁদের পার করছে। বহু বছর পরে তাঁদের জমিতে তারকেশ্বরের বদলে যে জল গিয়েছিল কলকাতার মানুষেরা, তাতে সোনা ফলেছে। বাতাস সেই ধানের ওপর ঢেউ তুলে দিন রাত।

বুনো ওল বাঘা তেঁতুল

আমরা তখন ক্লাস টেনে পড়ি। স্কুল খুব ভালো। আগের ব্যাচের কেউ সেকেন্ড ডিভিশন পায়নি। মাসখানেক ক্লাস হওয়ার পর একটি নতুন ছেলে ভরতি হল আমাদের ক্লাসে। এসময় সিট খালি থাকলেও নতুন ছেলেকে নেওয়া হয় না। প্রথম দিনই অঙ্কের স্যার বললেন ওকে,—তুমি নতুন দারোগাবাবুর ছেলে বলে এই সময় ক্লাস টেনে নেওয়া হয়েছে। প্রি-টেস্টের রেজাল্ট খারাপ হলে কিন্তু টেস্টে বসতে দেওয়া হবে না। ছেলেটি মাথা নিচু করে বসেছিল। আমরা দেখলাম নতুন দারোগাবাবুর ছেলেকে।

নতুন দারোগাবাবুকে আমরা দেখেছি। বিশাল চেহারা, বাঘের মতো মুখ, বড় গোঁফ, দেখলেই ভয় করে। দিন পনেরো আগে থানায় এসেছেন। এসেই নিজের ক্ষমতা জাহির করেছেন। আমাদের শহরের একমাত্র সিনেমাহলে ভালো সিনেমা এলে কালুদা টিকিট ব্ল্যাক করত। মূল দামের চেয়ে দু-তিন টাকা বেশি। বলত, আমার বেশি লোভ নেই। তোরা এলে দামে দামে দিয়ে দেব। কাজে যোগ দেওয়ার দ্বিতীয় দিনেই কালুদাকে ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে গেল পুলিশ। নতুন দারোগা এমন মার মেরেছিল যে ছ'মাস হাসপাতালে থেকে শহর ছেড়ে চলে যায় কালুদা। তার জায়গায় শহরের রাজনৈতিক নেতা রাম মুখার্জীর ভাইপো ব্ল্যাক করতে শুরু করল। অন্তত আট টাকা বেশি। কিন্তু তাকে পুলিশ কখনও ভ্যানে তোলেনি। লোকে বলত ও থানা থেকে বন্দোবস্ত করে কাজে নেমেছে।

কারও বাড়িতে চুরি হলে থানায় যেতেই হয়। দারোগাবাবু প্রথমে পরিচয় জেনে নেন। সাদামাটা লোক হলে ডায়েরি নেন না। বলেন,—আগে কাকে সন্দেহ হয় খোঁজ নিয়ে এসে বলুন তারপর লেখালেখি হবে। আমি কি অন্ধকারে সূচ খুঁজব?

হরিদাস আগরওয়ালা ভেজাল তেল বিক্রি করছে খবর রটে গেল। লোক ভিড় করল দোকানে। দোকান বন্ধ। সবাই বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে কিন্তু দারোগাবাবুর তখন তীব্র পেটখারাপ। শয্যাশায়ী। সেকেন্ড অফিসার এসে সবাইকে শান্ত থাকতে বলে গেল। তিন দিন পরে দারোগাবাবু ঘটনাস্থলে এসে দোকান খোলাতে দেখা গেল, সব টিনে খাঁটি তেল রয়েছে, ভেজাল তেল উধাও।

সরকার-বিরোধী দল মিছিল করলেই দারোগাবাবু ক্ষিপ্ত হয়ে যান। তাঁর ক্রোধে অনেকেই বাড়িছাড়া।

এই অবস্থায় দারোগাবাবুর ছেলেকে পেয়ে টিফিনের সময় অজিত বলল,—এই, তোর বাবা ঘুষ খায়। জানিস?

ছেলেটি মাথা নাড়ল,—জানি।

—সেই টাকায় তোরা ফুর্তি করিস। খারাপ লাগে না?

—লাগে।

—আমি অবাক হয়ে গেলাম,—কেন খারাপ লাগে?

—মা বলে, বাবা অসৎ পথে টাকা রোজগার করে।

—তোর মা বাবাকে বলেন?

—না। বাবাকে মা খুব ভয় পায়।

হঠাৎ আমরা পালটে গেলাম। ছেলেটি, যার নাম বিপ্লবকেতন, আমাদের বন্ধু হয়ে গেল। ত আমরা পড়াশুনায় তো বটেই, গল্পের বই দিয়েও সাহায্য করতাম। আঙ্কল টম্‌স কেবিন পড়ে লাল করে স্কুলে এসেছিল। একদিন এল গালে পাঁচ আঙুলের ছাপ নিয়ে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবি পড়ছে দেখে বাবা মেরেছে তাকে। আমরা খুব ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু বিপ্লবকান্তি গম্ভীর বলেছিল,— না। আমিই প্রতিবাদ করব। প্রতিবাদ করার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। জন্যে আমার আর একটু সময় দরকার।

সেপ্টেম্বর ২০০৫

হায় সমরেশদা!!

প্রথমেই পত্রপাঠের মাননীয় পাঠকদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পত্রপাঠের জন্মসংখ্যা থেকেই সম্পাদক বিনয় এবং ভালোবাসা দক্ষিণা দিয়ে আমার মতো পেশাদার লেখককে দিয়ে প্রতিটি সংখ্যায় লিখিয়ে নিয়েছেন। সেসব লেখা লিখতে মজা কম লাগেনি। অন্যকে গালাগাল দেওয়ার সুযোগ তো বড়ো একটা পাই না! গত সংখ্যার জন্য লেখার তাগাদা যখন এল তখন আমাকে যেতে হচ্ছিল বিদেশে। ভেবেছিলাম রাত্রে লেখাটা শেষ করে ভোরের প্লেন ধরব। শেষপর্যন্ত পারিনি। দেখলাম আমার কলমে সম্পাদক লিখেছেন। এবং লেখাটা যে আমার থেকে অনেক দাপটে লিখেছেন একথা নিশ্চয়ই আপনাদের নতুন করে বলতে হবে না। তবু কেউ কেউ, আমার লেখা না দেখে যদি অভিমানী হন, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম আমার একটি বাংলা উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদের পেপারব্যাক সংস্করণের উদ্বোধন উপলক্ষে। নিউ ইয়র্ক প্রেস ক্লাবের সৌজন্যে শেষপর্যন্ত এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে আগামী এপ্রিলের গোড়ায়। কিন্তু এই সুযোগে ওখানকার বিখ্যাত পত্রপত্রিকা, সমালোচক ও লেখকদের সঙ্গে পরিচয় এবার হল।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মানুষ যে ভাষায় কথা বলেন, বাংলা তার তিন নম্বরে। ফরাসি, জার্মান অনেক নিচে। তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় লেখা বই-এর বিক্রি আশ্চর্যজনকভাবে কম। একজন আমেরিকান সাধারণ মানের লেখকের বই বিক্রির পরিমাণ শুনলে সংকোচে চুপ করে যেতে হয়। তবু, অস্বীকার করে উপায় নেই, বাংলা বই-এর বিক্রি বেশি হয় বাংলাদেশে। ওখানকার লেখকরা তো আছেনই, আমাদের বই, পাইরেট সংস্করণ হু হু করে বিক্রি হয়। কলকাতার মূল প্রকাশক 'গর্ভধারিণী' বিক্রি করেছেন পঁয়তাল্লিশ হাজার কপি, অথচ ওই বই, কয়েক বছর আগে ঢাকায় সংবাদপত্রে ছাপা খবর অনুযায়ী, পাইরেটরা বিক্রি করেছে এক লক্ষের বেশি। বিদেশে গিয়ে দেখেছি বাংলাদেশের মানুষ বাংলা বই পড়েন খোদ নিউইয়র্ক শহরে গোটা আটেক বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ বের হয়, যার একটির পাতার সংখ্যা আশি। রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে অচেনা বাংলাদেশের মানুষ এগিয়ে এসে আলাপ করেন চিনতে পেরে। অবাক হয়ে শুনি, ভদ্রলোক গত শারদীয়া সংখ্যার উপন্যাসও পড়ে ফেলেছেন।

এবার একদিন পশ্চিমবঙ্গের এন আর আই-দের এক পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম গৃহস্বামীর সঙ্গে পরিচয় সূত্রে। সেদিন ছিল শনিবার। গিয়ে দেখলাম বাড়ির সামনে আটটি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গৃহস্বামী অভ্যর্থনা জানালেন। বাইরে প্রচুর ঠান্ডা বলে ভেতরের উষ্ণ হলঘরে বসার ব্যবস্থা। আটটি দম্পতি সেজেগুজে বসে আছেন। এঁদের বয়স পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টির মধ্যে। ছেলেদের পরনে দামি পাঞ্জাবি, কলকাতায় গিয়ে অন্তত পাঁচ-ছয় হাজার দিয়ে কিনেছেন। মহিলাদের পোশাকও ওইরকম মূল্যবান। গৃহস্বামী পরিচয় করিয়ে দিলেন,—সমরেশ, লেখক। আর এঁরা হলেন...

নামগুলো মনে রাখতে পারলাম না। এবার মদ পরিবেশন করা হল। ছেলেরা কে স্পর্শ করলেন না। কারণ তাঁরা গাড়ি চালাবেন। পুলিশ যদি বুঝতে পারে এক ফোঁটা দিয়ে নামিয়ে স্টিয়ারিং ধরেছেন তাহলে লাইসেন্স ক্যানসেল হয়ে যাবে। অতএব মহিলার রকে মজেছেন। আমার পাশে বসা প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন,—আপনার একটি গল্প আ দেখেছি।

বুঝলাম উনি হয় 'দৌড়' কিংবা 'আত্মীয়স্বজন' দেখেছেন।

—বিউটিফুল। কী গান। আর কী অ্যাকটিং।

—কোন্ ছবি? আমি তাকালাম।

—কেন? 'গঙ্গা'। নির্মলেন্দু চৌধুরীর সেই বিখ্যাত গান। ইচ্ছে করে—

আমি হতভম্ব। কিন্তু কিছু বলার আগেই ওঁর মিসেস গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাসলেন,— তুমি ওঁর যে লেখাটা আমরা ক্লাস ইলেভেনে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছি সেটা যা রসালো!

—কোন লেখা গো? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন।

—নামটা, বি-বি, আমার স্মৃতি যদি বিট্রে না করে থাকে, 'বিবর'।—ভদ্রমহিলা ঠিক আনন্দে উত্তেজিত।

আমি সরে এলাম। কিছু বলার নেই।

সমরেশবাবু, এখন দেশে কীরকম লিখছে সবাই?—টাকমাথা একজন প্রশ্ন করলেন

—ভালোই।

—গুড্। তবে কী জানেন, রবীন্দ্রনাথ ইজ রবীন্দ্রনাথ। আর একজন রবীন্দ্রনাথ বাঙ করতে পারল না। এই যে প্রত্যেক বছর বিভিন্ন ভাষার লেখকরা নোবেল পায়, খুব কষ্ট ও হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এলা, এলা! এদিকে প্লিজ।

রোগা এক সুন্দরী কাছে এলেন। ভদ্রলোক বললেন,—এলা, আমার স্ত্রী। দারুণ বাংল অমর্ত্য সেন নোবেল পাওয়ার পর ও বাংলায় চিঠি লিখে কনগ্রাচুলেট করেছিল। আমি তুমি উপন্যাস লিখলে—

—আঃ সুদীপ!—এলা চোখ ঘোরালেন,—এমন কিছু লিখি না আমি।

বললাম,—ভালোই তো। এদেশের পটভূমিতে কিছু লিখুন না।

—বলছেন! আসলে দেশের সঙ্গে তো কোনো সংযোগ নেই। আজকাল যাইও না যদি কথা দেন ভালো পাবলিশার ছাপবে তাহলে লিখতে পারি।

ভদ্রলোক বললেন,—আচ্ছা। ওঁকে বাড়িতে ডাকো। এভাবে ভিড়ের মধ্যে কথা হয় না আপনি কোথায় উঠেছেন?

—কুইন্সে।

—অ! আমি থাকি লঙ আইল্যান্ডে। এই নিন। কার্ডের দ্বিতীয় নাম্বারে ফোন করলে এলা নিয়ে আসবে।—ভদ্রলোক কার্ড দিলেন।

—ধন্যবাদ।

—মুশকিল কি জানেন, এখনকার লেখকরা প্রবন্ধ লেখেন না। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু লিখতে না থাকলে জাতির সাহিত্যের উন্নতি হয় না।

—ও।

মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা সুনীল গাঙ্গুলির থেকে আপনি বয়সে বড়ো, না? মানে লেখা যখন পড়েছি তখন সুনীলবাবু লিখতেন না। আমি যখন এদেশে আসি তখন ওঁর নীরা বের হচ্ছে।

সরে এলাম। সমরেশদা, সমরেশ বসু পৃথিবী থেকে চলে গেছেন প্রায় সতেরো বছ

পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াররা আমেরিকায় বসে সেই খবর তো রাখেনই না, আমাকে সমরেশ বসু ভাবতে পারেন স্বচ্ছন্দে, কিন্তু একজন বাংলাদেশি দোকানদার, রেস্টুরেন্টে চাকরি করা মানুষ, কখনোই এই ভুল করবেন না। এটা সত্যি ঘটনা।

মনে পড়ছে, আমার পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে বইমেলায় এক সভায় এসে সমরেশদা বলেছিলেন,—আমার আগে যদি সমরেশ নামের কোনো লেখক থাকতেন তাহলে আমি সুরথ নামে লিখতাম, সমরেশ নামে লেখার সাহস হত না। সমরেশ সাহসী, তাই সাফল্য পেয়েছে।

আজ সমরেশদা বেঁচে থাকলে কী বলতেন?

জানুয়ারি ২০০৬

ব্যঙ্গ-সংস্কৃ

ইউরোপ-আমেরিকায় জানুয়ারির রাত্রে যে বরফ পড়ে তা গললে কলকাতার রাস্তায় এক কো জল দাঁড়িয়ে যেত। কলকাতার এক কোমর জল যদি ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি অবধি স্থির হ দাঁড়িয়ে থাকত, গঙ্গায় জল যদি সেই উচ্চতায় উঠে আসত তাহলে তিন-তিনটে মাস কলকাত চেহারা কেমন দাঁড়াত? এক, মিছিল হত না। রাজনৈতিক দলগুলো বেকার হয়ে যেত। দুই, সরকা অফিসে মাসের উনত্রিশ দিন মশা-মাছি ঘুরে বেড়াত। এক তারিখে জল ভেঙে ভিজে ভিজে কর্মচারী যেত মাইনে নিতে। মাইনে দেওয়ার দায়িত্ব যাঁদের ওপর তাঁরাও একই পথ ধরলে বিক্ষোভ হত মাইনে পাওয়া মাত্র আবার একমাস ডুব। তিন, গাড়ির ইঞ্জিন জলের তলায় থাকত বলে অল্পবয়সি কলকাতাতে ভেনিস ভাবার চেষ্টা করত। চার, আমদানি বন্ধ হওয়ায় বাজারে কিছুই পাওয়া যে না। কালোবাজারি চলত। পাঁচ, মহামারি দেখা যেত। ছয়, বিদ্যুৎ এবং খাবার জলের অভাব দে দিত। সাত, কলকাতার মানুষ পালাত।

অথচ ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে যখন ইউরোপ, আমেরিকায় তুষারপাত শুরু হয়, তাপমাত্রা নে যায় মাইনাস দশে, তখন পাঁচ মিনিট আপাদমস্তক মুড়ে খোলা জায়গায় দাঁড়ানো প্রচণ্ড কষ্টকর ওই ঠান্ডা কলকাতায় পড়লে তিনদিনে জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ কমে যেত। ধরা যাক, হিমাল একটু খাটো হয়ে গেল। উনত্রিশ হাজার ছশো ফুটের পাহাড়টা কুড়ি হাজারে নেমে এল, নেপাল ভুটান, উত্তরবঙ্গ তো বটেই, কলকাতার ময়দানে তুষারপাত হত।

কিন্তু কলকাতায় যখন তাপমাত্রা দশ ডিগ্রিতে নামে তখন আমাদের শরীর লেপের আশ্রয় চায় ওদেশে তার থেকে কুড়ি ডিগ্রি কমে গেলে জীবনযাপন অস্বাভাবিক করা চলবে না। হ্যাঁ, বাড়ি ভেতর না হয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ঠান্ডাকে আড়াল করে রেখেছে, কিন্তু বাইরে পা দিলেই...

এবার শীতের সময় কৌতূহল হল। কী করে ওরা সামলাচ্ছে? সারারাত বরফ পড়লে রাস্তা গাড়ি চলবে কী করে? জানলার ওপাশে নিরাপদে দাঁড়িয়ে দেখলাম, এক ঘণ্টা অন্তর বরফ সরানো গাড়ি এসে রাস্তা পরিষ্কার করে যাচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে সেই বরফ স্তূপ হয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ প আর একটা গাড়ি এসে সেই স্তূপ তুলে নিয়ে গেল। জানলাম সারারাত এই কাজটি করে যান ওঁরা রাত বাড়লে ঠান্ডাও বাড়ে। কিন্তু লোকগুলো যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়। নইলে পরের দিন কোনে গাড়ি রাস্তায় বেরুতে পারবে না। ধরা যাক, গঙ্গার জলের উচ্চতা কলকাতায় জমা জলের নিচে ভাবা যায়, আমাদের কর্মীরা সারারাত পাইপ দিয়ে সেই জল গঙ্গায় ফেলার ব্যবস্থা করে যাচ্ছে রাতের পর রাত?

পরের সকালে গৃহকর্তাকে দেখলাম আপাদমস্তক মুড়ে, দস্তানা পরে বেলচা নিয়ে অনেক চেষ্টায় সদর দরজা খুলে প্যাসেজের বরফ সরাচ্ছেন। ওই প্রচণ্ড ঠান্ডায় পরিশ্রম করতে দেখে অবাক হয়ে বঙ্গসন্তানকে প্রশ্ন করলাম, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে। কেন করছ?

সে জবাব দিয়েছিল, অসুস্থ হলে বিনা পয়সায় হাসপাতালে চিকিৎসা হবে। ইনস্যুরেন্স আছে। কিন্তু নিজের বাড়ির প্যাসেজ থেকে এই বরফ না সরালে পুলিশ এসে একশো ডলার ফাইন করবে। দেশের টাকায় সাড়ে চার হাজার টাকা। বুঝলে!

অর্থাৎ সরকার তোমাকে একটা সভ্য জীবনযাপন করার জন্যে যা দরকার তা দেবে কিন্তু তার বদলে তোমাকেও কিছু করতে হবে। ওই বরফ তোমার বাড়ির সামনে স্তূপ হলে কেউ ফুটপাত দিয়ে হাঁটতে পারবে না। অতএব তোমার বাড়ির সামনেটা পরিষ্কার রাখা তোমার কর্তব্য। তুমি নিশ্চয়ই গান শুনতে পারো, কিন্তু পাশের বাড়ির লোক যেন বিরক্ত না হয়। বাড়ির পাশে খালি জমি আছে বলে সেখানে ম্যারাপ বেঁধে মেয়ের বিয়ে দিয়ে জায়গাটাকে নোংরা করার কোনো অধিকার তোমার নেই। তোমার বুকে ব্যথা হলেই ফোন করো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অক্সিজেন নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স এসে যাবে, কিন্তু তোমাকে প্রয়োজন মেটাবার জায়গাগুলোতে লাইনে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলা মানতে হবে।

এখন এই পশ্চিমবাংলায় এমন কথা কীরকম রূপকথার মতো মনে হয়। আমাদের পাড়ায় রাস্তায় জল জমে থাকলে আমরা কর্পোরেশনকে গালাগাল দিই, পাড়ার সবাই একসঙ্গে হাত মিলিয়ে জল সরাই না। পাতালরেলের স্টেশনে নেমে হুড়মুড়িয়ে দৌড়াই যাতে আগে বেরুতে পারি। টিকিট পাঞ্চ না হলে টপকে যাই অনায়াসে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে জলবিয়োগ করতে একটুও সংকোচ হয় না। পুজো কিংবা যে-কোনো উৎসবে মাইক বাজাই প্রাণপণে। কার হার্টে কত ব্যথা বাড়ন্ত কে তার তোয়াক্কা করে! আর ফুটপাথ ঘিরে ম্যারাপ বাঁধা, এ তো আমার জন্ম-অধিকারে পড়ে। আমরা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না। কিন্তু দল বাঁধি নিরাপত্তার জন্যে। আবার সেই দলে কেউ মাথা তুলেছে দেখলেই খেয়োখেয়ি করি। একটা ব্যাপারে খুব মিল আছে, আমরা যে-কোনো কারণেই হোক সরকারকে গালাগাল করে সুখ পাই।

আসলে এই দেশটাকে নিজের দেশ ভাবতে পারছি না আমরা। মুসলমান শাসন, ইংরেজ শাসন বোধহয় এই না ভাবতে পারার কারণ। এই দুই শাসনকালে আমরা মনে মনে বিরূপ হয়েছি, কোনো ভালো কাজে অংশ নিলে ভেবেছি শাসকদের সাহায্য করা হবে। আমরা এই মাটিতে থেকেছি, কিন্তু দেখেছি এর ওপর আমদের কোনো অধিকার নেই। আর সেটা না থাকলে মনে মমত্ব জাগে না। স্বাধীনতার জন্যে যাঁরা ঘর ছেড়েছিলেন, দেশকে মা বলে বন্ধনমুক্ত করতে চেয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা শতকরা পাঁচ ভাগও নয়। বাকি পঁচানব্বুই ভাগ হয় দর্শক হয়ে থেকেছি নয় শাসনকর্তাদের অনুগ্রহ পাওয়ার চেষ্টা করেছি। অন্য প্রদেশগুলোকে অবজ্ঞা করেছি, তাদের অধিবাসীদের অবজ্ঞা করেছি অনায়াসে। নিজেদের প্রদেশের মানুষকেও শ্রদ্ধা করিনি। দোখ্‌নে, মেদেনিপুরিয়া ভূত, বাহে—ইত্যাদি শব্দের পাশাপাশি কলকাত্তাইয়া শব্দটি চালু ছিল, যা ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ করা হত, সেই সঙ্গে ঘটি-বাঙাল বিভাজন তো ছিলই।

ব্রিটিশ আমলে কোনো বিক্ষোভের সময় সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে আমাদের আনন্দ হত। কেমন জব্দ করলাম ব্রিটিশদের! সেই একই অভ্যেস কংগ্রেসি আমলে ট্রাম-বাস পোড়ানোতে রয়ে গেল। যেন লক্ষ লক্ষ টাকার ট্রাম-বাস পুড়িয়ে সরকারকে জব্দ করলাম। ওগুলো যে আমাদের কাছ থেকে কর বাবদ আদায় করা হবে, তা আর ভাবার দরকার কী! মনে আছে উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষ যখন এদেশে এসে যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে, তাঁদের বাসস্থান নেই, খাদ্য নেই, শিক্ষার সুযোগ দূরের কথা, তখন শুধু কোনোমতে এদেশের মাটি আঁকড়ে নতুন করে বাঁচার চেষ্টা। ফলে বিশৃঙ্খলা আসবেই। সেসময় একজন এদেশীয় বয়স্ককে বলতে শুনেছিলাম—গেল, সব গেল! এরা নিজের দেশ ছেড়ে এদেশে এসে দিন-রাত ভাববে আমাদের পুকুর ছিল, জমি ছিল। আমরা দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। ফলে পশ্চিমবঙ্গকে কখনোই নিজের দেশ বলে ভাবতে পারবে না। ইংরেজরা আরও ধনী হতে এই দেশ শোষণ করেছে, এরা প্রাণরক্ষা করার জন্যে পশ্চিমবঙ্গকে শোষণ করবে।

কথাটা কি আংশিক সত্যি ছিল না? প্রথম প্রজন্মের মানুষ যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন এই দেশের সঙ্গে মানাতে পারেননি। হাহুতাশ করেছেন অনেকেই ফেলে আসা মাটি-জলের দণ্ডকারণ্য, আন্দামান তো বটেই, কলকাতার বাইরে জমি জবর দখল করে কলোনি তৈরি হয়েছিল তাঁদের। একমাত্র ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব তাঁদের আবেগ প্রকাশের মাধ্যম ছিল। কিন্তু ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনিরা ওই হাহুতাশ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন চটপট। তবু পশ্চিমবঙ্গের বাঙাল-বাড়ির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করতে চাননি দীর্ঘকাল।

মনে রাখতে হবে, স্বাধীনতার পর পর আমাদের দেশাত্মবোধক গান গাইতে হত, স্কুলে, অনুষ্ঠানে। চিন আক্রমণের সময় তো রেডিয়ো খুললেই সেই গান। কিন্তু ওগুলোর নব্বুইভাগ পরাধীন আমলে। ডি এল রায় বা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বেশিদিন ওইসব গানে পরের প্রজন্মকে রাখতে পারেননি। 'গঙ্গা আমার মা' বা ওই ধরনের গানের বয়স কত হল? কত মানুষ ওই শুনে দেশপ্রেমী হয়েছেন? উলটে আমার তো দারুণ কথা সুর এবং গায়কের তৈরি একটি অ গান বলেই মনে হয়েছে।

সত্যিটা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। কয়েক দল মানুষ আমাদের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব নি কিন্তু তাতে আমাদের সম্মতি আছে কি না তোয়াক্কা না করে। আমরাও এই ব্যবস্থা মেনে নি এইসব মোড়লরা সারা বছর চ্যাঁচায়, জনগণের জন্যে দরদ দেখায়, কিন্তু সেটা যে কুমিরের তা আমাদের জানা। তাই শক্তিশালী দলটিকেই চোখ বুঁজে ভোট দিই। ভাবি, না দিলেও তো জিতবে। আমরা মোটামুটি যে যার নিজের মতো বেঁচে থাকতে চাই। কোথায় কী হচ্ছে তা সমালোচনা করতে খুব রাজি আছি, কিন্তু আঁচ এড়িয়ে।

তাই রাস্তায় জল জমলেও আমরা ঘুমাব, বরফ পড়লে তো কথাই নেই।

ফেব্রুয়ারি ২০০৬

রবীন্দ্রনাথের প্রেম

মধ্যচল্লিশে পা দিতে না দিতেই রবীন্দ্রনাথ বিপত্নীক হয়েছিলেন। স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী ছিল তা নিয়ে কিছু বিপরীত কথা বাতাসে এখনও ওড়ে। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলো কতখানি প্রেমপত্র আর কতখানি অভিভাবকের কলমে লেখা তা নিয়েও বিতর্ক আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যখন কয়েকটি সন্তানের পিতা তখন মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে দূরত্ব নিশ্চয়ই তেমন ছিল না।

স্ত্রী মারা গিয়েছেন। রেখে গিয়েছেন সন্তানদের। এই অবস্থায় এই সেদিন আগেও পুরুষরা বিয়ে করতেন। কারণ দেখাতেন, সন্তানদের মানুষ করতে হবে। অর্থাৎ একজন গভর্নেসকে চাকরি দিলে তাকে মাইনে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিনা মাইনের মহিলা এল সংসারে, যে সন্তানদের মায়ের মতো যত্ন নেবে আবার তাকেও বিছানায় সেবা করবে। একশো বছর আগে স্ত্রী বেঁচে থাকতেই যখন পুরুষরা আবার বিয়ে করত, আর মরে গেলে কথাই নেই, তখন রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিয়ের পিঁড়িতে বসলেন না। কিন্তু কেন?

ওই বয়সে রবীন্দ্রনাথের যেসব ছবি দেখেছি তাতে বিয়ের বাজারে ভালো চাহিদা হওয়ার কথা। সুপুরুষ, সুস্বাস্থ্যবান, জামাই—যিনি ইতিমধ্যে বিখ্যাত, তাঁর কয়েকটি সন্তান থাকলে কী এমন দাম কমত? এ ব্যাপারে পক্ষে এবং বিপক্ষের কারণগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাক।

এক—স্ত্রী চলে যাওয়ার পর সন্তানদের মানুষ করার দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ নিজে নিতে চেয়েছিলেন। শুধু নিজের সন্তান নয়, জোড়াসাঁকোর অনেক বালককিশোর তখন রবীন্দ্রনাথের স্নেহের ছায়া পেয়েছিল। কাউকে বিয়ে করে এনে ওই দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ তাঁর ওপর চাপাতে চাননি।

দুই—তখন শান্তিনিকেতনের অবস্থা খুব খারাপ। টাকার জন্যে হন্যে হতে হচ্ছিল রবীন্দ্রনাথকে। দেনাও হয়ে গিয়েছিল। শান্তিনিকেতনে যেতে-আসতে সময় লাগত খুব। তাছাড়া জমিদারি ছিল। রবীন্দ্রনাথ বিয়ের ব্যাপারে ভাবার সময় পাননি।

তিন—একবার বিয়ে করার পর স্ত্রীর সঙ্গে সংসার করার সাধ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের। চিরকালই তাঁর মধ্যে যে বৈরাগ্য বাস করত সে যেন স্ত্রীর মৃত্যুতে হঠাৎ মুক্তির স্বাদ পেয়ে গেল। নতুন করে আর বন্ধনে জড়াতে আগ্রহী হলেন না তিনি।

চার—চিরকাল রবীন্দ্রনাথ এমন এক নারীর সন্ধান করে গেছেন যিনি তাঁর রোমান্টিকতাকে স্পর্শ করবেন। সেই আশা থেকে শুরু করে নতুন বৌঠান, কেউ সেই নারী হতে পারেননি। কেউ উচ্চারণ করতে পারেনি, পথ যদি বাঁধে বন্ধনহীন গ্রন্থি, আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী। ক্রমশ তিনি সম্পর্কের গ্রন্থিগুলো বন্ধনহীন করার দিকে ঝুঁকলেন।

পাঁচ—সে সময় গৌরীদান প্রথা চালু ছিল। চোদ্দোর মধ্যে বিয়ে না দিলে মেয়ের বাবা সমাজ রক্ষকদের কোপে পড়তেন। মেয়ে অরক্ষণীয়া হয়ে যেত। তাই রবীন্দ্রনাথ যদি বিয়ে করতে চাইতেন তাহলে তাঁকে ওই বয়সের পাত্রী নির্বাচন করতে হত। বয়সের ব্যবধানের জন্যে

সেটা সম্ভব ছিল না। তিরিশ-পঁয়ত্রিশের অবিবাহিতা মহিলা ডুমুরফুল ছিলেন। কি
বিয়ে করেননি, সারাজীবন অবিবাহিতা থেকেছেন, তাঁরাও রাজি হতেন কি
হলেও একাকিনী মহিলার মানসিকতা রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষে যেত। যেসব বি
ওই বয়সে ছিলেন তাঁরা পনেরো-ষোলো পেরিয়ে যেতেই আর বিয়ের পিঁড়ির কথ
না। প্রকৃত সত্য হল, বিয়ে করতে চাইলে পাত্রী পাওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে

ছয়—রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর বিপুল ভক্তদের উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। গুরু
বিয়ে করছেন—একথা প্রচারিত হলে প্রচুর বিদ্রূপ সহ্য করতে হত।

সাত—বিয়ে আবার না করলেও রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রেম এসেছিল। কিন্তু সেই
মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে হেঁটে গিয়ে প্রেমিকার দর
নাড়া অসম্ভব ছিল। আর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ভক্ত এবং আত্মীয়দের
রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনো মেয়ে প্রেম নিয়ে পৌঁছতে পারত না।

আট—ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে তাঁর নিভৃত প্রেম সম্ভব হয়েছিল বিদেশ বলেই। ম
হবে, তাঁর শরীরের বয়স তখন ষাট। অবিবাহিত সুভাষচন্দ্র বিদেশে গিয়ে
বিয়ে করেছিলেন, বিয়েটা তাঁর প্রয়োজনও ছিল। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সেটা স

মার্চ ২০০৬

দাদাঠাকুর

প্রত্যেক মাসে পত্রপাঠ-সম্পাদকের কাছ থেকে দুটো ফোন আসে। প্রথমটায় তিনি আমাকে জানিয়ে দেন তাঁর আগামী সংখ্যা কী বিষয় নিয়ে ভাবা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি আসে দিন পাঁচেক বাদে। তখন তাগাদা, কবে লেখাটা পাব? আমি তড়িঘড়ি করে সব লেখা সরিয়ে লিখতে বসি। এবারও তাই হল।

এবারের বিষয় দাদাঠাকুর। মানুষটির নাম এখনকার তিরিশের নিচের কতজন যুবক শুনেছেন জানি না। যাঁরা চল্লিশ পেরিয়েছেন তাঁরা মনে করতে পারেন ওঁর জীবন নিয়ে যে ছবি তৈরি হয়েছিল তার নামও ছিল দাদাঠাকুর।

ওঁর কাহিনী আমি জানতে পারি পিতামহের সংগ্রহে রাখা পত্রিকা এবং বই থেকে। সেভেন-এইটে পড়ি। সেটা ছিল গোগ্রাসে গেলার সময়। বাড়িতে নভেল-নাটক রাখার রেওয়াজ ছিল না। অমৃতবাজার পড়তেন পিতামহ, সেইসঙ্গে দেবজ্যোতি বর্মণের যুগবাণী। আমাকে তাই পড়তে হয়। বাধ্যবাধকতা ছিল না, কিন্তু লাইব্রেরি থেকে আনা সাপ্তাহিক বইটি একদিনেই যে শেষ হয়ে যায়। ফলে আলমারির দিকে হাত বাড়াই। বিরূপাক্ষর বই পড়ি। ওঁর আসল নাম যে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তা-ই জানতাম না অনেকদিন। আর তখন দাদাঠাকুর সম্পর্কিত তথ্যগুলো জেনেছিলাম। পড়তে গিয়ে বুনো রামনাথের কথা মনে এসেছিল। হাস্যরস সৃষ্টির নয়, সরল সাদাসিধে জীবনযাপনের জন্যে।

১৮৮১ সালে অজ পল্লিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যিনি, তাঁর মূল স্বভাব ছিল কৃচ্ছ্রসাধন। নগ্ন পদ, নগ্ন গাত্র, ক্বচিৎ ঊর্ধ্বাঙ্গে একখানি উত্তরীয়, পরনে আজানুলম্বিত ধুতি।—ওঁর জীবনীকার নলিনীকান্ত সরকারের এই বর্ণনা থেকে গান্ধীজির কথা মনে আসে। কিন্তু গান্ধীজির সর্বভারতীয় খ্যাতি ছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অবদানের জন্যে। মানুষ গান্ধী কীরকম ছিলেন তা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত অর্থাৎ দাদাঠাকুর সর্বভারতীয় খ্যাতি পাননি। তাঁর যা কিছু পরিচিতি তা ছিল এই বাংলায়। যদিও তিনি ইংরেজিতে ছড়া লিখেছেন প্রচুর এবং বলাই বাহুল্য, সবই হাস্যরসে ভরা। ত্রৈলোক্যনাথ অথবা বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরের পরে রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষমতা যে মাত্রায় পৌঁছেছিল তা সাহিত্যের মান বৃদ্ধি করেছে। দাদাঠাকুর ছিলেন আমজনতার জন্যে রসের ভাণ্ডারী। কথায় কথায় রসিকতা করতে পারতেন এবং সেই রসিকতায় ছুরি দুরের কথা একটা আলপিনও ছিল না। বাংলায় 'পান' লিখে বিখ্যাত শিবরাম চক্রবর্তীর গুরু বলে ওঁকে মেনে নেওয়া উচিত। পঞ্জিকায় একদিন রাস আর একদিন ঝুলন উৎসব, কিন্তু দাদাঠাকুরের মতে ও দুটো কলকাতায় রোজ হচ্ছে। কোথায় দেখলেন জিজ্ঞাসা করলে তাঁর স্বাভাবিক জবাব,—কেন? ট্রামে, বাসে। যেমন Rush তেমন ঝুলন।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত তিনটে কাগজ সম্পাদনা করেছিলেন। সেই মফস্সলে তো বটেই, কলকাতার

রাস্তায় তাঁকে সেই কাগজ বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে। মানুষের জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যা যা অসং তাকে আক্রমণ করতে তিনি একটুও কুণ্ঠিত হতেন না। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, ইংরেজদের শাসনব্য এবং পরাধীন ভারতের জন্যে তাঁর মনে যে যন্ত্রণা ছিল তার প্রকাশ প্রায়ই লেখায় ফুটে উঠে যেমন—

বাংগালিকা বাচ্চা
বুড়্‌ঢা জোয়ান কাচ্চা;
কোই নেহি হ্যায় সাচ্চা
মেরা লাটকা কানুন আচ্ছা!

শেষ লাইনটি যে ইংরেজ সরকারকে ব্যঙ্গ করে তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রে এরকম কবিতা না লেখার জন্যে তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হয়।

তখন কোনো কারণ না দেখিয়ে বিপ্লবীদের ধরে জেলে পোরা হত। দাদাঠাকুর লিখলেন

বেগর পরোয়ানা
মেরা সাথ সাথ আনা .
বরোবর জেহেলখানা
খাও সরকারী খানা।

অথবা সেই চারটে লাইন যা কিনা এখনও থানায় বড়বাবুরা বিশ্বাস করেন—

ভাতুয়া বাংগালী, মছলিখোর
টুট্ গিয়া অব তুহারা জোর
মেরা হাতমে কানুন কা ডোর
বানা দেউঙ্গা ডাকু চোর।

অফুরন্ত রসের ভাণ্ডারী দাদাঠাকুরের রচনাকে বাংলা সাহিত্যের মূল ধারায় গ্রহণ করা হয় হয়তো সমসাময়িক ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরতে তিনি এত ব্যস্ত থাকতেন যে সাহিত্যে মনোনিবেশ ক পারেননি। তিনি 'বিদূষক' শব্দটি ভারী পছন্দ করতেন। অমর কথাসাহিত্যিক তাঁকে 'বিদূষক শরৎ বলে সম্বোধন করলে তাঁর মুখ থেকে 'চরিত্রহীন শরৎচন্দ্র' বেরিয়ে আসতে দ্বিধা হয়নি।

আগেই বলেছি শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী। 'দেশ' পত্রিকায় 'অল্পবি কলম লেখার সময় প্রতিটি ছত্রে শিবরামের কলমে দাদাঠাকুরের উপস্থিতি অনুভব করেছি। মতোই শিবরাম আমৃত্যু রসের জোগান দিয়ে গেছেন। সময়ের কারণে অবশ্য শিবরাম অনেক আধুনি তাঁর গল্পগুলোতেও 'পানে'র ছড়াছড়ি।

শিবরামের পর হাসির গল্প-লেখকরা এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। ইন্দ্র মিত্র হিমানীশ গোস্বামীর লেখার কাল বেশ সীমিত। আমার বন্ধু সঞ্জীব এসেছিল, এসেই জয় করে কিন্তু সে সরে গেল দক্ষিণেশ্বরে। তারাপদ রায় একমাত্র লেখক যিনি লিখে যাচ্ছেন। কিন্তু প্র কানে আসে, স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করায় পুরোনো লেখা আবার তাঁর কলমে বেরিয়ে আসছে। এ মানি, হাসির লেখা দীর্ঘকাল ধরে লিখে যাওয়া সম্ভব নয়। শিবরাম পেরেছিলেন।

দাদাঠাকুর সব্যসাচী ছিলেন এ ব্যাপারে। কখনোই তাঁকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। তাঁর ক আর জিভ একসঙ্গে হাস্যরসের নতুন নতুন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছে।

এপ্রিল ২০০৬

ভোটায় নমঃ

রেসকোর্সে গেলে মাঝে মাঝেই ব্যাপারটা দেখা যায়। ধরা যাক, কোনো একটা রেসে বারোটা ঘোড়া দৌড়োচ্ছে। দৌড় শুরু হওয়ার আগে লোকে পছন্দমতো ঘোড়ার ওপর বাজি ধরে। কোন ঘোড়া জিতলে দশ টাকায় পনেরো টাকা পাওয়া যাবে, কোন ঘোড়া দশ টাকায় তিনশো দেবে। যে যার পছন্দমতো ঘোড়ার টিকিট কাটে। রেস হয়ে গেলে পছন্দের ঘোড়া জিতলে টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন একটা রেস হয় যখন কেউ জেতার টিকিট কাটতে চায় না। বারোটা ঘোড়ার একটির দর থাকে দশ টাকায় দশ টাকা। অর্থাৎ যা খেলবে তাই ফেরত পাবে। এক পয়সাও লাভ নেই। বাকি এগারোটা ঘোড়ার দর একশো থেকে তিন হাজার টাকা। যদি জেতে দশ টাকায় ওই টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু কেউ সামান্য ঝুঁকি নিজে রাজি হয় না। কারণ সবাই জানে ওই দশ টাকায় দশ টাকা ঘোড়াটিকে অন্য কোনো ঘোড়া হারাতে পারবে না। রেস হয়। ফলাফলও তাই হয়। প্রথম নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কে হবে তাই নিয়ে যেটুকু কৌতূহল। ফলে এরকম রেস মানুষকে উত্তেজিত করে না। যেখানে কোনো নাটক নেই সেখানে কে দর্শক হিসেবে বসে থাকতে চায়? তবু রেসকোর্সে মানুষ বসে। বসে পরের রেসের নাটকের জন্যে। সব রেসে তো ওইরকম ফেবারিট জেতে না।

পশ্চিমবাংলার নির্বাচন এখন ওই বিশেষ রেসটির মতো দাঁড়িয়ে গেছে। একটি শিশু অথবা একজন পাগলও জানে যে বামফ্রন্টই মেজরিটি পাবে, সরকার গড়বে। কংগ্রেস-তৃণমূল-বি জে পি ভোট যাঁরা দেন তাঁরা অভ্যেসে দেন এবং দিয়েই জানেন তাঁর ব্যালটের প্রার্থী জিতবে না। আজকাল অনেকেই ভোট দিতে চান না। কারণ দুটো, তাঁর দল সি পি এম তো জিতবেই। নয়, সি পি এম ছাড়া কাকে ভোট দেবেন? যেটুকু কৌতূহল তা হল, কে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হবে? তৃণমূল না কংগ্রেস? রেসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ঘোড়ার মতো।

হ্যাঁ, এবারের নির্বাচনেও সি পি এম ফেবারিট। রেসের ভাষায় ড্যাম ফেবারিট। সি পি এমের এজেন্টরা যদি বুথ থেকে বেরিয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, কোনো ক্যাডার যদি রাস্তায় না থাকে আর কংগ্রেস-তৃণমূলীরা যদি রিগিং করে ভোটের বাক্স ভরাবার সুযোগ পায় তাহলেও সি পি এম সরকার গড়বে। কারণ সি পি এম-বিরোধীরা ওই কুকর্ম করার জন্যে বেশি কর্মী খুঁজে পাবেন না।

অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, যা জনসাধারণের মতামতকে তুলে ধরে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে যারা সি পি এম-বিরোধী তাদের সি পি এম-কে ভোট না দিয়ে কোনো উপায় নেই। অথবা ভোট না দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে। সি পি এমের সমর্থক যদি সংখ্যায় কমও হয় তাদের ভোটে সি পি এম প্রার্থী জিতে যাবেন। এই অবস্থা তৈরি করেছেন সি পি এম-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোই।

ধরা যাক একজন সি পি এম-বিরোধী ঠিক করলেন বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দে কংগ্রেসের কথা মনে আসবে। তখনই তাঁর সামনে গত কয়েক বছরের কংগ্রসের ছবি (একটি দল, যার অস্তিত্ব নিয়েই সন্দেহ হয়, তাকে ভোট দেবেন কী করে? সোমেন প্রিয়রঞ্জন আর একদিকে। কেউ দিল্লির স্নেহ পেলে অন্যজন তাকে বিপদে ফেলতে চায় অধীর এত ক্ষমতাবান যে হাই কম্যান্ডের নির্দেশ উপেক্ষা করে কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে করিয়ে জেতাতে বদ্ধপরিকর। এই কাজের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়ার সাহস প্রদেশ কং যদি কংগ্রেসকে ঈশ্বর জিতিয়ে দেন তাহলে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে—এই প্রশ্নের উত্তর কারও যিনি হতে পারবেন না তিনি দলবল নিয়ে অন্য দলে চলে যেতে দ্বিধা করবেন না। গ কংগ্রেস কখনোই মানুষের কাছে যায়নি। এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থীর নাম অনেকেই জা নির্বাচনের আর কয়েকটা দিন মাত্র বাকি আছে (এই লেখার সময় অনুযায়ী)। এইরক দলকে ভদ্রলোকটি ভোট দেবেন কী করে?

তিনি তাকালেন তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। একা মমতা ব্যানার্জী লড়ে যাচ্ছেন বিরুদ্ধে। হাজার হাজার মানুষ তাঁকে সমর্থন করেছিল, নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছি সুভাষ বোসের পর আর কোনো নেতা এত জনসমর্থন পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু বছরে মানুষ ক্রমশ হতাশ থেকে আরও বেশি বিমুখ হয়ে গেছে মমতা থেকে। এ যে তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় আক্রান্ত হন, বিচার-বিবেচনা করে কাজ করার ধাত তাঁর নেই- বারংবার স্পষ্ট। এই মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দিচ্ছেন, বি জে পি-র সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধছেন, ছিঁড়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়ছেন। পরক্ষণেই নির্বাচনে হেরে আবার সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন। রাগের মাথায় লোকসভায় স্পিকারের দিকে কাগজ ছুঁড়ে ইস্তফা দিচ্ছেন। তাঁর দলে তিনিই শেষ কথা। যে শুনবে না তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। তঁ ডানহাত পঙ্কজ ব্যানার্জীকে কোনো নির্বাচনী সভায় দেখা যাচ্ছে না। হয়তো তাঁর সঙ্গে চিড় ধরেছে। তৃণমূলের কোনো নিজস্ব সংবিধান আছে কিনা কেউ জানে না। আজ ব্যানার্জী না থাকেন তাহলে দলও থাকবে না। এই দলকে ভোট দেবেন কী করে?

তৃতীয় দল বি জে পি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কখনোই ধর্মান্ধ নয়। বি জে পি-কে ক পাত্তা দেয়নি। ওখানে বি জে পি মাটি চাইছে তৃণমূলকে ধরে। ওদিকে সি পি এম মা কাছে বামফ্রন্ট। এদের সংগঠনশক্তি ঈর্ষণীয়। দু'বছর আগে থেকেই ওঁদের কর্মীরা মাথায় রেখে মানুষের কাছে পৌঁছে গেছেন। সেই পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা পর্যন্ত বি সাফল্য শুধু গায়ের জোরে পাওয়া যায় না। জ্যোতিবাবু সরে যাওয়ার পর বুদ্ধদেব ভট্টা হওয়ার পর সি পি এম সম্পর্কে যাদের দ্বিধা ছিল তাদের মন হালকা হয়েছে। এই বিদেশি শিল্পপতিদের ডেকে উন্নয়নের ব্যবস্থাই করছেন না, ইনি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ করতে পারেন অনায়াসে। ওঁর আমলেই মানুষ প্রথম শুনল সি পি এম মিছিল করছে 'বাংলার জল' গাইতে গাইতে। জ্যোতিবাবুর আমলে কেউ স্বপ্নেই ভাবতে পারত না। বাঙালির ঐতিহ্য, যা রবীন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া, তার সঙ্গে সি পি এম-কে একত্রিত করতে

অতএব এই ভোট কোনো উত্তেজনা তৈরি করতে পারছে না। সেই ড্যাম ফেবা ঘোড়ার মতো সবাই জানে ফলাফল কী হবে।

মে ২০০৬

রিমেক

রিমেক শব্দটার অর্থ যাই হোক চলতি ব্যবহারে মর্যাদা হারিয়েছে। রিমেক ক্যাসেট বা সিডির শিল্পীরা যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে পড়েন। হেমন্ত মুখার্জীর গান যখন হেমন্তকণ্ঠীরা পঁচিশ বছর আগে গেয়েছেন তখনও আমরা রিমেক শব্দটা ব্যবহার করিনি।

তখন হেমন্ত মুখার্জীর মতো কণ্ঠ, গাওয়ার ধরন প্রায় এক—এরকম শিল্পী বেশ কয়েকজন ছিলেন। তরুণ মজুমদারের "ভালবাসা ভালবাসা" ছবির সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখার্জী। গানও তাঁর গাইবার কথা। কিন্তু কোনো কারণে অথবা বয়সের জন্যে কণ্ঠ বশে না থাকায় তরুণ মজুমদার খুঁজে খুঁজে সেই গায়ককে নিয়ে এলেন, যিনি হেমন্তকণ্ঠী। তারপর বহুদিন চলে গেল, ভদ্রলোক গায়ক হিসেবে প্রায় একই জায়গায় থেকে গেছেন। তাঁর নতুন বাংলা গান জনপ্রিয় হলে কানে আসত।

ইন্দ্রনীল, শ্রীকান্ত প্রায় সেই রাস্তায় হাঁটছিলেন। 'রিমেকশিল্পী' শব্দটা ওদের আমল থেকেই এল। শুধু পুরোনো পুরুষ শিল্পীদের জনপ্রিয় গানই নয়, মহিলা শিল্পীদের গানও গাওয়া হল। গীতা দত্তের 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়' ইন্দ্রনীলের গলায় যতই ভালোভাবে ফুটুক, আমরা গীতা দত্তকে ভুলতে পারছি না। শেষপর্যন্ত এঁরা পুরোনো গান ছেড়ে নিজেদের নতুন গানে জনপ্রিয় হয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। অথচ এঁদের রিমেক গানগুলোর রেকর্ড করা হয়েছিল যখন তখন যন্ত্রপাতি আধুনিক ছিল না। এখন নতুন যন্ত্রের সাহায্যে রেকর্ড করা সেই গানগুলো আরও উজ্জ্বল হয়েছে। তা সত্ত্বেও পুরোনো গায়কদের ভোলার উপায় নেই।

সেটা আমাদের মতো প্রবীণরা বলছেন। তরুণ শ্রোতারা, যাঁরা পুরোনো রেকর্ড শোনেননি, তাঁরা ভাবছেন এটা ইন্দ্রনীল বা শ্রীকান্তের গাওয়া গান। গায়ক মৃণাল চক্রবর্তী আক্ষেপ করে বলেছিলেন—নিজের চল্লিশ বছর আগেকার গান একটা অনুষ্ঠানে গেয়ে শেষ করা মাত্র একজন চেঁচিয়ে বলল, ইন্দ্রনীলের গান গাইছেন কেন? নিজের গান নেই?

কলকাতায় বেশ কিছু শিল্পী বেঁচে আছেন রিমেক গেয়ে, যদিও তাঁরা প্রথম শ্রেণীর সম্মান পাচ্ছেন না। অন্যের গান গাওয়া যদি রিমেক হয় তাহলে পঙ্কজ মল্লিকের 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে' গানটি হেমন্ত মুখার্জীর গলায় 'রিমেক' বলা হল না কেন? রবীন্দ্রনাথের একই গান প্রচুর শিল্পী গেয়েছেন। সেই কনক দাসের গান, সায়গলের গান, পঙ্কজ মল্লিকের গান আমরা সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখার্জী, দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় শুনেছি। তার পরেও তো গাওয়া হচ্ছে। রবীন্দ্রসংগীতকে রিমেক বলা হচ্ছে না, অথচ সুবীর সেন, হেমন্ত মুখার্জীদের আধুনিক গান নতুন করে রেকর্ড করতেই রিমেক হয়ে গেল? 'রিমেক' শব্দটির অর্থ, কথা-সুর অক্ষুণ্ণ রেখে আবহ সংগীত নতুন করে তৈরি, আধুনিক

যন্ত্রের সাহায্যে আরও শ্রুতিসুন্দর করে তোলা। সেটা তো এখন কপিরাইট উঠে
রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রেও হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে না হলেও, কথাটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথের
দিনু ঠাকুরের সুরে তৈরি। গাইবার সময় কিন্তু আলাদা হয়ে গেল। সামান্য হলেও।
মল্লিকের যে গায়কী তার অনুসরণে এলেন হেমন্ত মুখার্জী, দ্বিজেন মুখার্জী, তরুণ
সুবীর সেনেরা। সায়গলের ঘরানায় চিন্ময় চ্যাটার্জীরা। আবার দেবব্রত বিশ্বাস তৃতীয়
দিলেন। একই গান এক-এক ঘরানার শিল্পীর গলায় একটু অন্যরকম শোনাল। আধুনিক গা
মূলত দুটো ভাগ। এক, সুধীরলাল চক্রবর্তী, যাঁর অনুসারী শ্যামল মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্য
মুখোপাধ্যায়রা। দ্বিতীয়টি হেমন্ত মুখার্জীর ঘরানা। ওই, দ্বিজেন মুখার্জী, তরুণ বন্দ্যোপাধ
সেনেরা।

রবীন্দ্রসংগীতের চর্চা বেড়ে যেতে প্রতিষ্ঠানগত ঘরানা দেখা গেল। যেমন দক্ষিণীর
গান শুনলেই বোঝা যায় তাঁদের শিক্ষা কোথায়। গীতবিতানের ছাত্রছাত্রীদের গানই তাঁদের
পরিচয়।

আবার আমাদের এখানে কিছু শিল্পী আছেন যাঁরা বাজার-চালু রবীন্দ্রনাথের গান গ
করেন না। টপ্পাঙ্গের এবং বিরল গাওয়া গানগুলো তাঁরা গাইতে পছন্দ করেন। সুবিনয়
শুরু হয়ে আশিস ভট্টাচার্য পর্যন্ত এই আলাদা রুচির গান আমরা শুনেছি। সব গানই
কেউ তার বাইরে যাননি। তবু কেমন যেন আলাদা। এবং কোনোটাকেই তো রিমেক

সাহিত্যে রিমেক প্রথা চালু আছে? না। পাঠকরা সেটা ক্ষমা করবেন না বলে হয়
কোনো শক্তিশালী লেখক রবীন্দ্রনাথের "তিনসঙ্গী"র গল্পগুলো পড়ে মনে করলেন, গল্প
হয়নি। এখন কপিরাইট নেই। তবু তিনি ওই গল্পগুলো নতুন করে লিখতে পারছেন
সেটা অবিমিশ্র নিজের সম্পত্তি হবে না বলে, না হয় গালাগাল খাওয়ার ভয়ে। কিন্তু কে
যিনি চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে লিখছেন, তাঁকে এই সুকর্মটি করতে দেখা গেছে। চল্লিশ
নিজের লেখা একটি গল্প, আজ তিনি নতুন করে লিখলে আমাদের বলার কিছু ছিল
বছরে তাঁর ভাবনার কীরকম পরিবর্তন হয়েছে তার নিদর্শন আমরা পেতে পারতাম।
সেই গল্পটি স্রেফ টুকে নতুন গল্প হিসেবে ছাপতে দিচ্ছেন। সম্পাদকের পক্ষে এত
লেখাপড়া সম্ভব নয়। তিনি সানন্দে ছাপছেন। যখন কোনো স্মৃতিধর পাঠক পত্রাঘাত
লেখকের কাছে ছুটে যান সম্পাদক। লেখক বুদ্ধদেব-মার্কা হাসি হেসে বলেন,—তে
এখনও শিশুই থেকে গেল হে! চল্লিশ বছর আগে ওই গল্প যিনি পড়েছেন তিনি তো
হাবড়া। গত কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে কোনো পাঠক পড়েনি। তাদের কাছে তো গল্পট

হ্যাঁ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই রিমেক বলা যেতে পারে। তবে গানের ক্ষেত্রে
শিল্পীর কথা চাপা থাকে না, এ ক্ষেত্রে বলা হয় না—গল্পটি পুনর্মুদ্রিত।

এ ছাড়াও আছে। চিলির কোনো লেখকের স্প্যানিশ উপন্যাস, শিকাগোর কোনো পত্রি
ইংরেজি গল্প বাংলায় লিখে নিজের বলে অনেকেই চালিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত এব
বাঙালি লেখকও আছেন।

শ্যামলদা, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা খেলা ছিল। যখনই বোঝেন কোনো পাঠক
লেখা পড়েনি, তখনই খেলাটা খেলতেন। গম্ভীর মুখ করে বলতেন,— আপনি আমার
মাঝি' পড়েননি?

লোকটি ঘাড় নাড়ত,—না।

—'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু—মানে—লুকিয়ে লুকিয়ে পড়েছি। ফাটাফাটি!

লোকটি মাথা নেড়েছিল। সে চলে গেলে শ্যামলদা হেসে বলেছিলেন,—দ্যাখ, আজ একসঙ্গে কতগুলো উপন্যাস লিখে ফেললাম!

আচ্ছা শেখর, তোমার পত্রপাঠ কি রিমেক? অচলপত্রের? হঠাৎ মনে হল। অচলপত্রের অনেক লেখকই তো এই কাগজে লিখছেন। মেজাজটাও সেরকম করতে চেয়েছ। শুধু দীপ্তেন সান্যালকে পাওনি। প্ল্যানচেটে ওঁকে ধরে একটা সংখ্যা সম্পাদনা করিয়ে নাও, পত্রপাঠ অচলপত্রের রিমেক হয়ে যাবে।

জুন ২০০৬

স্ত্রীয়াশ্চর্

'মহিলা' শব্দটির মধ্যে আটকে থাকতে রাজি নয় এমন একজন স্পষ্ট জানাল, 'না মশাই, মহিলা শুনলে অস্বস্তিতে ভুগি। মনে হয় গায়ে পড়ে সম্ভ্রম জানাচ্ছে, একটু দূরে ঠেলে দিচ্ছে। চেয়ে মেয়ে বললে স্বস্তিতে থাকি।

তাকে বললাম,—সাধারণত ঘনিষ্ঠদের মেয়ে বলাটাই রেওয়াজ। অল্পবয়সিদের মেয়ে ক অসুবিধে হয় না। কিন্তু বছর চল্লিশের সদ্য পরিচিতাকে মেয়ে বলতে জিভ আড়ষ্ট হয়। তি পছন্দ করবেন বলে মনে হয় না।

—আপনারা কি সদ্য পরিচিত কোনো লোককে পুরুষ বলে উল্লেখ করেন?

—না। করি না।

—ঠিক। তখন সমীহ করলে ভদ্রলোক বলেন, নয়তো লোক। তাই না?—সে হা —ভদ্রলোকের জায়গায় ভদ্রমহিলা বলছে, কিন্তু লোকের স্ত্রীলিঙ্গ কী হবে? স্ত্রীলোক?

—তাই তো হয়!

—ব্যবহার করেন শব্দটা? করেন না। একটু প্রাচীন লেখক যখন লেখেন, স্ত্রীলোকটি ভি করিতেছিল, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না তিনি একটি নিচু শ্রেণীর মানুষের কথা বলছেন, য ভদ্রমহিলা বলতে অসুবিধে হয়েছে তাঁর।—সে বলল।

ব্যাপারটাকে কখনোই তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এতকাল শুনে এসেছি ছেলেদের পু ভদ্রলোক, লোক, ছেলে অথবা ব্যাটাছেলে বলে চিহ্নিত করতে। পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করেছি ব্যাটা মানে ছেলে, তাহলে ব্যাটাছেলে বলা হয় কেন? পিসিমা হেসে বলেছিলেন,—ওতে বেশ জোর শোনায়। ব্যাটাছেলে, মেয়েছেলে।

—মেয়েছেলে মানে? মেয়ে তো স্ত্রীলিঙ্গ আর ছেলে পুংলিঙ্গ। তাহলে মেয়েছেলে শব্দটায় লিঙ্গ এক হয়ে যাচ্ছে না?

—জানি না যা!—পিসিমা সরে গিয়েছিলেন।

আবার ব্যাটাছেলে শব্দটি তাচ্ছিল্য করার সময়ও ব্যবহার করা হত। 'ব্যাটাছেলের মাথায় এ ফোঁটা ঘিলু নেই।'

ছেলে যদি পুংলিঙ্গের পরিচায়ক হয় তাহলে 'ছেলেমানুষ' কেন? ছেলেবেলা বা শৈশব অ ব্যবহৃত হয় কেন? তাহলে ছেলে কি অল্পবয়সিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? সেক্ষেত্রে পাত্রী উপযুক্ত হ পাত্রীর বাবা তার জন্যে ভালো ছেলে খোঁজেন কোন্ যুক্তিতে? বোঝা যাচ্ছে, ইংরেজিতে মিস্ট অথবা মাস্টারের যে স্পষ্ট পার্থক্য আছে বাংলায় তা নেই। যে যার ইচ্ছেমতো শব্দ ব্যবহার করেছে বাংলা ভাষা শিখতে চান যাঁরা তাঁরা অবশ্যই ধন্দে পড়েন। মিস্টার অথবা মাস্টারের প্রতিশব্দ য শ্রীযুক্ত অথবা শ্রীমান হয় তাহলে প্রশ্ন ওঠে, হঠাৎ শ্রী-এর দরকার কেন পড়ল? ম্যান, মেন, ব

গাই—এগুলো ইংরেজি ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তারা খুব নির্দিষ্টভাবে পুংলিঙ্গের অবস্থান নির্ধারণ করে, বাংলায় যেটা সম্ভব হয়নি। হয়নি গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে।

যে বলেছিল মহিলা শব্দটির মধ্যে সম্ভ্রম এবং দূরত্ব মিশে আছে সে একটু ভুল বলেছিল। মহিলাতেই যদি ওসব মিশে থাকে তাহলে ভদ্রমহিলাতে নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু মিশে থাকবে? দেখা যাচ্ছে, যে মহিলার আচরণ শোভন, সংযত, মার্জিত এবং শিক্ষিত অথবা অভিজাত তিনি অবশ্যই ভদ্রমহিলা। মধ্যবয়সি থেকে শুরু করে ষাট পর্যন্ত বয়সের অপরিচিতাকে মহিলা বলাই রেওয়াজ। মহিলা পকেটমার বলেও কাগজে লেখা হয়। 'ভদ্রমহিলা পকেটমার' কোথাও দেখিনি। ষাট পেরিয়ে গেলে বৃদ্ধা মহিলা যেমন বলা হয় বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা কিন্তু তেমন ব্যবহার করা হয় না।

'যুবতী' শব্দটিও কিছুটা চালু। বাসের ধাক্কায় যুবতীর মৃত্যু, হেডলাইন হয়। সাধারণত আঠারো থেকে তিরিশের মধ্যে যার বয়স তাকে যুবতী বলা হত। কিন্তু এখন যৌবন যখন মহিলারা পঞ্চাশ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তখন এই বয়স পর্যন্ত কেন তাঁদের যুবতী বলা হবে না—এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে। আবার যুবকের ক্ষেত্রেও একই কথা। ষাট বছরের পুরুষ দিনরাত পরিশ্রম করছেন যখন তখন তাঁকে ষাটেও যুবক বলে প্রশংসা করা হয়।

আমাদের দেশে বাংলা ভাষা জন্মাবার পর যে টালমাটাল কাণ্ডটা চলেছিল তাতে মেয়েরা একটু পেছনে থেকে গেছেন, সন্দেহ নেই। এত কালে, এই দেড়শো বছর আগেও মেয়েদের 'মাগী' বলা হত। ওই সময়ের এবং পরের সময়েও মেয়েদের মাগী বলতে লেখকের কষ্ট হয়নি। বিদ্যাসাগর মশাই স্ত্রীকে মাগী বলেছেন। এখন বানান-বিপ্লবের হিড়িকে ই-কার ঈ-কার সব একাকার হয়ে গেছে। সুতরাং অনায়াসে 'মাগি' লেখা যায়। মাগি মানে প্রার্থনা করা। তোমার কাছে এ বর 'মাগি'। জানি না মাগিভাতা শব্দটা সেখান থেকে এসেছে কি না। আজ কোনো মেয়েকে যদি মাগি বলে ডাকা হয় তাহলে প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবলে শিহরিত হতে হবে। গ্রামাঞ্চলে 'মাগী' শব্দটি মেয়েমহলে আদর এবং ব্যঙ্গার্থে আজও প্রচলিত আছে।

মাগীর পরে এল মেয়েছেলে, মেয়েমানুষ। আজকের মেয়েরা এই শব্দ দুটোতে অসম্মানিত বোধ করেন। শব্দ দু'টির মধ্যে অবহেলা বড্ড বেশি পরিমাণে জড়িয়ে আছে। বাসের কন্ডাক্টর চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে বলেন,—রোককে! মেয়েছেলে নামবে।—মহিলার যত বয়স হোক চুপচাপ নেমে যাবেন। লেডিস সিটে যে পুরুষ ঘুমন্ত তাকে জাগিয়ে আনন্দিত দাঁড়িয়ে থাকা সহযাত্রী বলছেন,—আরে মশাই, উঠুন, মেয়েছেলে দাঁড়িয়ে আছে যে।

যিনি বসবেন, ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারলেন না—দয়া করে মেয়েছেলে বলবেন না।

মধ্যবিত্ত বাড়ির মহিলা এখনও দুঃখ করে বলেন,—কী করব, শালওয়ালা মেয়েছেলে বলে আমাকে ঠকিয়ে নিয়ে গেল।

তাঁর মেয়ে প্রতিবাদ করে,—মেয়েছেলে বোলো না তো। মেয়েছেলে আবার কী? কক্ষনো নিজেকে মেয়েছেলে বলবে না।

—কী বলব?

—মহিলা বলবে। মেয়ে জানিয়ে দিল।

'মেয়েমানুষ' শব্দটি কেমন করে ভদ্রপাড়া থেকে লালপাড়ায় চলে গেল জানি না। মেয়েমানুষ বললে কেউ আর বালিকা বলে মনে করে না। ছেলেমানুষ কিন্তু বালকের মাথার ওপরে ছাদ তৈরি করে। আমরা ছেলেবেলা বলি, মেয়েবেলা বলা হত না। সম্প্রতি মেয়েবেলা শব্দটা চালু হয়েছে সত্যি, খারাপ লাগছে না। কিন্তু মেয়েবেলা মানে শৈশব আর শৈশব আর বাল্যের নারীর দিন বলে চিহ্নিত হচ্ছে না। মেয়েবেলা সম্পূর্ণভাবে নারীর নারী হয়ে ওঠার দিন থেকে যে সময়ের শুরু সেই সময়কেই বোঝাতে পারছে।

পুরাণে বর্ণিত স্বর্গে যাঁরা অবস্থান করেন অথবা সেখানে যাঁদের নিত্য যাওয়া-আসা তাঁদের বা মেয়ে অথবা মেয়েছেলে বলার কোনো চল নেই। তাঁরা দেবী অথবা অপ্সরা। তাঁদের যেহেতু ধোঁয়াশে এবং তাঁদের শরীরে বার্ধক্য আসবে না, তাই লিঙ্গে স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বলা হয়নি কোথাও। দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের সময় সমুদ্রের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে যেসব মহিলা তাঁদের গ্রহণ করেননি দেবতারা, অসুররাও। জল থেকে জন্ম বলে নাম দেওয় অপ্ (জল) সরা। অর্থাৎ এঁরা নারী বা মহিলা নন, শুধুই অপ্সরা। এঁরা গন্ধর্বদের সঙ্গে থা নাচ-গানের কারণে, কিন্তু দেবতাদের প্রয়োজন মেটাতে হত হুকুম হলেই। দেবতারা এঁদের পাঠাতেন মুনিদের ধ্যান ভাঙিয়ে বিপদমুক্ত হতে। এঁরা মর্ত্যে গিয়ে পৃথিবীর পুরুষদের সঙ্গ গর্ভবতী হয়ে সেখানেই সন্তান প্রসব করে ফিরে যেতেন স্বর্গে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনো এমন ঘটনা খুঁজে পাইনি যেখানে দেবতাদের দ্বারা অপ্সরা গর্ভবতী হয়েছে। তার মানে এ যে দেবতারা অপ্সরাদের ছায়া মাড়াতেন না। খুঁটিয়ে দেখলে একটা তথ্য খাড়া করা যেতে শরীরে মর্ত্যের রক্ত না থাকলে স্বর্গের কোনো দেবী গর্ভবতী হতে পারতেন না। দুর্গা স্বর্গের নন, বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ি দুটোই মর্ত্যে, লক্ষ্মী-সরস্বতীর শরীরে মায়ের রক্ত থাকা স সন্তান হয়নি। এদিকে প্রমাণ করা হচ্ছে যে ওঁরা দুর্গার সন্তানই নন। ইন্দ্রের স্ত্রী শচী বা ই সন্তান আছে। কিন্তু তিনিও মর্ত্যের পুলোমার মেয়ে।

অর্থাৎ স্বর্গে নারীদের নিয়ে একটা জগাখিচুড়ি নিয়ম চালু ছিল (আছে)। এই নিয়ম মর্ত্যে ও কিন্তু বারংবার দেখা যাচ্ছে মর্ত্যের নারী স্বর্গের দেবীর থেকে অনেক বেশি স্বাধীন, অনেক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়েছেন এখন।

এই কিছুদিন আগে মহিলাদের সম্মান জানানোর জন্যে 'দেবী' বলে সম্বোধন করা হত। নিজের নামের পাশে পিতা বা স্বামীর পদবি না লিখে দেবী লিখতেন। প্রভাবতী দেবী, নি দেবী, অনুরাধা দেবীর মতো বিখ্যাত লেখিকা থেকে শুরু করে আজকের মেয়েদের স্বাধীনতার যিনি সবচেয়ে বেশি লিখেছেন সেই আশাপূর্ণা 'দেবী' লিখতে পছন্দ করতেন। মহাশ্বেতা ভট্টাচ চেয়ে মহাশ্বেতা দেবী বেশি পরিচিত, গৃহীত।

সাত-আট দশক আগে যাঁরা জন্মেছিলেন, ভাবনা-চিন্তায় যাঁরা অত্যন্ত আধুনিক তাঁরা দেবী নামের পাশে ব্যবহার করে হয়তো নিরপেক্ষ হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আজকের মেয়েদের ন পাশে দেবী ব্যবহার করতে বললে হেসে উড়িয়ে দেবে। তারা জবাব দেবে—দূর, দেবী বল রক্ত-মাংসহীন কাচের মূর্তি কথা মনে আসে। আমি দেবী হতে যাব কোন্ দুঃখে? আমি তো মাংসের মানুষ!

জুলাই ২০০৬

লেখকের দুর্দিন

কয়েকদিন আগে এক বন্ধু বললেন,—'দেহপট সনে সকলি হারায়' বলে এতদিন জানতাম, কিন্তু সেটা যে সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা জানতাম না।

হেসে বললাম,—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—

বন্ধু হাত তুললেন,—আপনি কি কলেজস্ট্রিটে ঘোরাঘুরি করেন?

—মাঝেমধ্যে।

—তাহলে যে-কোনো বড় দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন কোনো ক্রেতা এসে রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' অথবা 'যোগাযোগ' কিনতে চায় কিনা? কেউ এসে বলে কি, আমাকে 'রামের সুমতি' দিন? কিংবা ক'জন বলেন, এক কপি 'আরণ্যক' চাই! এঁদের সবার গ্রন্থাবলি বা সংকলন এখনও ভালো বিক্রি হয়। স্কুল-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত লেখকদের বেঁচে থাকার পেছনে সলিড কারণ, ছাত্ররা তাঁদের পড়তে বাধ্য হয়।

কিন্তু পালটা প্রশ্ন করি,—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে টেনিদা ছাড়া ক'জন মনে রেখেছেন? হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, বিমল কর প্রয়াত হওয়ার পর এঁদের বই-এর বিক্রি আশ্চর্যজনকভাবে কমে গেছে। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, জীবিত অবস্থায় যিনি বাংলা সাহিত্যে রাজার মতো বিচরণ করে এসেছেন, মৃত্যুর পরে তাঁর বই-এর বিক্রি কীরকম, খোঁজ নিয়েছেন?

—আপনি সমরেশ বসুর কথা বলছেন?

—তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আর কে রাজা হতে পারেন!

—ওঁর 'শাম্ব' এখনও ভালো বিক্রি হয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে জীবিত অবস্থায় সমরেশদা আনন্দ পাবলিশার্স থেকে যে টাকা পেতেন, এখন তাঁর উত্তরাধিকারীরা তার অনেক বেশি পাচ্ছেন।—খবরটা দিলাম।

—তার মানে আপনি বলতে চাইছেন এখন সমরেশ বসুর বই বেশি বিক্রি হচ্ছে?

—না। বিক্রির কথা বলিনি। সমরেশদার জীবিতকালে বই-এর যা দাম ছিল, এখন সেটা বহুগুণ বেড়ে গেছে। একটা 'দেখি নাই ফিরে'র রয়্যালটি তখনকার দিনের পনেরোটা বই বিক্রির সমান। ওভাবে হিসেব করা চলবে না।—বললাম।

বন্ধু একটু ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে।

—ধরুন পুজোর সময় আপনি আনন্দবাজারে উপন্যাস লিখবেন। আনন্দবাজার তার জন্যে নিশ্চয়ই টাকা দেবে?

হেসে ফেললাম,—অবশ্যই।

—উপন্যাসটা কি আনন্দবাজারের সম্পত্তি হয়ে যাবে?

—না। ওঁরা শুধু ওঁদের কাগজের বিশেষ সংখ্যায় ছাপাবেন।

—এবার বই করার সময় প্রকাশকের সঙ্গে কী চুক্তি হয় আপনাদের?

—বেশিরভাগ প্রকাশকের সঙ্গে কোনো চুক্তি হয় না। একেকজনের মৌখিক কথাবার্তা হয়। আনন্দ পাবলিশার্স ইদানীং চুক্তি করছেন। কত বই ছাপা হবে এবং বিক্রি হলে তার কত পাব তা লিখিতভাবে স্থির হয়। আমি মারা গেলে ওই বই-এর উত্তরাধিকারীর নামও হয়। প্রত্যেক বছরের শেষে বিক্রির হিসেব ওঁরা দিয়ে যাবেন। প্রাপ্য টাকা পেতে অসুবিধে হ জানা যায়।

—এটা আনন্দ পাবলিশার্সের ক্ষেত্রে হচ্ছে। অন্যদের বেলায়? ওঁরা কত বই ছাপছেন তা অ কি জানতে পারেন?—বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন।

—না। জিজ্ঞাসা না করলে নিজে থেকে বলেনও না।

—সেকি? বই কত ছাপা হচ্ছে আপনারা জানতে পারেন না?

—জানতে চাইলে অবশ্যই বলবেন ওঁরা—হয় এগারোশো নয় বাইশশো। তেমন বই হলে হাজার। আগে একসঙ্গে বেশি বই ছাপালে খরচ কমে যেত। এখন আধুনিক মুদ্রণ-ব্যবস্থায় দরকার পড়ছে না।—বললাম।

—ধরুন ওঁরা বললেন এগারোশো ছাপাবেন। সত্যি বলছেন কিনা বুঝবেন কী করে?

—বিশ্বাস। অন্ধভাবে নির্ভর করা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

—আছে। শুনেছি একজন বিখ্যাত লেখক নাকি প্রকাশককে বই ছাপাতে দিতেন কিন্তু ম মলাট নিজে অন্য প্রেস থেকে ছাপিয়ে আনতেন। প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকাশক তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নিয়ে বই বাঁধাতে দিতেন দপ্তরিকে। এতে লেখক হিসেবটা পেয়ে যেতেন, কত বই হচ্ছে।—বন্ধু বললেন।

—যে গোরু দুধ দেয়, তার লাথি গোয়ালা সহ্য করে। যে লেখকের কথা বললেন, তাঁর ম সময় এক কি দু'জন লেখক বাধ্য হয়ে ওই শর্ত মেনেছেন। এখন তাঁর পড়তির সময়ে, যখন বাড়ির সামনে প্রকাশকদের লাইন পড়ল না, তখন লেখক আর মলাট ছাপার জন্য ব্যস্ত না।—জানিয়ে দিলাম আমি।

—বেশ। কত বই ছাপা হচ্ছে আপনি তার প্রমাণ পাচ্ছেন না। কত বই বিক্রি হচ্ছে। প্রকাশকদের দেওয়া হিসেব থেকেই জানতে পারছেন?

—হ্যাঁ।

—ওঁরা তো জল মেশাতে পারেন।

—পারেন।

—ধরার কোনো উপায় নেই?

—নেই। সন্দেহ হলে বই তুলে অন্য প্রকাশককে দেওয়া যেতে পারে। সেটা হবে ফুটন্ত ে কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া। সব এক।

—সর্বনাশ!

—বিখ্যাত লেখক শংকর সঠিক কথা বলেছিলেন। লেখক-প্রকাশক সম্পর্ক অনেকটা স্ত্রীর মতো। বিয়ের প্রথম কয়েক বছর ডগমগ অবস্থা বলে, পরে দু'জনের জগৎ আলাদা হয়ে প্রথম প্রথম যখন বই ভালো বিক্রি হয়, তখন প্রকাশক লেখকের মন রেখে চলেন। তার হাসলাম আমি।

—এরকম কোনো অভিজ্ঞতা আছে?

—বিস্তর। আমার একটি বই প্রথম বছরে মাত্র ক'মাসে সাড়ে তিনহাজার কপি বিক্রি হ

প্রকাশকই জানালেন তার পরের বছর, গোটা বারোমাসে বিক্রির পরিমাণ মাত্র আটশো কপি। অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—এটা কী হল?

উনি বললেন,—কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে বাংলাদেশের পাইরেটদের চক্রান্ত। ওরা তো দেদার ছাপে ওখানে, তাই সস্তায় পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে।

—তাই যদি ভাবেন তাহলে পুলিশের কাছে যান! ব্যবস্থা নিন।

—পুলিশের কাছে কেউ মুখ খুলবে, কেউ খুলবে না।—প্রকাশক বললেন।

বন্ধু শ্বাস ফেললেন,—ব্যাপারটা দাঁড়াল এরকম, আপনার বই প্রকাশক ছাপছেন, কিন্তু কত কপি ছাপছেন বা বিক্রি করছেন তা আপনি জানতে পারছেন ওঁর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী। তিনি আকাশবাণী যা করছেন তা-ই আপনাকে মেনে নিতে হবে। তাই তো?

—ঠিকই।

—প্রকাশকদের আপনি সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলে মনে করেন?

—যতক্ষণ সম্পর্ক ভালো থাকছে, ততক্ষণ।

—কীরকম?

—একটা ঘটনা বলি। তখন আমার বই একজন বিখ্যাত প্রকাশক ভালো বিক্রি করছেন। আমার খাতিরই বেড়েছে। এক বিকেলে কলেজস্ট্রিটে তাঁর অফিসে যেতেই তিনি আপ্যায়ন করে বসতে বললেন। দেখলাম বিখ্যাত লেখক নিমাই ভট্টাচার্য বসে আছেন। প্রকাশক জিজ্ঞাসা করলেন,—সমরেশবাবু, চা বলি? আমি মাথা নাড়তে তিনি চায়ের হুকুম দিতে পাশের ঘরে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলাম,—কেমন আছেন নিমাইদা?

সুদর্শন 'মেমসাহেবে'র লেখক মাথা নাড়লেন,—ভালো না ভাই। বিক্রি কমে এলে লেখকদের কেউ পাত্তা দেয় না। এই দ্যাখো, ঘণ্টাখানেক আগে এসেছি, প্রকাশক একবারও জিজ্ঞাসা করেননি—চা খাব কিনা! তুমি ঘরে ঢুকতেই তিনি...

হাসলেন নিমাইদা,—কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল রেখো। একদিন দেখবে এদের কাছে তুমি আমার ভূমিকায় চলে গেছ।

—তাহলে বলতে হবে এটা একেবারে হিটলারী ব্যবসা। প্রকাশকের কাজের ওপর লেখকদের নির্ভর করতে হবে। আপনাদের যখন এই অবস্থা তখন তরুণ লেখকরা তো আরও জলে।—বন্ধু বোধহয় কূল পাচ্ছিলেন না।

বললাম,—সেখানে একটা ব্যাপার আছে। বিভিন্ন কাগজে লিখে পরিচিত হয়েছে, এমন তরুণ লেখকের বই গড়ে চার-পাঁচশোর বেশি বছরে বিক্রি হয় না। আর একটা বই ছাপার পেছনে যা খরচ হয় তা ফেরত পেতে অন্তত ন'শো বই বিক্রি হওয়া দরকার। সেই পরিমাণ বিক্রি হওয়ার পর প্রকাশক লেখককে তাঁর প্রাপ্য দিতে পারেন। প্রথম বছরের চার-পাঁচশো কপি বিক্রির পরে তরুণ লেখকের মনে হয় প্রকাশক তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করছেন। খবরটা চাউর করেন তিনি। সম্পর্ক খারাপ হয়। একবার তো সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রকাশকের দোকানের সামনে ধরনা দিয়েছিলেন। তাঁর বই যে সামান্য বিক্রি হয়েছে, এটা মানতে রাজি ছিলেন না তিনি।

—তাহলে? বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন।

—আমার একটা বই বেরিয়েছিল একত্রিশ বছর আগে। তখন ভাড়া বাড়িতে থাকতাম ট্রামে-বাসে অফিসে যেতাম। গত কুড়ি বছর ধরে আমি গাড়িতে ঘুরছি। নিজের বাড়িতে আছি। বড়ো ক্লাবের মেম্বার হয়েছি। টাকাপয়সার কথা ভাবতে হয় না। এটা সম্ভব হয়েছে, কারণ প্রকাশকেরা টাকা দিচ্ছেন বলে। তাঁরা প্রচুর টাকা মেরে দিয়েও যা দিচ্ছেন তাও দিব্যি চলে যাচ্ছে যখন, তখন আর মাথা খাটিয়ে কী হবে? তেমন বুঝলে একজন প্রকাশকের কাছ থেকে বই তুলে নিয়ে আর একজনকে দিই। এ-ই চলুক।—বললাম।

—আপনার কথা শুনে মনে হল, আনন্দ পাবলিশার্সের ওপর নির্ভর করেন। কেন? কেন, কি অন্য প্রকাশকের মতো প্রতারণা করতে পারে না?—বন্ধু জিজ্ঞাসা করল।

বললাম,—কলেজস্ট্রিটের এখন সব প্রকাশনাই মালিকানাভিত্তিক। কোথাও কোথাও এ শেয়ার হোল্ডার মালিক থাকলেও প্রত্যেকে হাতে-কলমে ব্যবসা দেখেন। ফলে ব্যবসার তথ্য তাঁরা প্রয়োজনে গোপন করতে পারেন। আনন্দ একটি লিমিটেড কোম্পানি, যা পরি হয় কর্মচারীদের মাধ্যমে। পয়লা বৈশাখ ছাড়া মালিকদের দেখা যায় না। কলেজস্ট্রিটের প্র শিল্পের মান ওঁরা একাই বিশ্বমানের সমতুল্য করেছেন। বছরের শেষে ওঁদের পাঠানো স্টে কোনো ত্রুটি পাইনি আজও। বোঝাই যায়, গোপনীয়তার পথে ওঁরা হাঁটতে নারাজ। একটা পরি দিলেই সেটা বোঝা যাবে। আমার একটি ট্রিলজির দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব আনন্দ থেকে বেরি দ্বিতীয় পর্বটি লাখ কপি বিক্রির মুখে। তৃতীয়টি হাজার। অথচ প্রথম পর্বটি, যা অন্য প্রকাশনা বেরিয়েছে, তা এখনও ছেচল্লিশে। বিশ্বাস করতে হচ্ছে, প্রায় তিপান্ন হাজার লেখক প্রথম পড়ে দ্বিতীয় পর্ব পড়ছেন? আনন্দ যদি আমাকে জানতেন, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্বের বিক্রি ছড়ায়নি—তাহলে আমি সেটাই বিশ্বাস করতাম। কিন্তু সেটা ওঁরা করেননি। করেন না বলেই স্টেটমেন্ট পাওয়া মাত্র টাকা তুলে নেন না। তাঁরা জেনে গেছেন, টাকা ঠিক থাকবে।

—বন্ধু বললেন,—যাক, শেষপর্যন্ত একটু স্বস্তি পেলাম।

আগস্ট ২০০৬

শাদি কা লাড্ডু

বিয়ের আগে যদি চোখের মিলন হয় এবং সেই দু'জোড়া চোখ মনে ঢেউ তোলে তখন পৃথিবীটা নস্যাৎ করার মতো শক্তি বুক জুড়ে থাকে। কোনো উপদেশ, কোনো আদেশ তখন দুটো কান গিলতে চায় না। শয়নে, স্বপনে, হাঁটনে এমনকী টয়লেটে বসেও শুধু তার কথা ভাবা। ভাবনার সারাংশ—কবে পাব তাকে!

গত পঞ্চাশ বছর ধরে এইসব প্রেমিক-প্রেমিকাদের অধিকাংশই শেষপর্যন্ত জেদ বজায় রাখতে পেরেছে। আত্মীয়স্বজন যাঁরা বিরূপ ছিলেন, শেষপর্যন্ত গিলতে বাধ্য হয়েছেন নবদম্পতিকে। হয় ঘটা করে বিয়ে দিয়েছেন, নয় সইসাবুদ করা বিয়ে মেনে নিয়েছেন।

বিয়ের পর শরীরের গন্ধ আর মনের উত্তাপ নিতে নিতে দু'জনে যখন সংসারসমুদ্র মন্থন করছেন তখন পরিবারের অন্যান্যরা যেমন গরল তুলে আনছেন, এক দুই ফোঁটা অমৃত যে ওঠেনি তা নয়। গরলের পরিমাণ বেড়ে গেলে বছর খানেকের মধ্যে আলাদা না হয়ে পারা যায় না। তখন কর্তা নতুন ফ্ল্যাটে শুধু কপোত-কপোতী, দিন-রাত হাড়ুডু খেলা। কাবাবমে হাড্ডি বলতে ঠিকে ঝি। তবে বাঁচোয়া, যে চলে যাওয়ার জন্যে।

বিয়ের পর মাসের পর মাস মধুর মধুর মুহূর্ত। তখন বউ-এর গলায় শঙ্খ ফুটলেই গান বলে মনে হয়। এই হাসিটার কোনো জাগতিক সমস্যার খবর বেচারা জানে না। তাই পদে পদে স্বামীর বুক ঘেঁষে জেনে নেওয়া। 'ওটাকে কী বলে গো। ও মা তাই! তুমি জানো।' স্বামী তার বিপুল জ্ঞানরাশি জানাবার জন্যে সদাই উন্মুখ। পাড়ার এক তরুণ 'বউদি বউদি' করছে ক'দিন। বউ বলল,—জানো, নোটন ঠাকুরপো এসেছিল।

—কখন?

—দুক্কুরে।

—দরজা খুলে ভেতরে আসতে দিয়েছিলে?

—না। তুমি বলেছ কাউকে দরজা খুলবে না। তারপর খুলব? কী গো তুমি?তোমার কোনো কথা আমি অমান্য করব?

—কী বলে সে?

—বড়বাজারে নাকি খুব ভালো আমসত্ত্ব পাওয়া যায়।

—সর্বনাশ—স্বামী গম্ভীর।

—কেন গো?

—আমসত্ত্ব সেক্সের প্রতীক। কাল থেকে জানলাও খুলবে না।

—তাই?

—হুঁ। লোটন তোমার দুক্কুর ঠাকুরপো হতে চায়। —স্বামীর উপদেশ। সেই উপদেশ ত এর কাছে আদেশ।

দিনকয়েক আগে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যেতে হয়েছিল একটি আর্টক্যাম্প উ ভিক্টোরিয়ার চারপাশ দিয়ে বহুবার গাড়িতে গিয়েছি, গাড়ি নিয়ে গেট পেরিয়ে ভেতরে এই ভেতরে ঢুকে গাড়িতে বসে অবাক হয়ে দেখলাম বড়ো বড়ো ছাতি গাছের নীচে ফুলের মতো আছে। যেন বড় মাপের কালো ফুল ফুটে আছে ভিক্টোরিয়ার বাগানে।

অবাক হয়ে গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে এগোতেই একজন সামনে এসে দাঁড়াল,-আপনি কি একা?

—কেন?

—মানে পরে কি দিদির আসার কথা?

—না তো!

—তাহলে আর কেন ওদিকে যাচ্ছেন?

—ওই ছাতির মেলা কেন তা দেখতে চাইছি।

—লজ্জা দেবেন না। মাত্র বত্রিশটা ছাতি। এক-একদিন তো একশো ছাড়িয়ে যায়।

—সেকি? কেন?—আমি অবাক।

—এখানে ছাতির খুব ডিম্যান্ড। পার ঘণ্টা ছোটো ছাতি কুড়ি, বড়ো ছাতি তিরিশ।

—আশ্চর্য! আকাশে মেঘ নেই, রোদ্দুরে তেজ নেই, তবু ছাতির কেন দরকার? এই কাদের দরকার হয়?

লোকটি অবাক হয়ে তাকাল,—আপনি এখানে কখনো আসেননি?

—না।

হাসল লোকটা,—সংসারটা করার আগে ছেলেমেয়েরা নিজেদের যাচাই করে নিচ্ছে। ওই এই ছাতার তলে যে দিদিভাই তিনি এই নিয়ে চারবার মনের মানুষ বদলেও মন ঠিক করতে না।

—বুঝলাম। কিন্তু ছাতা কেন?

—ছাতা আড়ালের জন্যে। ছোট ছাতার আড়ালে মুখ ঢাকা যায় দু'জনের। বড়ো ছাত শরীর আড়ালে থাকে। এটা আগে ছিল না। আমি চালু করেছি। তবে একা নিতে পারি না, ত শেয়ার দিতে হয়।

—বড় ছাতার আড়ালে তো যা ইচ্ছে তাই করা যায়।—আমি ভাবতে পারছিলাম ন

—যায়ই তো। করেও। প্রকাশ্যে তো করছে না। আড়ালে করছে।

—তাহলে এত শত ছাতা সব আপনার?

—আজ্ঞে। একটা-দুটো করে কিনতে কিনতে এতগুলো হয়ে গেছে। ভয় হয়, অন্য কে এই ব্যবসায় ঢুকে পড়ে!—লোকটি সরে গেল।

মনে পড়ল, আমাদের তরুণ বয়সে কলকাতায় সাধারণ মানের অনেক রেস্টুরেন্ট ছিল পরদাঘেরা কেবিন থাকত। সদ্য প্রেমে পড়া ছেলেমেয়েরা সেই পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পৃথিবীটা তাদের। সেসময় একটু আঙুলের ছোঁয়া পেলেই শরীরে কাঁটা ফুটত। কিন্তু বসাম কেবিনের প্লাইউডের পার্টিশনের ফুটোগুলোয় গোঁজা কাগজ সরে গিয়ে লোভী চোকের তারা করে উঠত। সেই অবস্থায় প্রেমিকরা আর এগোতে পারত না। ছাতা সেই সমস্যা দূর

এ তো গেল বাইরের কথা। ভেতরের গল্প? সেইসব সোনাঝরা সংলাপ মনে পড়ছে-

যদি ডাকো তাহলে সারাজীবন আমি গাছতলাতেও থাকতে পারি।' 'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভোলে না মোরে।' 'পতি পরম গুরু।' 'সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য।' এসব শুনলে বুক বর্ষার নদী হয়ে যাওয়ার কথা। কালীঘাটের পাট পুরুষ লাথি মারছে স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী তার চুল দিয়ে মুছে দিচ্ছে স্বামীর পায়ের জল। তুমি আমার মাধবী রাত, আমার কৃষ্ণচূড়া।

শুরুটা যখন এইরকম তখন দশ বছর কি পনেরো যেতে না যেতে ছবিটা বদলে যায় কী করে?

তখন স্বামীর গলার স্বর ক্রমশ মিনমিনে হতে থাকে, স্ত্রীর গলার পরদা চড়ছে।

ইতিমধ্যে দু-একপিস বাচ্চা এসে গেছে। সংসার সামলে বাচ্চা বড়ো করে স্ত্রী রাত্রে যখন চোখের দুটো পাতা এক করতে চান তখন সন্ধেবেলায় আড্ডা মেরে আসা ফুরফুরে স্বামী যদি আদর জড়ানো হাত বাড়ান তখন আপনা থেকেই দাবড়ানি বেরিয়ে আসে গলা থেকে— আঃ। আমাকে কি ভেবেছ তুমি? তোমার সংসারে সারাদিন ঝি-গিরি করে আবার এই রাত্রে তোমার খিদে মেটানো?—সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক স্বামী থিতিয়ে গিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন।

এইসময় থেকেই স্বামীদের মধ্যে একটু লুকিয়ে কিছু করার ইচ্ছে জাগ্রত হয়। দুপুরে অফিস কেটে বিয়ার খাওয়া। সদ্য পরিচিতার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে একটু লালায়িত হওয়া, তেমন সুযোগ পেলে অফিসের ট্যুরে যাওয়ার সময় বান্ধবীকে নিয়ে বাইরে গিয়ে একটু চনমনে হতে বড় সাধ জাগে। কিন্তু এটা যে অপরাধ এবং স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তা জানা থাকায় ভুলেও বাড়িতে কর্তৃত্ব ফলাতে চান না। স্বামী সব কথা মেনে নিচ্ছে জেনে স্ত্রীর শাসনক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। স্ত্রী বাড়ির বাইরে যায় কোনো আত্মীয় অসুখ বা শ্রাদ্ধের খবর পেলে, কারও বিয়ের নেমন্তন্ন এলে। স্বামীর যদি সেখানে যেতে ইচ্ছে নাও করে তবু মনে মনে গালাগালি দিতে দিতে মুখে হাসি এনে স্ত্রীর পেছন পেছন যেতে হয়। এই যাওয়ার কারণে তিনি স্বচ্ছন্দে হোলনাইট অফিসে থাকতে হবে বলে বন্ধুদের সঙ্গে একরাত তিনতাস খেলতে পারবেন।

এইসময় থেকে স্ত্রীদের ভেতর সাজগোজে অনাস্থা জন্মায়। এলোমেলো হয়ে থাকা, তেল চকচকে মুখ, পুরুষদের আকর্ষণ করা কোনো বাসনা তাদের থাকে না। বিশেষত যারা বাইরে যায় না, নিতান্তই সংসারী। অথচ ওদের চেয়ে বয়সে বড়ো অফিসে কাজ করা মেয়েদের শরীর সৌন্দর্যচর্চা অব্যাহত বলে স্বামীরা জুল জুল করে চেয়ে ভাবে আমার বউটা কী ব্যাকডেটেড!

এইসময় ঝগড়া-বিদ্রোহ ছাড়াছাড়ি যে হয় না তা নয়। কিন্তু বুদ্ধিমানেরা জানে পরিণতি কী! তাই তারা ভান করে।

স্ত্রীর গোলামের অভিনয় যাঁরা ভালো করতে পারেন তাঁরাই পারেন ঘোমটার আড়ালে খ্যামটা নাচতে।

নভেম্বর ২০০৬

জীবিত মানুষে

'দেশ' ১৩৮৪ সালে যা লিখেছিলাম :

দেখতে দেখতে চৌত্রিশটা বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু কী আশ্চর্য, আমি কখনও কোনো মরে যেতে দেখিনি। কেউ মারা যাচ্ছেন এবং আমি তার শয্যার পাশে খুব দুঃখী হয়ে বসে এই অভিজ্ঞতা আমার এখনও হয়নি। অথচ এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা, যে-কোনো মুহূর্তে যেতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ তা না ঘটছে আমি নিজেকে খুব সুখী মনে করি। মৃত্যুকে আমি করি অন্যের মাধ্যমে। শুনেছি ওই সময় কেউ কিছু বলতে চেষ্টা করেন, কেউ যন্ত্রণায় টুকরো হন, কেউ চুপচাপ চলে যান। আমার বিশ্বাস, সেই অসহায় মুহূর্তটুকুতে মানুষ বড় সৎ হয় এবং এইরকম সৎ মানুষকে আমি কখনোই দেখতে চাই না।

আমরা এখন এমন একটা সময়ে বসবাস করি যখন কোনো মানুষ সৎভাবে জীবনযাপন পারে না। বলে নেওয়া ভালো সততার সংজ্ঞা নিয়ে মতভেদ থাকলেও আমি প্রচলিত ধারণ এখানে ব্যবহার করছি। সকাল থেকে রাত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগোতে হয় এইসব ঘটনা রামের সুমতির যুগে ঘটত না। খুব সরল, জীবনকে দুধের মতো দেখা, সংসারে বৈরাগী বৈরাগী ভাব, মেয়েদের সম্পর্কে উদার নির্লিপ্তি—এইসব মৃতপ্রায় সৎ মানুষগুলোকে দাহ করা হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে এঁরা বেশ বড়রকমের জায়গা নিয়ে বসে এইসব প্রায়মৃত সৎ মানুষগুলোর বাজারে বেশ ডিমান্ড আছে। তেমন তেমন লেখকরা এঁদের করে সেই বাজার গরম রাখেন। বেলাকোবার এক সাধুর পায়ের ধুলো খেলে সন্তানলাভ হয় লক্ষ যুবতী যখন সেখানে হামলে পড়েন তখন তাঁদের স্বামীদের অবস্থাটা ভাবুন। বাজার বাংলা উপন্যাস এইসব যুবতীদের নিয়ে এখনও বেশ মজায় আছে।

আমি উপন্যাস পড়ছি কুড়ি বছর হল। মায়ের আলমারি থেকে চুরি করা সেই উপন্যাস শ্রীকান্ত। হাবুডুবু খেয়েছিলাম পড়তে পড়তে। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্ট ভয়ানক খারা গিয়েছিল। রাজলক্ষ্মীর কথা ভাবতে ভাবতে জীবনে প্রথম মুখে ব্রণ বেরিয়েছিল। কী আশ্চ কুড়ি বছর ধরে সেই শ্রীকান্তকেই ঘুরে ফিরে দেখে যাচ্ছি।

আমি জন্মেছিলাম দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় এক বসন্তের দুপুরে। জায়গাটা ছিল উত্তরবাংলা পাহাড়ি চা-বাগান। সেখানে যুদ্ধের গন্ধ নিশ্চয়ই গিয়েছিল, ছোঁয়া লাগেনি। অবশ্যই আমার এবং বালককাল অদ্ভুত শান্তভাবে কেটেছিল। মুশকিলটা করে দিলেন শরৎচন্দ্র। শ্রীকান্ত প কোনো ফ্রকপরা ডাঁটো মেয়ে দেখলেই রাজলক্ষ্মীর কথা ভেবে নিতাম। বাড়িতে দেশ পত্রিকা হঠাৎ দুপুরে অঙ্ক কষার ভান দেখিয়ে পাশের বাড়ির মেয়েটিকে নায়িকা করে গল্প লিখে এ এক পাতার, লিখে দেশ পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম। সে লেখা এখনও ফেরত পাইনি। কি চেপে গেল মাথায়। বাড়ির বদলে স্কুলের ঠিকানায় পাঠাতাম লেখাগুলো। তারপর একদি

মাস্টারমশাই ডেকে পাঠালেন। টেবিলে সেই ঝকঝকে মলাটের পত্রিকাটি। মালা সিনহা বুক উঁচিয়ে হাসছেন। ক্লাস এইটের ছাত্রকে প্রথম এবং সেবারের মতো স্কুল থেকে তাড়ানোর হুমকি দিয়ে হেডমাস্টার ছুঁড়ে ফেলে দিলেন কাগজটা। ছুটির পর সেটাকে হাতিয়ে নিয়ে বাড়ির ছাদে বসে ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা লক্ষবার পড়েছিলাম। কাগজটার নাম ছিল চিত্রবাণী। মালা সিনহাকে কী ভালোই না বেসেছিলাম। তারপর লিখছি যা ফেরত আসছে দ্রুত। পিয়নের সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল। এই করতে করতে কলকাতায় চলে এলাম একদিন।

এই সময় আমি তারাশঙ্করকে আবিষ্কার করলাম। পাশাপাশি সমরেশ বসু এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলো আস্তে আস্তে কেমন জোলো হয়ে গেল। মনে মনে বুঝতে পারছিলাম আমি কেমন পালটে যাচ্ছি। জীবনের ভাঙাচোরা মানুষগুলো আর তাদের অন্ধকার দিকটা আমাকে বড় আকর্ষণ করতে লাগল। ঠিক এই সময়ে আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে এঁদের অনেকের দেখা পেয়ে গেলাম। একত্রিশে ডিসেম্বরের শীতল মধ্যরাত্রে ময়দানের নিঝুম রাস্তায় ঘোড়ার গাড়িতে বসে তিনটি বেহেড মাতাল অ্যাংলো রমণী চিৎকার করে কাঁদছিল। আমার বিদেশি বন্ধু সহিসের পাশে বসে। হঠাৎ একটি রমণী আমাকে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'ডু ইউ নো', কোন তারাটা বেথলেহেম গিয়েছিল? ঝকঝকে তারাভরা আকাশটার দিকে আঙুল উঁচিয়ে সে বাচ্চা মেয়ের মতো মুখ করেছিল। অথবা, বৃন্দাবনের রাস্তায় মরে যাওয়া যমুনা দেখে এক শেষ বিকেলে ফিরে আসছিলাম। ভক্তদের ছেলেমানুষি এবং বিশ্বাসের অন্ধতা নিয়ে নিজেরা পরিহাস করছিলাম। হঠাৎ রাস্তায় দেখি এক অশীতিপর বৃদ্ধা ঠুক ঠুক করে একা হেঁটে চলেছেন। মুখচোখ দেখে মনে হল বাঙালি। রিকশা থামিয়ে ঠাট্টার গলায় বললেন, 'ও দিদিমা, কবে এসেছেন এখানে?' হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন বৃদ্ধা। মুখচোখে অজস্র ভাঁজের মধ্যে কী একটা ব্যথা নড়েচড়ে উঠল। পলকেই ছুটে এলেন আমার কাছে। শীর্ণ দুটো হাতে আমার হাত ধরে বললেন,—ও আমার সোনার গোপাল, পাঁচ কুন্ড পার হয়ে গেল, তবু যমুনা মাটি দিল না রে। কথা বলার সময় পৃথিবীর সমস্ত আক্ষেপ ওঁর গলায় কান্না হয়ে বাজছিল।

মুশকিল কি না জানি না, যা সহজ এবং সরল তা আমাকে একদম আকর্ষণ করে না।...

লিট্‌ল ম্যাগাজিন এবং তার আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হবার সুযোগ আমার হয়নি। দেখেছি এইসব ছোট ছোট কাগজে হাত পাকিয়ে সবাই বড় কাগজে আসেন। ফলে একটা গোষ্ঠী তৈরি হয়ে যায় তাঁদের। হয়তো সুবিধে হয় তাতে। তবে একটা ব্যাপার, বেশিরভাগ লিট্‌ল ম্যাগাজিনই এস্টাব্লিশড্ কাগজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। এ কথা ঠিকই বড় কাগজগুলো এখন ইন্ডাস্ট্রি হয়ে গেছে। কোন্ জিনিসটা বাজারে চলছে তার ওপর উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। লিট্‌ল ম্যাগাজিনে প্রাণখুলে লেখা যায় যা ইচ্ছা। আমি অবশ্য কোনো কালজয়ী লেখা কোনো লিট্‌ল ম্যাগাজিনে পড়ার সুযোগ পাইনি। এইসব কাগজে যাঁরা বড় পত্রিকা বা প্রচলিত সাহিত্যকে গালাগালি দেন, দেখেছি তাঁরাই বড় কাগজে লেখার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করেন। রাতারাতি তাঁদের চরিত্র বদলে যায়। এক-এক সময় সন্দেহ হয়, এইভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার সহজ পন্থায় যতখানি কাজ হয় ডাকে গল্প পাঠিয়ে তা হয় না।

একটা কথা আজকাল খুব মনে হচ্ছে, আমরা কেউ তেমন লিখতে পারছি না। ষাটের শেষ থেকে যারা লিখছি তারা কেউ দাগ কাটার মতো কিছু লিখতে পারছি না। অথচ পঞ্চাশে সমরেশ বসু, বিমল কর যখন লেখা শুরু করেন তখন তাঁদের সামনে বিভূতি-মানিক-তারাশঙ্কর ছিলেন। কবজির জোরে ওঁদের নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়েছে। ষাটের প্রথমে শীর্ষেন্দু, বরেনের সামনে তো বড় বড় মহারথী ছিলেন। আমাদের সামনে তেমন কেউ নেই, আমাদের লড়াই করতে হচ্ছে না তেমন। কিন্তু লেখাও বেরোচ্ছে না। বরং ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভোলাবার চেষ্টা হচ্ছে একটা—ভিতরে কার কী আছে বোঝা যাচ্ছে না একদম। দেশে বছরে পঞ্চাশটা গল্প বেরোয়, কটা গল্প দু'বছরে মনে রাখা যায় এখন?

বুদ্ধদেব বুসর লেখা পড়ে মনে হত এত সুন্দর ভাষা, শব্দচয়নে এত দক্ষতা কিন্তু ম
দাগ কাটছে না কেন? বিমল করের লেখা পড়ে মনে হল আমি বড় দেরিতে এঁর লেখ
শব্দগুলো যে জলতরঙ্গের মতো বাজে আর তার সুর বুকের গভীরে সবটুকু জায়গা জু
বিমল কর আমাকে সেইভাবে আচ্ছন্ন করেছেন। ঘটনার চমক ছেড়ে অন্তরঙ্গ পটভূমি
যোগাযোগ বাংলা সাহিত্যে এমন করে আর হয়নি। কিন্তু আমি ওঁকে আমার লেখায় গ্র
পারিনি। এটা আমার অক্ষমতা। আমার মানসিক গঠন যে আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছি
নির্দ্বিধায় বলা যায় সমরেশ বসু এবং বিমল কর বর্তমান বাংলা সাহিত্যকে এখনও অক্সি
যাচ্ছেন।

আগেই বলেছি নতুন লেখক হিসেবে সুযোগ পাবার কোনো সমস্যা আমার হয়নি। অ
করি মোটামুটি ভালো লিখতে পারলে সুযোগ আটকে থাকে না। দেশ পত্রিকায় দশ বছর গ
পর সাগরময় ঘোষ আমায় উপন্যাস লিখতে বললেন। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইতিহাস হ
থাকা এই মানুষটিকে আমি দীর্ঘ দশ বছর ধরে দূর থেকে দেখেছি, কাছে যাবার সাহস হয়
দেখলেই সুবোধ ঘোষ, মানিক-বিভূতি-তারাশঙ্করকে নিয়ে ওঁর গল্প মনে পড়ে গিয়ে সং
কাছে যাবার। সাগরদা ব্যক্তিত্ব দিয়ে নিজের চারপাশে এমন একটা হাওয়া সৃষ্টি করেছেন
সেখানে পৌঁছানো মুশকিল। সেই তিনি যখন পুজোর জন্যে উপন্যাস চাইলেন, তখন বিশ্ব
হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিস্ময় আছে বলেই এই পৃথিবীটাকে ভালো লাগে।

খিদিরপুরে যেতে গিয়ে হঠাৎ খেয়ালে একদিন রেসকোর্সে ঢুকে পড়েছিলাম। সেখানক
জগত, অদ্ভুত মেরেপুরুষ, যাঁরা এই শহরের মানুষ হয়েও আলাদা গোত্রের হয়ে যান তাঁ
লিখে ফেললাম 'দৌড়'। কিন্তু বাদ সাধলেন আমার প্রথম পড়া উপন্যাসের লেখক শরৎ
একটা অপ্রকাশিত উপন্যাসের জন্যে আমায় জায়গা ছেড়ে দিতে হল। বিনোদন সংখ্যায় বে
উপন্যাসটা। কিন্তু আমি কি এই একশো কুড়ি পাতার লেখাকে উপন্যাস বলব? উপন্য
বিজ্ঞাপিত দুটো লেখা লিখলেও আমি মনে করি, এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এমন কোনো
লিখিনি যে লেখাকে সম্পূর্ণতার আবরণে ঢেকে রাখা যায়।

কিন্তু একথা ঠিক এখন বাংলা সাহিত্যে যাঁরা নতুন লিখছেন তাঁদের কিছু গোলমেলে স
সামনে দাঁড়তে হয়। প্রথমত বহুল প্রচারিত সাহিত্য পত্রিকার স্বল্পতা। এটা খুবই দুঃখের
বর্তমানের বাংলা সাহিত্য দুটো পত্রিকার ওপর নির্ভর করে আছে। অন্যটির তুলনায় যেহে
পত্রিকার প্রচার এবং ঐতিহ্য বেশি তাই চাপ পড়ে এখানেই। অথচ মাত্র পঞ্চাশটা সংখ্যায়
লেখককে কবার সুযোগ দেওয়া যায়? ছোট গল্প ভালো লেখেন এমন একজন লেখক
গত আট বছরে দশটি গল্প লিখেছেন দেশে তার মধ্যে একটি খুব আলোচিত হয়েছিল কি
এখন হতাশায় ভুগছেন। তাঁর ছোট গল্পের বই কোনো প্রকাশক ছাপবেন না। বিখ্যাত লে
তো চাপ দিয়ে ছোট গল্পের বই ছাপতে হয়। নতুনরা তো আশাই করতে পারেন না। অতএব সা
বছরে একটা করে ছোট গল্প লিখে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা তো উ
জায়গা জুড়ে নিয়েছেন। তারই ফাঁকে নতুনকে সুযোগ দেবার যে ইচ্ছে সাগরদার আছে
সবসময় সম্ভব হয় না। ধরা যাক, চারজন ক্ষমতাবান ছোট গল্পলেখক একসঙ্গে লেখা শু
আট বছর দশ বছর পর যখন উপন্যাস লেখার সুযোগ পেলেন তখন তার মনের ওপর এক
ধুলো জমে গেছে। আবার প্রথম উপন্যাসেই যে হইচই পড়ে যাবে এমন ভাগ্য ক'জনের
স্বাভাবিকও না। অনেকটা ফিল্মের সঙ্গে তুলনা এসে যাচ্ছে। যে নায়ক প্রথম ছবিতে ফ্লপ
তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। লেখকদের ক্ষেত্রে এটা এখন খুব মিলে যাচ্ছে। তাই
বড় পত্রিকার মুখাপেক্ষী হয়ে না থেকেও উপায় নেই। যেহেতু নতুন নতুন পত্রিকার আ
যাচ্ছে না তাই প্রকাশকদের উচিত নতুন লেখকদের জন্যে এগিয়ে আসা। নইলে এর ফল

ভুগতে হবে। যেমন, অচিন্ত্য-প্রেমেন-বুদ্ধদেবের সমকালীন লেখকরা যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা তো ফুরিয়ে গিয়েছেন। সমরেশ বসু, বিমল কর, রমাপদ চৌধুরী—এঁদের বয়স কত? ধরা যাক আরও পনেরো বছর এঁরা লিখবেন। তারপর ভরসা শুধু সুনীল আর শীর্ষেন্দু! এঁদের দুজনকে নিয়েই গোটা বাংলা সাহিত্যের বাজার চলবে? তাই প্রকাশকরা যদি এখনই নতুন লেখকদের সুযোগ দিতে এগিয়ে না আসেন তাহলে তাঁদেরই এককালে ফলভোগ করতে হবে। সাহিত্য পত্রিকাও এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। আত্মতুষ্টিই বিনাশের কারণ হয়ে থাকে।

শব্দচয়নে আমার তেমন আগ্রহ নেই। আমি বাক্যগঠনে কোনো মনোযোগ দিই না, বন্ধুরা বলে থাকেন। হয়তো তাই। কিন্তু আমি চেষ্টা করি একটা বক্তব্য সরাসরি পাঠকের কাছে একটা ঘটনার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে। স্টাইল, পাণ্ডিত্য অথবা শব্দের মারপ্যাঁচ—যাই বলুন না কেন আসল তীর্থ হচ্ছে বক্তব্য। সেখানে যদি সব গল্পে পৌঁছোতে না পারি তবে নিশ্চয়ই আমি ব্যর্থ। আমার এখনও কিন্তু মনে হয় আমি কী বলতে চাই আমি সঠিকভাবে জানি না। প্রতিটি লেখার সময়ে আমার চিন্তাধারা বদলে যায়। নিজের সঙ্গে খেলা করে যাচ্ছি আমি। এইরকম খেলতে খেলতে, আমার বিশ্বাস, নিজেকে খুঁজে পাব। একথা ঠিকই এখনও আমার এবং আমার সমকালীন লেখকদের লেখার কোনো চরিত্র গড়ে ওঠেনি। ভাঙচুর হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আমাদের চেনাশোনা চরিত্রগুলোর বদলে সমাজের বিশেষ বিশেষ মানুষ অথবা যে হয়তো কোনোকালেই চেনা ছিল না তাকে নিয়ে গল্প লেখার একটা আগ্রহ আমার আছে। বস্তুত সেই অস্বাভাবিক চরিত্রগুলোর ক্রিয়াকলপের গন্ধ মাঝে মাঝেই দারুণ উতরোয়। কিন্তু আমি বুঝি, কোথায় একটা ফাঁকা থেকে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের চেনা মানুষের গল্প অসাধারণভাবে না লিখতে পারলে পাঠক লেখকের মধ্যে আত্মীয়তা তৈরি হয় না। পাঠক শুধু দর্শক হয়েই হাততালি দেন, বন্ধু হয়ে হাত জড়িয়ে ধরেন না। এই মুহূর্তে সেটাই আমার একমাত্র চিন্তার বিষয়।

প্রেম নিয়ে তেমন করে কছু এখনও লিখতে পারলাম না। বস্তুত, প্রেমের গল্প লিখতে গেলেই জড়তা অনুভব করি। অথচ কোনো সুন্দরী মহিলাকে দেখলেই মনের মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডটা মুঠোয় ধরে পৃথিবীটাকে লন্ডভন্ড করে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কলেজ জীবনে যে ভিক্টোরিয়ার গাছের ছায়া স্বপ্নের ছিল আজ কোনো মহিলা সেখানে যেতে বললে আমার হাসি পায়। বরং তাঁর সঙ্গে আমি পাঁচশো মাইল চুপচাপ হেঁটে যেতে পারি। হয়তো মেয়েদের বিভিন্ন দিক আমি এত টুকরো টুকরো দেখেছি এবং দেখে দুঃখ পেয়েছি যে তাঁদের নিয়ে প্রেমের গল্প ভাবতে গেলে আড়ষ্ট হয়ে যাই। সম্প্রতি মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিলাম পুজোর আনন্দলোকে। হাজারবার ব্যর্থ আমি সেখানে। মনে মনে সুখী হইনি একফোঁটাও লেখাটা লিখে। প্রেম তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা, চারপাশে ঘটছে, তা নিয়ে না-লেখার কী আছে। আবার যা স্বাভাবিক তা যে আমাকে আকর্ষণ করে না। আমার খুব আগ্রহ হয় জানতে, আজকের কোনো প্রেমিক কি তার প্রেমিকাকে বলে, 'আমি তোমায় ভালোবাসি।' এই বস্তাপচা তিনটে শব্দ। নাকি 'মা' শব্দের মতো তাদের কাছে এর কোনো বয়স নেই। বুঝতে পারি না ঠিক।

আমার এই লেখায় আমি স্বীকার করেছি, সমরেশ বসু এবং বিমল কর আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখতেন। একই সঙ্গে বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ স্রোত আমাকে আপ্লুত করেছে। এখন অন্তরঙ্গ লেখকের দেখা বড় একটা পাওয়া যায় না। আমাদের সময়ে লিখে যাচ্ছেন চুপচাপ যদিও লিখছেন অনেকদিন, তেমনি একজন লেখক সুধাংশু ঘোষ। এঁরা আমার কাছে গঙ্গাজলের মতো পবিত্র এবং প্রিয়, কিন্তু আমি লেখার সময়ে এঁদের এখনও গ্রহণ করতে পারিনি। বরং নারায়ণ গাঙ্গুলী, সমরেশ বসু এবং (আমি বিশ্বাস করি) এই সময়ের সবচেয়ে শক্তিশালী ছোটগল্প লেখক বরেন গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে আকর্ষণ করেন দুর্দান্তভাবে। ঠিক বরেনের উত্তর মেরুতে বাস করেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বিমল করকে যিনি দুহাত ভরে পেয়েছেন। বস্তুত তাঁর মতো আত্মনিষ্ঠ লেখা আমাদের কাছাকাছি বয়সের

কেউ লেখবার ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু কেন জানিনে বিমল কর বা শীর্ষেন্দু আমাকে আপ্লুত কিন্তু রক্তে মিশে যান না। বরং এইখানে আমি সমরেশ বসুর কাছে আকণ্ঠ ঋণগ্রস্ত হয়ে যদ্দুর মনে পড়ে আমি আদাব গল্প দিয়ে সমরেশ বসু পড়তে শুরু করি। একটা বন্য সরল কঠিন বাস্তব তার যাবতীয় রুক্ষতা নিয়ে পর পর গল্পগুলোতে আমাকে টেনে টেনে নিয়ে যেহেতু আমি উত্তর বাংলার পাহাড়ে শৈশব কাটিয়েছি, যৌবনের উষ্ণতা অনুভব করেছি ধু ধু বালির চরে কাশবনের নির্জনতায়, আমার চরিত্রের মধ্যে সেই রুক্ষতা এসে গিয়েছিল। জলে ভেসে আসা একটি মৃতা যুবতীর শরীর নিয়ে তিন বৃদ্ধ রাজবংশীর মধ্যে দাঙ্গা হতে দেখেছি কাশবনের আড়ালে লুকিয়ে তাদের দেখতে দেখতে মৃতা মেয়েটির স্ফীত উদর এবং তার হয়ে যাওয়া ঠোঁটের কোণে চোখ পড়েছিল। মেয়েরা মরে গেলেও কি জাদুতে মা মা ভাবটা রাখে! চা-বাগানে মদেসিয়া—পাহাড়ি শ্রমিকদের মধ্যে জীবনের ঠুনকো মূল্যবোধের কোনো পাইনি। আসলে এইসব ব্যাপার আমার মধ্যে এক ধরনের নির্লিপ্ততা এনে দিয়েছিল—সমরে তাকে খুঁচিয়ে দিলেন। আমার বিশ্বাস বাংলা সাহিত্যে এই একজন মাত্র লেখক জন্মেছেন যিনি ও ব্যক্তিজীবনে বিদেশি যে-কোনো লেখকের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের পরে মতো নিজের লেখা নিয়ে বারবার খেলা করে যাওয়া কারও সাধ্যে আসেনি। এতবার পথ বদ সমরেশ—সেটা ভালো কী খারাপ তা তর্কের ব্যাপার—কিন্তু এই মানসিকতা ক'জনের? তা সমকালীন যুবমানসের চরিত্র ওঁর কলমে যেভাবে আসে তা আমাদের ঈর্ষার বিষয়। আমার বিশ্বাস, সমরেশ বসু ফরাসি দেশে জন্মগ্রহণ করলে অ্যাদ্দিনে নোবেল পেয়ে যেতেন।

একথা তো ঠিক আমাদের শিরায় শিরায় যে রক্তের ধারা, শরীরের বয়স বাড়লেও তার পালটায় না। একটা সময়ে হয়তো জোর কমে যায়, কিন্তু নতুন চেহারা নেয় না। তরাই-এর অঞ্চলে পুরো ছেলেবেলা কাটিয়ে মনের ভিতরটা এমনভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে যে কোনে অন্তর্মুখী লেখা আমার পক্ষে লেখা মুশকিল। জানিনা প্রকৃতিকে অস্বীকার করে কোনোদিন বদলাবে কি না।

দেখতে দেখতে চৌত্রিশটা বছর পার হয়ে গেল, এটা সত্য ঘটনা, আমি বেঁচে থাকার কোনো গল্প লিখতে পারিনি। এবং নিজের লেখার সম্পর্কে কিছু বলার সময় এখনও আ এখানে যা লিখলাম তা নেহাতই কিছু বিক্ষিপ্ত ভাবনা। এখনও শুধু নেট প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি, খেলায় গোল করতে অনেক বাকি। আমি বিশ্বাস করি জীবিত মানুষকে নিয়ে আমি কিছু লি পারব। একটি মানুষ নিজের রোজগারের টাকায় মদ্যপান করতে পারেন, বেশ্যালয়ে যেতে এবং মাথা উঁচু করে সন্তানের হাত ধরে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যেতে পারেন—এইরকম মানুষের আগে আমি কখনোই অসৎ ছাপ লাগাতে রাজি নই। কিন্তু যে মানুষের মনের মুখে মানুষের মুখোশ পরানো, মেরুদণ্ড বস্তুটি যার শরীরে নেই তাকে আমি এখনও লেখার বি বলে ভাবতে রাজি নই।

আমি এইসব মৃত মানুষের গল্প লিখতে চাই না।

পত্রপাঠ ১৪১৩ সালে যা মনে এল

১৩৮৪ সালে দেশ পত্রিকার কিংবদন্তী সম্পাদক সাগরময় ঘোষের একটি চিঠি পেয়েছি আমার সেই সময়ের সাহিত্য ভাবনা নিয়ে ওই কাগজে লিখতে বলেছিলেন। তখন আমার বছর বয়স। ইংরেজি উনিশশো সাতাত্তর।

তার এগারো বছর আগে সাতষট্টিতে আমার প্রথম গল্প 'দেশ'-এ বের হয়। গল্পটির নাম 'অন্তর সাতষট্টি থেকে সাতাত্তরে গোটা তিরিশেক গল্প লিখে ফেলেছি ওই পত্রিকায়। পঁচাত্তরে প্রথম উ 'দৌড়'। ছিয়াত্তরে আনন্দলোকে 'এই আমি রেণু'—পুঁজি বলতে এটুকুই।

আজ উনত্রিশ বছর বাদে শেখর আহমেদের পরামর্শে ওই লেখাটি পড়তে পড়তে বেশ মজা পাচ্ছিলাম। তখন বয়স কম, দেখার পালা চলছিল, কিন্তু হজম করার শিক্ষা পাইনি। ওটা সময় জোগায়।

প্রথমেই লিখেছি মৃত্যুর সময় মানুষেরা বড় সৎ হয়ে যায়। অথচ আমি তখনও কারও মৃত্যু দেখিনি। কল্পনা করে নিয়েছি। এবং লিখেছি এইরকম সৎ মানুষের গল্প আমি লিখতে চাই না। অর্থাৎ যা ভাবছি তা যদি একটু চমকপ্রদ হয় তাই বিশ্বাস করছি। এখন জানি মৃত্যুর মুখে মানুষের কোনো বোধ থাকে না। সারাজীবন সততার সঙ্গে বাস করা জীবিত মানুষ আমি পরে অনেক দেখেছি।

যে লোকটা নিজের রোজগারের টাকায় মদ্যপান করতে পারেন, বেশ্যালয়ে যেতে পারেন, আবার মাথা উঁচু করে সন্তানদের নিয়ে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যেতে পারেন তাঁকে উনত্রিশ বছর আগে আমি টাটকা মানুষ বলেছি, যার আগে আমি 'অসৎ' শব্দটি বসাতে রাজি হইনি।

কিন্তু আমি অনেক মানুষ গড়ার কারিগর দেখেছি যাঁরা নিঃস্বার্থে জীবন দিয়ে গিয়েছেন পরবর্তী প্রজন্মকে। মদ বা বেশ্যাবাড়িতে না গিয়েও কত মানুষ নিজের সন্তানকে যোগ্য করে তোলার পরিশ্রমে নিষ্ঠ থেকেছেন। এঁদের নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে নিজের আত্মাই শুদ্ধ হয়েছে।

তারপর বাইরের ঘনঘটা ছেড়ে ভেতরের মানুষকে আবিষ্কারের যে চেষ্টা তা উনত্রিশ বছর আগের চৌত্রিশ বছরের যুবক ভাববে কী করে?

কিন্তু এই লেখা পড়ার পর নিজেকে প্রশ্ন করলাম, ওহে, এই উনত্রিশ বছরে কতদূর এগোলে? পরিচিতি বেড়েছে, ওই বিক্রির টাকায় দিব্যি আছি, এই পর্যন্ত।

কিন্তু একটা ঢোঁড়াই অথবা জাগরী, একটা হাঁসুলি বাঁকের ইতিকথা, একটা পথের পাঁচালী, একটা পদ্মানদীর মাঝি বা তিতাস অধরাই থেকে গেল।

সেই চৌত্রিশ বছর বয়সে আমার সামনে উনত্রিশটা বছর ছিল। ইস্, এখন যদি আরও উনত্রিশটা বছর পেতাম!

ডিসেম্বর ২০০৬

কাঙাল

চাওয়ার কী শেষ আছে? সাধকরা বলেছেন, চাইতে জানতে হয়। আবার কেউ কেউ একটু আত্ম তাঁরা মনে করেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন দেওয়াটা তাঁরই কর্তব্য; আমরা চাইব কেন? চি রাজাবাজারে এমন অনেক মানুষকে দেখেছি, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে চিৎকার করছেন, 'আল্ল আল্লা যে দেবেনই, এ ব্যাপারে যেন তাঁর কোনো দ্বিধা নেই। শুনতে শুনতে একদিন ওইরকম ' করা একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি কী করে এত নিশ্চিত যে আল্লা দেবেনই?

লোকটি হেসেছিল,—গরিব-দুঃখীকে যিনি দান করেন, আল্লা তাঁর দুহাত ভরে দেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—আল্লা আপনাকে সরাসরি যা দেওয়ার দিচ্ছেন না কেন?

লোকটি এমন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল যে আমার মনে হয়েছিল আমার মতো নাস্তিক সে দেখেনি।

এ দেশের পুরাণ ইত্যাদিতে সাধনার কথা বলা আছে। ভক্ত সাধনায় বসেন। বহু বছর সাধনা করেন পাহাড়ের নির্জনে। নিজেকে কষ্ট দিয়ে, লোভ মোহ ইত্যাদিকে অতিক্রম কর ঈশ্বর তুষ্ট হয়ে তাঁর সামনে এসে ঘোষণা করেন,—তোমার সাধনায় আমি প্রীত হয়েছি কী বর চাও?

কেউ স্বর্গে যেতে চেয়েছেন, কেউ ক্ষমতা চেয়েছেন। বর পাওয়ার পর অনেকেই ঈশ্বরকে ফেলেছেন।

অর্থাৎ চাওয়া ব্যাপারটা অনেক রকম এবং তার বয়সও পৃথিবীরই মতো।

কথা হল, চাইবে কে আর দেবে কে? যার নেই সে চাইবে, যার আছে সে দেবে। ছে শেখানো বুলি কপচাতাম—মা বিদ্যা দাও, বুদ্ধি দাও। অর্থাৎ পড়াশোনা করেও শেষ হচ্ছে না। পেতে গেলে মায়ের কাছ থেকে ওগুলোও চাই। বিদ্যে শুধু বই পড়ে অর্জিত হবে না; এটা গুরু আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের আজকের জীবনে আমরা অনেক রকম চাওয়ার চক্রে আবর্তিত। ধরুন আপনি লেখেন। লেখেন। ছাপতে চান। বড় কাগজগুলোকে ভয় পাচ্ছেন। অতএব পরিচিত যারা ম্যাগ করে তাদের কাউকে পাকড়ালেন। তারই সূত্রে ওদের আড্ডায় যাওয়া-আসা শুরু কর মাঝেমাঝেই চা খাওয়ালেন। পত্রিকা প্রকাশের সময় অনেক চেষ্টা করে একটা বিজ্ঞাপন এনে দি আপনার কবিতা ছাপা হল। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখে কী যে আনন্দ হল! তখনই চা ইচ্ছেটায় সুড়সুড়ি লাগল।

কলকাতার বড় লিট্‌ল ম্যাগ হল বিভাব, অনুষ্টুপ। সুরজিৎ যতদিন ছিল ততদিন প্রমা। সঙ্গে আছে শ্যামলকান্তি দাশ-এর পত্রিকা। এইসব কাগজে লিখলে কবি হিসেবে জাতে ওঠা যায়। অতএব শ্যামলকান্তিদা, অনিলদা বা সমরেনদার কাছাকাছি পৌঁছবার জন্যে অনেক কাঠখড় পোড়ানো প্রয়োজন হল। তারপর চাটুকারিতা-শিল্পে দক্ষতা অর্জন করতে করতে অনেক বেলা গেল। প্রথম শ্রেণীর লিট্‌ল ম্যাগের কবি হওয়ার পর মন বলল, অযোগ্য হলে কি শ্যামলকান্তিদা আমার লেখা ছাপতেন? অতএব যোগ্যতা যখন আছে, কবি সম্মেলনে কবিতা পড়ার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে, মায় হলদিয়া উৎসবেও যেতে পারা যাচ্ছে, কবিদিদি এবং কবিদাদারা যখন হেসে কথা বলেন তখন 'দেশ' পত্রিকা নয় কেন? ঠিকঠাক চাইতে জানলে ঈশ্বরও বিমুখ করেন না।

একসময় সুনীলদার বাড়িতে কবি-যশ প্রার্থীদের বেশ ভিড় হত। সুনীলদার কাজের লোককেও তাঁরা বেশ খাতির করতেন। সুনীলদা কার সঙ্গে বেশি কথা বলেছেন কার কবিতা পড়ে 'বাঃ' বলেছেন, এ নিয়ে তর্ক চলত। তদ্দিনে কফিহাউস ছেড়ে এ.আই. ক্লাবে সান্ধ্যবাসর বসে এই তরুণদের। সুনীলদার তরুণ বয়সে পকেটে টাকা থাকত না বলে যেতেন বারদুয়ারিতে। সেসময় তাঁরা কবিতা ছাপার জন্যে কারও চাটুকারিতা করার ব্যাপারটাকে ঘৃণা করতেন। নিজেদের কাগজ কৃত্তিবাসে কখনোই অসার লেখা ছাপতেন না। কিন্তু দেশ পত্রিকার কবিতা-সম্পাদক সুনীলদাকে অনেক উদার হতে দেখেছি। তাঁর ওই উদারতার সুযোগ নিয়েছেন অনেকেই। কেউই কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি, দু-তিনটে কবিতা ছাপার পর অনেকেই হারিয়ে গিয়েছেন, কেউ কেউ তাই ভাঙিয়ে এখনও কবি সম্মেলন করে বেড়াচ্ছেন। এখনকার উঠতি কবিরা সুনীলদার কাছে যাওয়ার প্রয়োজন খুব বোধ করেন না। কারণ জয় গোস্বামী দায়িত্ব নিয়েছেন। বইমেলায় জয় যখন হাঁটেন তখন তাঁর চারপাশে ওঁরা থাকেন। অনেকের খুব দুঃখ জয় কোনো নেশা করেন না, এমনকী মদ পর্যন্ত খান না।

প্রকাশকদের কাছে বই ছাপার জন্যে উঠতি লেখকদের আনাগোনা আছে। তবে তা ছোট প্রকাশকদের কাছে। বড়রা পাত্তা দেবেন না। ছোটরাও ব্যবসায় লোকসান করার জন্যে বই ছাপবেন না। কিছুদিন পরে সরে পড়তে হবে।

যশ এবং অর্থ পাশাপাশি থাকায় লোকে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথমে যশের কাঙাল হয়। যশ পেলেই অর্থ আসবে।

এই কাঙালিদের ভীড় সর্বত্র। শিল্প, সাহিত্য, চলচ্চিত্র তো বটেই, জীবনের সব ধারা-উপধারায় এঁরা ছড়িয়ে আছেন। কিন্তু যুগটা বদলেছে। রামকৃষ্ণ বলতেন, 'মা জ্ঞান দে, ভক্তি দে'। একদম সরাসরি দাবি। এর মধ্যে কাঙালিপনা নেই। যোগ্য ব্যক্তি তাঁর পাওনা চাইছেন। এখন নিজের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ আছে। তাই কাঙাল হতেই হয়। আর এই কারণেই কাঙালিপনার ধরন বদলে যাচ্ছে। বাজার থেকে জ্যান্ত মাছ কিনে বস্‌কে বাড়ির পুকুরের মাছ বলে চালানোর দিন শেষ। বরং বস্‌কে সাহস করে যদি বলা যায় 'স্যার, মিস দেবনাথ এসেছিলেন আপনার সঙ্গে একটা প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনা করতে চান', বস্‌ জিজ্ঞেস করবেন, 'কে মিস দেবনাথ?'

—মনে হয় ভালো সোর্স আছে। বয়েস তিরিশের নিচে আর সিনেমার স্টারের মতো সুন্দরী।

—অ।

এক্ষেত্রে প্রমোশন অনিবার্য।

সুন্দরী মেয়েদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে যে কাঙালিপনা তা বোধহয় ইদানীংকালে এসেছে। কোনো নামযশ নেই, পকেটে অথৈ রেস্ত নেই—এমন মানুষ ধরেই নেন, কাঙালিপনা করে কোনো লাভ নেই। শি ইজ আকাশের তারা। যার অথৈ রেস্ত আছে তার কথা আলাদা। তবে আজকের সুন্দরীরা

তো তিলোত্তমা নয়! তাদের মাথার ঘিলু জিলিপির সাইজের। কাঙালকে আরও কাঙাল তাদের বিলাস। অতএব খেলা জমে।

আবার এই সুন্দরী যখন আচমকা কোনো সোজাসাপ্টা ছেলের প্রেমে পড়েন এবং অ হন তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কাঙালও তাঁর কাছে হার মানতে বাধ্য হন। জিলিপি-ঘিলু যে হয়ে গেছে তাঁর!

সব কথার সেরা কথা তো রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন, 'ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল আরো কি তোমার চাই!' যিনি নিজেই কাঙাল তিনি তাঁর জন্যে আমাকে কাঙাল করে শান্তি আরও কিছু দিতে হবে আমাকে। হোক। ঈশ্বরকে কাঙাল ভাবতে ভালোই লাগে।

জানুয়ারি ২০০৭

কইতে কথা বাধে না

কয়েকদিন আগে বিখ্যাত অভিনেতা এবং গায়ক, চিত্র পরিচালক শ্রী অঞ্জন দত্তের আমন্ত্রণে কলকাতা টিভির জন্যে একটি অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎকার দিতে উত্তরবঙ্গের 'মায়া' চা-বাগানে গিয়েছিলাম। চেয়ারে বসে স্টুডিয়োর ভেতরে নয়, শ্রী দত্ত চেয়েছেন প্রাকৃতিক পরিবেশে, বাংলোর ভেতরে আমার লেখালেখি, জীবনযাপন নিয়ে সরাসরি কথা বলতে। ওঁর ইচ্ছেমতো চা-বাগানের গলিতে, নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে অনেক কথা বলেছিলাম।

এককালে কইতে কথা বাধত। কে কী ভাববেন, কে আঘাত পাবেন—ভেবে কথা গিলে ফেলতাম। আমার পূর্বসূরিদের দেখতাম, তাঁরা যে জীবনযাপন করেন তা তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয় না। হলেও সেটা জীবনের ভালো দিকটা অথবা কোনো অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি একটি ফিলজফিক্যাল ভাবনা। বিভিন্ন লেখায় পড়েছি, রবীন্দ্রনাথ নাকি নগ্ন সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না, বিরক্ত হতেন খুব, কিন্তু তাঁর কোনো লেখায় সেটা প্রকট হয়নি। অল্পেই রেগে যান, রেগে গেলে মাথা ঠান্ডা হয় না সহজে—এসব লেখক রচনায় কখনোই এরকম চরিত্র দেখি না। গল্প, উপন্যাস, কবিতায় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে যদি বা 'ধরি মাছ না-ছুঁই পানি'র মতো তা চলকে ওঠে কিন্তু প্রবন্ধ বা নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনায় সেটা সযত্নে অনুপস্থিত থাকে। এই কিছুদিন আগের কথা; কোনো লেখকই, যিনি নিয়মিত মদ্যপান করতেন, লিখিতভাবে জানাতেন সে কথা। কাল রাত্রে এত মাত্রাছাড়া মদ্যপান করেছিলাম যে সকালে মাথা তুলতে পারিনি—এমন লাইন লেখার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না তাঁরা, যদিও বাস্তবে প্রায়ই ঘটত। একজন প্রবীণ লেখকের সঙ্গে আমার তরুণ বয়সে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তিনি কথা বলার ব্যাপারে প্রশ্রয় দিতেন আমাকে। তিনি বলেছিলেন,—লিখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে যে।

—কীরকম?

—প্রথম কথা, স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশীর কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। তাঁরা বিদ্রোহ করবেন।

—কিন্তু আপনার মদ্যপানের ব্যাপারটা তো সবার জানা।

—আহা! আমার পাইল্‌সের কারণে রক্তপাত হয়—একথা বাড়ির সবাই জানে, তাই বলে কী পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াব? তা ছাড়া যাঁরা আমার লক্ষ্মী, সেই পাঠকেরা হজম করতেন পারবেন না।

—কেন?

—তাঁরা যখন পড়বেন, তাঁদের প্রিয় পাঠক রোজ মদ খান, তার মানে মাতাল হন, আর মাতালরা লম্পট হয় বলে তাঁদের ধারণা—তখন আমার সম্পর্কে আর শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারবেন না। লেখা

ভালো না লাগলে বলবেন—মাল খেয়ে লিখেছে। বাজার পড়ে যাবে হু হু করে। পাবলিশ আমার বই ছাপবেন না। নিজের বাঁশ নিজে কেউ নেয়?

অতএব ছলনা। 'প্রথম কদম ফুল'-এর লেখক যখন রামকৃষ্ণদেবের জীবনী লিখলেন, ত লিখলেন, আমি ডান হাতে রামকৃষ্ণ লিখি, বাঁ হাতে কামকৃষ্ণ। শুনতে ভালো লাগল। লো লেখকের কোনো মুখোশ নেই। কিন্তু বাঁ হাতের লেখা মানে তো হেলাফেলা করে লে সেই 'বেদে' থেকে 'দুইবার রাজা'র মতো গল্প যাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে, যিনি বাংলা অমর হয়ে থাকবেন, সেগুলোকে বাঁ হাতের লেখা বলে রামকৃষ্ণ-ভক্তদের কাছে হাততালি কোনো কারণ ছিল না।

থাকলে আমাদের দেশের পাঠকরাও এর জন্যে কিছুটা দায়ী। তাঁরা একজন স্কুলমাস্টার রামনাথের মতো জীবনযাপন করতে দেখলে খুশি হন। তাঁদের কোনো দাবি থাকবে না। ছাত্র পড়িয়ে যাবেন। একজন লেখকও ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বৈষ্ণব-বৈষ্ণব আচরণ করবে চড়েও রা কাড়বেন না। অথচ পাঠকরা আধুনিক জীবনের যাবতীয় উপকরণ ভোগ করা বলবেন,—বিভূতিভূষণ ছিলেন প্রকৃত লেখক। ঘাটশিলা থেকে থার্ড ক্লাসে হাওড়ায় এ কলেজস্ট্রিট পৌঁছতেন। পরনের ধুতি হাঁটুর নিচে শেষ হত। এসে প্রকাশকের কাছে অগ্রি টাকা নিয়ে ফিরে যেতেন। কোনো ঠাট-বাট ছিল না। মদ-গাঁজা খাওয়ার কথা ভাবতেই না। তবে মিষ্টি বা মাছ-মাংসে আসক্তি ছিল। সেটা কিছু নয়। তা এরকম ভাবনা বহুদিন ধ হওয়ায় তখনকার লেখকরাও মুখোশ পরে থাকতে পছন্দ করতেন। মিত্র ও ঘোষের দোকা হত তাঁদের। সেই আড্ডায় যে রসের কথা তাঁরা বলতেন তা কখনোই লিখতেন না। লিখলে হয়ে যেতে হবে যে! শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে রটেছিল, লোকটা মদোমাতাল, বেশ্যাপল্লিতে আছে বলে 'চরিত্রহীন' উপন্যাস লিখেছিলেন। সেসময় চরিত্রহীন উপন্যাসটি প্রকাশ্যে পড়া যেন পড়লেই চরিত্রহীন হয়ে যেতে হবে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের রচনার বলিষ্ঠতা, ভাষা এবং অসাধারণ বুনন তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত কুৎসাগুলোকে বেশিদিন স্থায়ী হতে দেয়নি। আমাদের

একজন লেখক অবশ্যই আধুনিক মানুষ। তিনি যদি আর্থিক দিক দিয়ে সক্ষম হন তাহ পোশাক, জুতো কিনতে পারেন। একজন সচ্ছল পাঠক যদি সেসব ব্যবহার করতে পারেন লেখক পারবেন না কেন? যখন লেখালিখি শুরু করি তখন পকেটে পয়সা ছিল না। বিশ ছাড়ার পর পঁচিশ টাকার একটি ঘর ভাড়া করে থেকেছি, মেসের ভাত খেয়েছি আশি টাকার চাকরি করে। কিন্তু সেইসঙ্গে সমানভাবে কফি হাউসে বসে রাজা-উজির মেরেছি। এস্টাব্লি দালালদের মুন্ডু চিবিয়েছি। সেটা এমন একটা সময় ছিল যখন হাংরি জেনারেশনের লেখকরা লেখক, বাকিরা ভাঁড়মে যাও বলে মনে হত। এমনকী আমাদের কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথকে বলে মানতে না চেয়ে লাইম লাইটে এসে যেত। 'কৃত্তিবাস' তখন যুবকদের কাগজ। কারণ কৃ ঘোষণা করেছিল, তারা বড় কাগজে লিখবে না।

তারপর বয়েস বাড়ল। চোখ থেকে ঠুলি খসল। সুনীলদা আনন্দবাজারে ফিচার লিখছে এ কবিতা। স্বকাল পুরুষ কাব্যনাট্যের কবি, কৃত্তিবাসের অন্যতম জন্মদাতা আনন্দ বাগচীর দেশ-এ ছাপা হচ্ছে। পরে চাকরিতেও ঢুকে গেলেন। হাংরি জেনারেশন হাওয়া হয়ে গে শাস্ত্রীবিরোধীরা। সন্তোষকুমার ঘোষ বলেছিলেন, 'আগে ওঁরা শাস্ত্রটা পড়ে ফেলুন, তারপর বি করুন।' সেটাও টিকল না। কোনো দলে না গিয়ে আমি একা খোঁড়াতে খোঁড়াতে তারাশঙ্কর বসুর পায়ের ছাপে পা রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে টলমল হয়ে এগোবার চেষ্টা ক সাতষট্টিতে প্রথম গল্পের পর পঁচাত্তরে প্রথম উপন্যাস। অর্থাৎ আট বছর অপেক্ষা করতে সুযোগের জন্যে। আর আজ অনেকে শুরুই করেন উপন্যাস দিয়ে। দ্বিতীয়টি বেরোবার আ জেলার বইমেলার ফিতে কাটতে যান। বিমল কর বলেছিলেন, 'এই আটবছর ছোট্টগল্প লি

তুই হাত পাকালি, এটা কাজে লাগবে।' ঠিক তাই। শীর্ষেন্দুদা, সুনীলদার ক্ষেত্রে উপন্যাস লেখার আগে হাত পাকানোর পালা চলেছিল অনেকদিন ধরে।

তারপর শশধর দত্তের ভাষায়, 'কখন কেমন করিয়া কি হইয়া গেল, লোহার শেকলে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মোহন সমুদ্রের উপর ভাসিয়া উঠিল।' আমিও লেখক হয়ে গেলাম। লিখছিলাম আর অল্প থেকে ক্রমশ বেশি টাকা পাচ্ছিলাম। পেতে পেতে একটা সময় এল, যখন লোকে দুরকম কথা বলছে। একদল বলছে, জনপ্রিয় বিখ্যাত সাহিত্যিক, আর একদল বলছে, বাজারি লেখক।

এসব শুনলে আমার মজা লাগে। আমি তো জানি আমি কী। আমার ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সম্ভব ছিল না, কারণ বিজ্ঞান নিয়ে পড়িনি। আই.এ.এস. পরীক্ষায় বসিনি, কারণ জানতাম ফেল করবই। গানের গলা নেই, অভিনয়ের সুযোগ পাইনি। ছবি আঁকা মানে না-খেয়ে থাকা—সেসময় ছবিটা এমনই ছিল। সেই না-খেতে-পাওয়া শিল্পীরা এখন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে ছবি পিছু লক্ষ লক্ষ টাকা পাচ্ছেন। কিন্তু কেউ আমার হাত দেখে বলে দেয়নি, ছবি আঁকলে স্ট্রাগল করতে করতে শেষপর্যন্ত মরার আগে আমি ধনী শিল্পী হয়ে যাব। ফলে লেখালেখি ছাড়া অন্য রাস্তা ছিল না। এবং লিখে বেশ আছি। এই আমি আর কিছু করে এমন থাকতে পারতাম না।

আজকাল কইতে কথা বাধে না। যা সঠিক মনে হয়, বলে ফেলি। সারাবছর ধরে, বিশেষ করে নভেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়টায় মাসে গড়পড়তা দশ থেকে বারোটি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হই। কলকাতার কাছে হলে উদ্যোক্তারা দুপুরে গাড়ি করে নিয়ে যান। বক্তৃতা দিতে হয়। পুরস্কার বিতরণের ব্যাপার হলে দাঁড়িয়ে একঘণ্টা ধরে পুরস্কার দিতে হয়। তারপর ফুলের তোড়া আর একপ্যাকেট সন্দেশ নিয়ে রাত এগারোটায় বাড়ি ফেরা। কলকাতার অনেক দূরে হলে ট্রেনে বা প্লেনে যাতায়াত। বড়জোর একটা শাল কাঁধে চাপিয়ে দেন উদ্যোক্তারা। দুটো দিন পণ্ড হয়। মোটামুটি মাসে বারোদিন লিখতে পারি না। তাই এখন কেউ এলে জিজ্ঞেস করি, 'কেন যাব?' উত্তর হয়—'সবাই চাইছে আপনাকে, আপনি ওখানে খুব জনপ্রিয়।' দ্বিতীয় প্রশ্ন করি, 'কিন্তু গিয়ে আমার কি লাভ হবে? একই কথা বলতে হবে। সময় নষ্ট। আমার কী লাভ?' উত্তর হয়—'আপনাকে দেখতে চায় সবাই। কথা শুনতে চায়।' জবাবে বলি, 'তার জন্যে ছবি আছে, টেপ করে নিয়ে যান কথা।'

একজন তৃতীয় শ্রেণীর ফিল্ম-অভিনেতাকে ওঁরা বিশ হাজার টাকা দেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর গায়ককে তিরিশ হাজার; কিন্তু লেখকের বেলায় ফুলের তোড়া আর মিষ্টির প্যাকেট।

আগে সংকোচ বোধ করতাম। এখন সত্যিকথা কইতে বাধে না।

ফেব্রুয়ারি ২০০৭

আমরা এতকাল জানতাম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বসবাসের সুবিধে অর্থবানদের জন্যে। আম একজন দরিদ্র অথবা শ্রমিক কিংবা কেরানিকে ভারতীয় সংবিধান যতই নিরাপত্তা দিক, ত কাগজে-কলমে। বাস্তবে সেটা পাওয়া অসম্ভব। একজন গরিব চাষি বা কেরানির জমি বাড়িটির দখল নিয়ে কোনো প্রতিবেশী বড়লোক যদি আদালতে যান তাহলে অর্থাভা কোর্ট থেকে জজকোর্ট পর্যন্ত গিয়ে চাষি বা কেরানির নাভিশ্বাস উঠবে। নিম্ন আদালতে জেতেন তাহলে প্রতিপক্ষ যদি হাইকোর্ট এবং তারপরে সুপ্রিমকোর্টে যায় তাহলে অসহায় বউ নিয়ে তাকে পথে বেরিয়ে আসতে হবে। এ কথা আজ স্পষ্ট, গণতান্ত্রিক অধিক টাকার বিনিময়েই পাওয়া যেতে পারে। আমরা সইয়ে নিয়েছি বলে এ নিয়ে মাথা ঘ

কিন্তু স্বাধীনতার ষাট বছর পরে আবিষ্কার করলাম, গণতান্ত্রিক রাস্তায় হাঁটার ছলে কখ স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাকেও ম্লান করে দেওয়া যায়। এবং তা করার পরে কারও কিছু বলার কারণ সব আইন মেনে গণতান্ত্রিক পথেই করা হয়েছে।

যে-কোনোদিন শ্যামবাজার থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত ট্যাক্সিতে যদি যান তাহলে রাস্তায় মে মুখ মুছে দেখবেন সাদা রুমাল কালো হয়ে যাবে। সকাল-বিকেল যে-কোনো বস্তির সামে গল গল করে কালো ধোঁয়া উনুন থেকে বের হচ্ছে। সরকারি বাস অথবা পুলিশের পুরোনো রাস্তায় যে বিষ-কালো ধোঁয়া ছড়ায় তা আমরা সহ্য করে ফেলেছি। রাজাবাজার, খিদির অঞ্চলের বাতাসে পলিউশনের সীমা বুঝতে যন্ত্রের দরকার হয় না। আমরা কলকাতার মা নিয়ে বেঁচে আছি।

স্বীকার করছি, কলকাতা যদি দূষণমুক্ত হত তাহলে বেঁচে থাকাটা সুখের হত। কিন্তু ব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ময়দান নিয়ে যখন কিছু পরিবেশবিদ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তখন হয়েছিলাম। ময়দানে বইমেলা হলে কলকাতার ফুসফুস বিষে ভরে যাবে বলে তাঁরা আদাল করলেন। কিন্তু ওই ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো যখন সভা করে দিন থেকে উনুন জ্বালিয়ে রান্না চলে, পরের দিন নোংরা কাগজে ঘাস ঢাকা থাকে তখন পরিবেশবিদরা মুখে কুলুপ আটকে রাখেন। সন্দেহটা এই কারণেই।

ময়দানে মেলা বন্ধ করার আবেদন চলছিল বছর তিনেক ধরে। কয়েক বছর আগেও ধুলো প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলত। যতই জল ছড়ানো হোক ধুলো বাধা মানত না। তবু মানু মতো মেলায় গিয়েছে। বইমেলা শুধু প্রকাশকদের বাণিজ্যের জায়গা নয়, পাঠকদের মে মেটানোর তীর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দশ দিনে অন্তত একশোটা সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার

সমৃদ্ধ করত, যা পয়সা দিয়ে পাওয়া যায় না। বেনো জলের মতো মিডিয়ার স্টল, ধর্মীয় স্টল, খাবারের দোকান ঢুকলেও বইমেলা অন্য মেলা থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পেরেছিল।

পরিবেশবিদ কেন বইমেলাকে বন্ধ করতে তৎপর হলেন?

পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী গ্রন্থমেলা বন্ধ হওয়ার পর থেকেই এই বইমেলার সঙ্গে যুক্ত। বইমেলা পুড়ে যাওয়ার তিনদিনের মধ্যেই তাঁর চেষ্টায় মেলা আবার সচল হতে পেরেছিল। সিপিএম পার্টির সঙ্গে কোনো সংযোগ না থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার কারণে কেউ কেউ বইমেলাকে সিপিএম-এর মেলা হিসেবে ভেবে বসলেন। আদালতে বইমেলা যে পরিবেশ দূষণ করছে তার প্রমাণ দিয়ে মামলা জারি করা হল।

সেই ব্রিটিশ আমলে দুর্গের সামনের জায়গাকে মিলিটারির অধীনে যে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল তা আজও পালটায়নি। ময়দানে কিছু করতে হলে মিলিটারির অনুমতি নিতে হবে। এর আগে মিলিটারি বলেছে, এই শেষবার, আর নয়। মুখ্যমন্ত্রী তখন বললেন, বইমেলার জন্যে আলাদা জায়গা খোঁজা হচ্ছে। পরের বার মেলা শুরুর সময় আদালতে গিয়ে মুচলেকা লিখছেন, আর একবার, শেষবার সুযোগ দেওয়া হোক।

দেওয়া হল। আবার এবার যখন ওই ময়দানেই বাঁশ পড়ল তখন পরিবেশবিদরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন আদালতে। তাঁরা জানালেন, বইমেলা স্রেফ ব্যবসার জায়গা। চামড়ার মেলা থেকে কোনো পার্থক্য নেই। যাঁরা বই কেনেন তাঁরা মেলা ছাড়াও কেনেন। ওঁদের প্রতিনিধি আইনজ্ঞ অরুণাভ ঘোষ টিভি চ্যানেলে ব্যঙ্গ করে প্রবীণ লেখক আবুল বাশারকে জানিয়ে দিলেন, তিনি বাশারের চেয়ে অনেক বেশি বই ভালোবাসেন। কোনো একটা বই না কিনলে তাঁর চলে না। অর্থাৎ তাঁর আইন-ব্যবসার জন্যে যে বই দরকার তার সঙ্গে একটা 'পথের পাঁচালী' বা 'সঞ্চয়িতা'র কোনো পার্থক্য তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোকের উন্নাসিক কথাবার্তা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল বেড়াল তার থাবায় ইঁদুরছানাকে পেলে এইরকম ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে।

মামলা শুরু হওয়ার পরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, বইমেলা ময়দানেই হবে। সেটা সম্ভবত সতেরোই জানুয়ারি।

এইসময় বইমেলার আয়োজক গিল্ড চোখ বন্ধ করে মুখ্যমন্ত্রীর চরণে নিজেদের রেখে দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন বলছেন তখন সেটাই শেষ কথা বলে মনে হয়েছিল তাঁদের। এমনকী কর্পোরেশন, দমকল বা পরিবেশ দপ্তরের অনুমতি না নিয়েও মিলিটারিকে তারা জানিয়ে দিয়েছিল, ওসব তাদের নেওয়া হয়ে গেছে। গিল্ডের আইনজ্ঞ যখন বিচারকের ধাতানি খেলেন তখন তড়িঘড়ি তিন দপ্তরকে জড়ো করে সেই অনুমতি নেওয়া হল। বিচারক বললেন, গিল্ড জালিয়াতি করেছে। ময়দানে মেলা নিষিদ্ধ। এখন সুপ্রিম কোর্ট যেতে হবে পরবর্তী বছরের অনুমতি পাওয়ার জন্যে। বিচারক ইচ্ছে করলে ভুল তথ্য দেওয়ার জন্যে গিল্ডকে শাস্তি দিতে পারতেন। জেসিকা মামলায় মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যে সাক্ষীদের তলব করা হয়েছে, কেন তাদের শাস্তি দেওয়া হবে না—জানাতে।

ময়দানের বদলে সল্টলেকে বইমেলা এল সুভাষ চক্রবর্তীর বদান্যতায়। এটা করায় মেয়র বিকাশবাবু ও আজকাল সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত চটে লাল। বললেন, গিল্ড সল্টলেক স্টেডিয়ামে গিয়ে তাঁদের পিঠে ছুরি মেরেছে। অর্থাৎ কোথাও মেলা না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে তাঁরা খুশি হতেন। কিন্তু পাঠকরা অন্য কথা বলেছে। বৃষ্টির অত্যাচার শেষ হয়ে গেলে সল্টলেক স্টেডিয়ামে মেলা জমে উঠেছিল। শেষ তিনদিন তো কথাই নেই। গিল্ডের নির্বুদ্ধিতা, মুখ্যমন্ত্রীর আত্মবিশ্বাস, আইনজ্ঞদের দুর্বল সওয়াল পশ্চিমবাংলার পাঠকদের বঞ্চিত করতে চলেছিল বইমেলা বন্ধ হয়ে গেলে।

কিন্তু পরিবেশবিদরা দেখিয়ে দিলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের আশ্রয় নিয়ে যে-কোনো শ আন্তরিক প্রয়াসকে টুঁটি চেপে ধরা যায়। সেক্ষেত্রে মহামান্য বিচারকের সামনেও কোনো প থাকে না।

আমি একশোভাগ নিশ্চিত যে, বিচারক যদি গণভোট চাইতেন তাহলে শতকরা নব্বুই পড়ত বইমেলা ময়দানে করার জন্যে।

কিন্তু আইনে মানবিকতা বা আবেগের কোনো জায়গা নেই। তারই ফায়দা লুটছেন পরিবে

মার্চ ২০০৭

নন্দীগ্রামের নন্দী-ভৃঙ্গী

নন্দীগ্রামে পুলিশের আক্রমণের দৃশ্যটি যখন টিভিতে দেখছিলাম তখন নিজের চোখ এবং কানকে বিশ্বাস করতে পারিনি প্রথমে। তারপর অন্যান্য চ্যানেল, এমনকী অবাংলা চ্যানেল ঘুরিয়েও একই দৃশ্য দেখতে পেলাম—কয়েকশো গ্রাম্য নারী লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে; আর রাইফেল উঁচিয়ে তেড়ে যারা যাচ্ছে, তাদের আমরা দেখেছি ভিয়েতনাম, আফগানিস্তানে অথবা ইরাকে।

বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলে এখনও সুইচ-অফ করে আলো নেভানোর মতো ঘুম এসে যায়। কিন্তু ওই রাত্রে আসেনি। ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত একটা কাঁপুনি, মাথা ধোঁয়াটে। সেই ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ফেডারেশন করেছি। মার্ক্স্ পড়েছি। গোর্কির "মাদার" আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে, ভিয়েতনামের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে পথে ঘুরে ঘুরে সাহায্য সংগ্রহ করেছি। আজ অবধি যা লিখেছি তা কখনোই বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনে নয়। সাধারণ মানুষের কথা বলতে চেয়েছি, ধর্মীয় ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লিখেছি। একটু পরিণত বয়সে বুঝেছি, সাহিত্য কম্যুনিজমের পোস্টার নয়। কম্যুনিজমের বাড়াবাড়িতে মৌলবাদের যে চেহারা থাকে তা বর্জন করার চেষ্টা করেছি। যে কারণে বিভূতিভূষণ চিরকালের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ লেখাগুলো তাৎক্ষণিক। যে কারণে জীবনানন্দ জীবনানন্দ, তা কখনোই সুকান্ত অর্জন করতে পারেননি। তবু মূলত বামফ্রন্টকেই সুস্থ জীবনের জন্যে সমর্থন করে এসেছি। আমি কখনোই সক্রিয় রাজনীতি করিনি, কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় অবশ্যই রাজনীতিতে আবর্তিত হয়েছি।

তাই এতকালের সব ভাবনাচিন্তাকে লাথি মেরে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে দিলে শ্বাস ফেলতে কষ্ট হবেই। ঘুম তখন কোথায়!

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে আমি ওঁর ছাত্রাবস্থা থেকে চিনি। সেসময় ওঁকে 'তুমি' বলতাম। পরে, দীর্ঘকাল পরে, যখন উনি তথ্যমন্ত্রী, তখন দেখা হতে কিছুতেই 'আপনি' বলতে পারিনি। তার অন্যতম কারণ, যে বুদ্ধদেবকে আমি একদা জানতাম, তাকে আমি একটুও পালটাতে দেখলাম না এত বছরে। পড়াশোনায় ও যতটা সিরিয়াস ছিল তার থেকে অনেক বেশি মাথা ঘামাত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল নিয়ে। বাইরের বই পড়ত প্রচুর। চায়ের দোকানের আড্ডায় সদ্য পড়া বই নিয়ে মগ্ন থাকত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয় লেখক, আবার জীবনানন্দ দাশ নিয়ে মাতামাতি করত। জানলাম, সে জীবনানন্দকে নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছে। কথায়-ব্যবহারে অত্যন্ত পরিশীলিত। আমি 'তুমি' বলায় মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে একটুও বিব্রত বা বিরক্ত হয়নি।

আমি খুশিতে ছিলাম। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বেরসিক নন। সাহিত্য পড়েন। খেলা বা গান বোঝেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে জোয়ার আনতে চান। তার জন্যে পুঁজিবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ না করেও তাঁদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে তিনি পিছপা নন।

কিন্তু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি একমত। আলাপচারিতার সময় যে বুদ্ধদেবকে মানুষ মনে হত, রাজনৈতিক বক্তৃতার সময় তার সঙ্গে মিল খুঁজে পেতাম না। বানতলার বা খুনের পর জ্যোতিবাবু বলেছিলেন—এমন তো হয়েই থাকে।—সেই ঔদ্ধত্যের জন্যে জ্যোতিবাবুকে নিজেদের মানুষ বলে মনে করেনি কখনও। বুদ্ধদেব রিকশায় চড়েছেন, বই হাঁটেন। বড় কাজের মানুষ। কিন্তু সব বদলে গেল। নন্দীগ্রামে পুলিশের প্রথমবার অত্যাচারে যখন তিনি বললেন, আমাদের ভুল হয়েছিল, তখন অবাক হলাম। স্মৃতিতে কোনো মুখ্যমন্ত্রীর সরল স্বীকারোক্তি খুঁজে পাইনি। ভালো লেগেছিল। সেই একই মুখ্যমন্ত্রী আমলাদের প মন্ত্রীসভাকে অন্ধকারে রেখে, সামনে পুলিশ, পেছনে জঙ্গি ক্যাডার লেলিয়ে দিলেন নন্দীগ্রামে, মহিলা-শিশুদের হত্যা করে তাঁর পার্টির জন্যে জমি দখল করতে? এর পরে আমি কোন আস্থা রাখব? বামফ্রন্টের অন্য তিন শরিক ধিক্কার দিলেন এই ঘটনাকে। বললেন, শোক পুলিশ সরিয়ে নেওয়া না হলে মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে আসবেন। ভাবলাম, ঠিক শুনছি সিপিএমের বদান্যতায় যারা বেঁচে আছে সেই পরগাছাদের মেরুদণ্ড কি শেষপর্যন্ত শক্ত হ

ভাবনায় ভুল ছিল। বামফ্রন্টের মিটিং-এ একটু কুঁই কুঁই করে থেমে গেলেন এঁরা। মন্ত্রিত্ব সুখ। কে আর নিজের পায়ে কুড়ুল মারে! বরং বৃদ্ধ জ্যোতিবাবু তাঁর তিরানব্বই বছরের ব উন্নাসিকতা সরিয়ে দিয়ে সত্যি কথা বলে গেলেন।

আর বিরোধীপক্ষ? নন্দীগ্রামে জমি গ্রহণ করা হবে না ঘোষণা করার পরেও মমতা ব নাটক ছাড়েননি। বরং, নকশালদের দলে টেনেছেন। যেসব দলের কোনো অস্তিত্ব ছিল না, নন্দীগ্রামকে আঁকড়ে ধরে মূল স্রোতে ফিরে আসার জন্যে স্থানীয় কৃষকদের উত্তেজিত করে কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তাদের অবস্থান সম্পর্কে ধোঁয়াশা ছড়িয়েছে।

স্বরাষ্ট্র সচিব ঘোষণা করেছিলেন কবে পুলিশ নন্দীগ্রামে ঢুকবে। বিরোধী নেতারা সেই সময় কেন নন্দীগ্রামের মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়াননি? দাঁড়ালে যদি তাঁদের কারও কারও পড়ত, তাহলে আন্দোলনের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। প্রাণের মায়া বড় মায়া। অসহায় মে লেলিয়ে দেওয়া যায় সামনে, কিন্তু নিজে নিরাপদে থাকাটা খুব জরুরি।

বিরোধী নেতারা নন্দীগ্রামের মানুষদের টোপের মতো ব্যবহার করেছে বললে কি ভুল বলা পুলিশ যদি কৃষকদের খুন করে তাহলে তাঁরা চিৎকার করতে পারবেন, মেধা পাটেকর থেকে অ সাহেব ছুটে আসতে পারবেন, আর তাঁরা নন্দীগ্রামে যেতে যেতে ছি-ছি চিৎকার করে নিজের তলার মাটি শক্ত করতে পারবেন।

এই পরিস্থিতি তৈরি করে দিলেন বুদ্ধদেব। মিথ্যে কথা চিরকালই মিথ্যে। বুদ্ধদেব বে আক্রান্ত হয়ে পুলিশ আত্মরক্ষা করার জন্যে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছে। এই একই কথা সিদ্ধা রায় বলেছেন। বুশ বলেছেন। পুলিশকে মহিলারা লাঠি-ঝাঁটা নিয়ে আক্রমণ করছে আর পুলিশ 'পিঠে' গুলি করছে? পুলিশের সঙ্গে সাদা পোশাকে সিপিএমের জঙ্গিরা যে গুলি ছুঁড়েছিল তা সিবিআই তদন্তে স্পষ্ট। ভয়ে মানুষ পালিয়ে গেলে সেই ক্যাডাররাই নন্দীগ্রামের রাস্তায় লালঝান্ডা উড়িয়ে দিয়েছিল। সিবিআই তাদের অস্ত্রসমেত হাতেনাতে ধরেছে।

বুদ্ধিজীবীরা সবরকম সরকারি পদ থেকে সরে যাচ্ছেন, পুরস্কার ফিরিয়ে দিচ্ছেন ঘেন্নায় পরেও যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁদের যে কোথাও দাঁড়াবার শক্তি নেই!

কিন্তু বুদ্ধদেব শুধু নন্দীগ্রামের মেয়ে-শিশু-পুরুষকেই গুলিবিদ্ধ করলেন না, এই ঘটনার আমরা যারা কম্যুনিজমে আস্থাশীল, তারাও আক্রান্ত।

এপ্রিল ২০০৭

হারাবার ভয়ডর

শ্রী শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাভাজনেষু।

পত্রপাঠের গত সংখ্যায় আপনার লেখা পড়লাম।

আপনার সঙ্গে সুদীর্ঘকাল দেখা হয়নি। এই লেখা পড়ে বুঝলাম আপনি আমাকে মনে রেখেছেন। একজন বয়োকনিষ্ঠ লেখককে একজন অগ্রজ লেখক স্মরণে রেখেছেন, ভাবতেই ভালো লাগে। এটা আগেকার আমলে ছিল। 'অমৃত' পত্রিকায় আমার একটি গল্প পড়ে শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত চিঠি লিখেছিলেন। তাঁকে দেখেছিলাম ওই চিঠি পাওয়ার পরে। শ্রদ্ধেয় সন্তোষকুমার ঘোষ অনুজ লেখকের লেখা পড়তেন। মফস্‌সল থেকে আসা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনে কোনো ভালো লেখা পড়লে সেই অখ্যাত লেখকের প্রশংসা করতেন সুযোগ পেলেই। ইদানীং শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব গুহ এই কর্মটি করেন। পড়েন এবং ভালো লাগলে জানান। আমার যাঁরা অগ্রজ, এখনও লেখালেখিতে আছেন তাঁরা কে কেমন পড়েন জানি না। কারণ তাঁরা জানেন না। আপনিও এতকাল আমার কাছে ওই দলে ছিলেন। কিন্তু আপনার এই লেখা জানাল, আপনি আমার কথা খেয়ালে রেখেছেন। আমি আপ্লুত।

আমরা যখন ছাত্র, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, তখন কফিহাউসে নিয়মিত আড্ডা মারতাম। সে সময়ের যেসব তরুণ কবিদের নিয়ে আমরা কথা বলতাম তাঁরা ছিলেন—শক্তি, সুনীল, বিনয় এবং শরৎ। সেইসঙ্গে অলোকরঞ্জন, অমিতাভ এবং আনন্দ বাগচীও ছিলেন। আমরা পরিচিত না হয়েও আপনাদের নামের পাশে 'দা' যুক্ত করতাম। সেই বয়সে আমি আপনার ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম প্রধানত একটা কারণে। আপনার কবিতায় আশ্চর্য মায়াময় গল্প থাকত। সেই গল্পের টানে কোনো পত্রিকায় আপনার কবিতা থাকলেই প্রথমে সেটাই পড়ে ফেলতাম। অনেক বছর হয়ে গেল। এখন জিজ্ঞেস করলে আমি আপনার কবিতার কোনো লাইন স্মৃতি থেকে তুলে ধরতে পারব না। রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দ, শক্তিদা এবং খানিকটা সুনীলদা ছাড়া পাঠকের স্মৃতিতে জেঁকে বসে থাকলে, তিনি শঙ্খ ঘোষ। লক্ষ্য করুন, তাঁকে দাদা বলার ধৃষ্টতা দেখাতে পারলাম না। আলাপ আছে, খুব অমায়িক মানুষ, তা সত্ত্বেও। কারণ শঙ্খ ঘোষ দূরত্ব রেখে বাস করতে পছন্দ করেন বলে আমার ধারণা। বাকিদের কবিতার লাইন যদি আমরা মনে রাখতে না পারি তাহলে আপনাকে অসম্মান করার কথাই ওঠে না। অলোকরঞ্জন, অমিতাভ বা বিনয়ের কবিত্ব সম্পর্কে মূর্খও প্রশ্ন তুলবে না। আপনার ক্ষেত্রেও তাই।

শুনেছি আপনি খুব মোটা মাইনের বড় চাকরি করতেন। একদিন সেসব ছেড়ে বাংলা ভাষার সেবা করতে নেমে পড়েছিলেন। নেমে দেখলেন আপনার সমসাময়িক কবিরা অনেকটা এগিয়ে গেছেন। সুনীলদা তো কবিতার পাশাপাশি উপন্যাস, গল্প, ফিচার লিখে যথেষ্ট জনপ্রিয়। শক্তিদাও চেষ্টা করলেন উপন্যাস লিখতে। সেটা ক্লিক্ করল না। আপনিও ঔপন্যাসিক হতে চাইলেন। তখনও

বোঝেননি, জীবনানন্দ দাশকে বাঙালি মনে রাখবে তাঁর কবিতার জন্যে উপন্যাসের জন্যে ন বুঝতে বুঝতে আপনার দেরি হয়ে গেল। এখনও আপনার কবিতা দেখলেই পড়ে ফেলি ভালো লাগে। তবে, সেই আশ্চর্য মায়া খুঁজে পাই না। বয়স হয়তো আপনাকে এ ফিলজফিক্যাল করেছে।

আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ। এই লেখায় কনিষ্ঠ হয়ে যদি আপনার কিছু ভুল সংশোধন করিয়ে দি নিশ্চয় আপনি খুশি হবেন।

বাঙালি লেখকরা লিখে ধনী হতে পারেন না বলে একটা কথা চালু ছিল। তাঁদের চাক হয়েছে। সমরেশ বসুও, কিছুদিন চাকরি করলেও, তিনিই প্রথম জানিয়েছিলেন, লেখার টা থাকা যায়। আমি চাকরি ছেড়েছি একুশ বছর আগে! এই একুশ বছর ধরে লেখার জ টাকায় দিব্যি বেঁচে আছি। বাড়ি নেই কিন্তু গাড়ি আছে, ভালোমন্দ খেতে এবং পান কর বিদেশে যাই নেমন্তন্ন পেলেই। আপনি লিখেছেন, আমি প্রচণ্ড ধনী ব্যক্তি। প্রচণ্ড ধনী ম বিড়লা অথবা বিল গেট্‌স্ অথবা মণি ভৌমিক। যেহেতু 'কালবেলা' একলক্ষ কপি বিক্রি এবং তার দাম একশো টাকা তাই আপনি অঙ্ক করেছেন, আমি আনন্দ থেকে পনেরো ক পেয়েছি ওই বইয়ের জন্যে। এরকম বই আমার আরও কুড়িটি থাকলে তিন কোটি টা পকেটে ঢুকেছে।

এসব পড়ে আপনার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দেহ হচ্ছে। গত পঞ্চাশ বছরে লিখ কোনো বাঙালি লেখকের কুড়িটি বই লক্ষ কপি করে বিক্রি হয়েছে? কুড়ি কেন, পাঁচটি পরিমাণ বিক্রি হয়েছে কতজনের? আমার জানা নেই। কালবেলা যখন প্রথম বের হয়, তিরিশ টাকা। তারপর বাড়তে বাড়তে চল্লিশ-পঞ্চাশ হয়ে একশোতে পৌঁছেছে চব্বিশ বছরে আপনিও কি অঙ্কে কম্পার্টমেন্টাল পেয়েছিলেন স্কুল ফাইন্যালে?

আপনি লিখেছেন, শ্রদ্ধেয় গজেন্দ্রকুমার মিত্র, যিনি আমার উত্তরাধিকার-এর প্রকাশ সুপারিশ করায় দ্বিতীয় গ্রন্থ কালবেলা আকাদেমি পেয়েছিল। প্রথম কথা, গজেন্দ্রকুমারের সে ছিল কি না জানি না। কিন্তু একজন প্রকাশক চাইবেন তাঁর বই বেশি বিক্রি হোক। ি আনন্দ-র বইকে সুপারিশ করতে যাবেন? এসব কথা লেখা যে ছেলেমানুষি তা আপ বোঝাবে!

শ্রদ্ধেয় বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তার একমাত্র সাক্ষী শ্রদ্ধেয় ঘোষ আজ জীবিত নেই। মৃত ব্যক্তির মুখে সংলাপ বসানো অত্যন্ত সহজ কাজ। কিন্তু সেই গিয়ে আপনি শক্তিদাকে অপমান করলেন কেন? সুনীলদার বাড়িতে বুদ্ধদেবদা যখন অ পান করাতে করাতে তাঁর উপন্যাস শোনাচ্ছেন (আপনার লেখা) তখন গন্ধে গন্ধে শক্তি হাজির হয়েছিলেন। পড়লে মনে হয় শক্তিদার ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল ছিল, বাতাসে মদের গন্ধ করে উৎসে চলে যেতেন। গন্ধে গন্ধে হাজির হয় শকুন, শেয়াল। ব্যক্তিগত রসিকতাকে লেখা কি অসৌজন্য নয়?

গত চার মাসে আমি চল্লিশটা আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম প্রধান অতিথি হয়ে কলকাতার বাইরে জন্যে। গেলে আশিটি দিন নষ্ট হত। বিনিময়ে চল্লিশটা ফুলের মালা বা মেমেন্টো পেতা ওই আশি দিন না লিখলে আমার সম্পাদকরা বা প্রকাশকরা বিপদে পড়তেন। তাই সভা-স এড়াতে আমি পারিশ্রমিকের কথা বলি, যাতে ভিড় পাতলা হয়। ওঁরা গায়কদের প্রচুর টা নিয়ে যাবেন যে সভায়, সেই সভায় লেখকদের টাকা দেবেন না। আমি এরও প্রতিবাদ করে টাকা নিয়ে আরও ধনী হতে নয়। আপনি লিখেছেন সুনীলদা অসুস্থ হওয়ায় উদ্যোক্তারা ত চাইছে আর আপনি হাসিমুখে ছুটে যাচ্ছেন। অর্থাৎ সুনীলদা অসুস্থ হওয়ার আগে আপনা ছিল না। বোধহয় আপনার ওপর লেখার চাপ নেই, বাড়িতে থাকা আর যাওয়া একই ব্যাপ

মেমেন্টো সংগ্রহ করতে আপনি প্রধান অতিথি হয়ে চলেছেন। আবার লিখেছেন, সেগুলো বিক্রি করে দেন সংখ্যা বাড়লেই। সেই বিক্রি থেকে পাওয়া টাকা নিয়ে কী করেন তা লেখেননি।

আপনি লিখে টাকা পাননি। অনেকেই পান না। শুনেছি লিখে যাঁরা টাকা পান তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক। যে ছবি হিট করে তা বাজে ছবি। এইসব অসার তথ্যের আনন্দে থাকুন, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সত্যি না জেনে লিখতে গেলেন কেন? আপনি, শক্তিদা, সুনীলদা একদা ঝড়ের মতো এসেছিলেন। শক্তিদা নেই, কিন্তু তাঁর কবিতা বহুদিন থেকে যাবে। সুনীলদাকে নিয়ে এসব কথা আপনি লিখতে পারলেন না কেন? আমার যদি, আপনার হিসেবে, তিন কোটি টাকা রোজগার হয় তাহলে হিসেব করে দেখুন, একই ফর্মুলায় ফেললে সুনীলদার তিরিশ কোটি হয়ে যাবে।

আকাদেমি পেতে হলে কয়েকজনের সুপারিশ দরকার হয়। খোঁজ নিলে তাঁর নামও পেয়ে যাবেন। আরও খেলিয়ে লিখতে পারতেন সুনীলদাকে নিয়ে।

শ্রদ্ধেয় সমরেশ বসু একটি গল্প লিখেছিলেন, 'হারাবার ভয়ডর'। সুনীলদাকে নিয়ে লিখতে কি সেই 'ভয়ডর' পেয়েছিলেন? এখনও কিছু আশা বুকে আছে বলেই একদা-বন্ধুর স্নেহধন্য হয়ে থাকতে চাইছেন এখন?

অসাফল্য মানুষকে হতাশ করে, এটা সত্যি কথা। কিন্তু তাই বলে অসুস্থ করবে কেন?

মে ২০০৭

জে

কিছুদিন আগে সায়েন্স সিটিতে কলকাতার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়ন-উ সমর্থন করতে একটি সভা করেছিলেন। একটি সংবাদপত্রে তার বিবরণ পড়ে আমি স্তম্ভিত হ আজকাল কাগজে অনেক বানানো কথা ছাপা হয় ভেবে অন্য কয়েকটা কাগজ কিনে দেখল প্রায় এক কথা লিখেছেন। অর্থাৎ একজন সাংবাদিকের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়।

ঘটনাটি এইরকম। নন্দীগ্রামে পুলিশের ভূমিকায় মুখ্যমন্ত্রী দুঃখপ্রকাশ করেছেন। তা সং নাট্যকর্মী এবং লেখক সরকার-বিমুখ হয়েছেন। যাঁরা সরকারমুখী, তাঁরা সেদিন বোঝাতে উন্নয়ন একটি দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে কতটা জরুরি। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এক বললেন,—নন্দীগ্রামে মানুষ গুলিতে মারা গিয়েছেন বলে বিরোধীরা প্রতিবাদ করছেন। বি জানেন না, এই ঘটনার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নীরবে চোখের জল ফেলেছেন, খেতে বং মুখে তুলতে পারেননি।

বক্তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়েছিল তিনি যে-কোনো মুহূর্তে কেঁদে ফেলবেন এবং প্রে আবহাওয়া করুণ হয়ে উঠেছিল।

প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী নির্বোধ নন। তিনি ড্যানিয়ুবের কাহিনী জানেন। সমুদ্রের ঢেউ এসে সম্রাটে কুর্নিশ করছে বললে সম্রাট খুশি হতে পারেন, কিন্তু দেশ-বিদেশের সাহিত্যে ডুবে থাকা কথাগুলো শুনে বিরক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বক্তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেওয়া হয়তো সেটা অভদ্রতা হত, আবার কথাগুলো শুনতেও তাঁর আদৌ ভালো লাগেনি।

এই জো-হুজুরের দল প্রভুর যতটা উপকারে আসেন, তার চেয়ে অনেক বেশি অপব থাকেন। আমি একশো ভাগ নিশ্চিত যে ওই বক্তা কয়েক মাসের মধ্যে আড়ালে মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলবেন। কারণ, এতটা তৈলমর্দন করেও তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে কোনো সুবিধে করতে পারবেন না। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই চাটুকারদের একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত সহ্য মাথায় উঠতে দেন না। না দিলেই চাটুকারের মুখের ভাষা বদলে যায়।

যার হাতে ক্ষমতা, তার চারপাশে চাটুকার ছুটে যাবেই এবং তারা হুজুর য তা-ই বেদবাক্য বলে পাঁচজনকে জানাবে। এই জো-হুজুরদলের কোনো মেরুদণ্ড নেই। নিজস্ব পরিচয় নেই। হুজুর যে-কথা নিচু গলায় বলেন এরা সেটা ঢাক পিটিয়ে বলে থাকে। ে চাটুকার, চামচা, খোসামুদে পার্শ্বচর ইত্যাদি নানান নামে আদিকাল থেকে এঁরা ক্ষমতাবানদে থেকে গেছেন। কিন্তু তখন এদের উদ্দেশ্য ছিল চাটুকারিতা করে জীবনধারণের জন্যে প্র অর্থ সংগ্রহ করা, সংসার চালানো।

কিন্তু এখন উদ্দেশ্যটা বদলে গেছে। এখন শুধু অর্থ নয়, যশপ্রার্থী হয়ে ক্ষমতাবানদের ছায়া হয়ে থাকতে চান যাঁরা তাঁরা বেশি বিপজ্জনক। ধরা যাক, কোনো বহুল প্রচারিত পত্রিকার কবিতা বা গল্প-সম্পাদক, যিনি নিজে কবি বা গল্পকার হিসেবে অত্যন্ত সম্মানীয়, তাঁর চারপাশে কবি বা লেখক হতে চাওয়া চাটুকাররা ভীড় জমাবেই। তারা বাজার থেকে পোনা বা বাগদা চিংড়ি কিনে সম্পাদকের বাড়িতে পৌঁছে বলবে—বউদি, আমাদের পুকুর থেকে উঠিয়ে এনে দিলাম। যাঁর মদের দোকান আছে তিনি সম্পাদকের বাড়িতে পার্টি হলেই বিনা পয়সায় মদ সাপ্লাই করেন। আর তিনি যদি যশপ্রার্থিনী হন এবং সেইসঙ্গে সুন্দরী, তাহলে সম্পাদকের সামনে বসলেই অকারণে কাঁধ থেকে আঁচল খসে পড়বে। দেবতারাও গলে যান, সম্পাদক তো মানুষ! তাঁকেও ঢোঁক গিলে কবিতা একটু-আধটু এডিট করে, গল্প কাটাকুটি করে ছাপতে হয়। জনপ্রিয় পত্রিকায় লেখা ছাপা হওয়ামাত্র কবি বা লেখক জাতে ওঠেন। কবি হলে যে-কোনো কবি সম্মেলনে কবিতা পড়ার হক্ জন্মে যায়। কবি-সম্পাদকের ক্ষমতা অসীম। তিনি যদি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের বলে দেন, ওহে, ওকে একটু সুযোগ দিয়ো, তাহলে বাদ দেবে—কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে? কলকাতা তো বটেই, ঢাকায় কবিতা পড়তে যাওয়া আটকায় কে? কিন্তু এই যশের আয়ু বেশিদিন নয়। সম্পাদকও মুখ ফিরিয়ে নেবেন। পাঠকরা তো প্রথম থেকেই উদাসীন। এঁরা তখন নাতি-নাতনিদের গল্প করেন—জানিস, আমি এককালে ওই কাগজে রেগুলার লিখতাম; এই দ্যাখ।

এই যে আগাছারা মোসাহেবি করে জায়গা পেলেন, তাতে আপত্তি করার কিছু থাকত না, যদি সত্যিকারের সম্ভাবনাময় লেখকের ডাকে আসা লেখা জায়গার অভাবে দপ্তরে পড়ে না থাকত।

জানি, প্রতিভাকে চেপে রাখা যায় না। একদিন তা প্রকাশিত হবেই। কিন্তু আগাছাদের কারণে অনেকের ক্ষেত্রেই দেরি হয়ে যায়।

আমি যখন টেলি সিরিয়াল করতে যাই, সেই চুরাশি সালে, তখন আর কেউ ছিলেন না। জ্যোছ্নদা, শ্যামল আর আমি তেরো পার্বণ করেছিলাম। সিনেমার বাইরে একদল নতুন ক্যামেরাম্যান, এডিটরদের নিয়ে কাজ করেছি। পরে যখন নিজের প্রোডাকশন হাউস করলাম তখন চাটুকারদের ভিড় জমতে লাগল। একজন চাটুকার মুখ থেকে কথা খসার আগেই বুঝে ফেলত, এবং দেখতাম কাজটা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সে সবসময় আমাদের পাশে ছায়ার মতো লেগে থাকত আর স্তাবকতা করত। খোঁজ নিয়ে জানলাম, ওকে যা করতে বলেছি তা নিজে না করে সহকারীদের ওপর চোখ রাঙিয়ে ও করিয়ে নিয়ে আমাদের কাছে বাহবা কুড়োয়। লোকটি সৎ ছিল, কিন্তু অলস এবং ইনএফিসিয়েন্ট। তখন প্রশ্ন উঠেছিল, কে বেশি গ্রহণীয়? সৎ ইনএফিসিয়েন্ট না অসৎ এফিসিয়েন্ট? একজন লোক ঠিকঠাক কাজ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে করায়, কোথাও কাজ ঠেকে যায় না তার দক্ষতার কারণে, কিন্তু সে নতুন শিল্পীদের সুযোগ দেওয়ার অজুহাতে তাদের রোজগারের টাকা থেকে কমিশন নেয়, খাবার সাপ্লাই যে দেয়, তার কাছ থেকে টাকা নেয়,—তাকে কি আমরা ছাঁটাই করব না রাখব?

ব্যবসার কথা ভাবলে দ্বিতীয় লোকটিকেই মেনে নিতে হবে, কারণ কাজটা ঠিকঠাক হওয়া দরকার।

দুই মোসাহেবে নির্জনে বসে কথা বলছিল। একজন বলল,—আমি এতকাল জানতাম বস-কে সন্তুষ্ট করতে আমার মতো চামচেপনা আর কেউ করতে পারে না। কিন্তু আমাকেও একজন টেক্কা দিয়েছে।

—কীরকম?

—কদিন আগে বস-এর সঙ্গে তার বউয়ের ঝগড়া হচ্ছিল। বউ বলছিল, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। নইলে সকালে পূর্বদিকে থাকে, বিকেলে পশ্চিমে চলে যায় কী করে?

বস অনেক বোঝাল, কিন্তু কে শোনে সেসব কথা! তারপর থেকে দেখছি সারা শহরে ছেয়ে গেছে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে। দেখে বস-এর বউ খুশি হবে। বউ খুশি হ হাত করা যাবে।

দ্বিতীয়জন হো হো করে হাসল,—ওটা নিশ্চয়ই বস পয়সা দিয়ে ছাপিয়ে দেয়ালে সেঁটেছে

—সেকী! কেন?—প্রথমজন অবাক।

—জানিস না? আমাদের বস তো বউয়ের একনম্বর চামচে। ঝগড়ার পর শোওয়ার ঘর হয়ে গিয়েছিল, পোস্টার দেখে বউ আবার এক ঘরে শুচ্ছে।

জুন ২০০৭

পুত্রদায়

বিবাহিত মেয়ের বাড়িতে তিন রাত্তিরের বেশি বাস করার কথা অনেক বাঙালি বাবা ভাবতেই পারেন না। এর কারণ এই নয়, জামাই এবং তার মা-বাবা প্রমুখের সঙ্গে বাস করতে তিনি অস্বাচ্ছন্দ বোধ করবেন। মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে যদি তৃতীয় ব্যক্তি নাও থাকে তবু তাঁর অস্বস্তি যায় না। কারণ সন্তানটি তাঁর কন্যা, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে আসার সময় ধান-চাল দিয়ে পিতৃঋণ শোধ করিয়ে আসতে যাকে বাধ্য করেছেন, তার বাড়িতে তিনি কী করে থাকেন!

সাতষট্টি সালের ঘটনা। পরিবারের ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেয়ে এম.এ. পাশ করে কলেজে চাকরি পেয়েছে। বাবার অবসর নেওয়ার আর বছর দেড়েক বাকি। ছোটভাই সামনের বার এম.এ. দেবে। মাইনে পেয়ে মেয়ে এসে মায়ের হাতে টাকা দিতে মা বলল,—তোর কাছে রাখ। ব্যাংকে রেখে দে। তোর বাবা টাকা নিতে নিষেধ করেছে।

মেয়ে জিজ্ঞেস করল,—কেন?

মা বলল,—তোমার বাবার তো এখনও চাকরি আছে, কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

এম.এ. পাশ করে ভাই যখন চাকরি পেল এবং মাইনের অর্ধেক টাকা মায়ের হাতে দিল তখন তিনি সেটা সগর্বে গ্রহণ করলে মেয়ে প্রশ্ন তুলল,—বাবার তো এখনও চাকরি আছে, তাহলে ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিচ্ছেন কেন?—উত্তরটা ছিল—তুই তো বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে চলে যাবি। তখন তো আর টাকা দিতে আসবি না; কিন্তু ভাই তখন সংসারের হাল ধরবে। তাই এখন থেকে ওর কাছে নিতে আপত্তি করব কেন?

সেই বাবা এখন জীবিত নেই। মা-ও মারা গিয়েছেন। থাকলে দেখতে পেতেন, চাকরি-করা বাঙালি মেয়েদের অধিকাংশই বিয়ের পরেও মা-বাবার পাশে আর্থিক সাহায্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এমনকী গড়িয়া থেকে বেলঘরিয়ায় গিয়ে মা-বাবার সাপ্তাহিক বাজার, ওষুধপত্র কিনে দিয়ে আসেন।

চোখ খুলছে একটু একটু করে। কিন্তু বেশিরভাগই এখনও অন্ধ সেজে আছেন।

দু-তিন দশক আগেও একটি পুত্রের জন্যে বাবা মরিয়া হয়ে উঠতেন। একের পর এক মেয়ে হয়ে যাচ্ছে তবু পুত্রচেষ্টায় খামতি নেই। কারণ পুত্র তাঁর স্বর্গে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। তাঁর মুখাগ্নি থেকে শুরু করে বংশরক্ষা করবে। চাকরি থেকে অবসর নিলে তাঁকে খাওয়াবে পরাবে। মেয়ে জন্মেছে গোত্রান্তরের জন্যে, পুত্র গোত্র রক্ষা করবে? ভদ্রলোককে যদি জিজ্ঞেস করা হয়—গোত্রটা পেলেন কোথায়? তিনি বলবেন—বাপ-ঠাকুরদার কাছ থেকে। কিন্তু হাজার বছর আগে বাঙালি বলে কোনো জাত ছিল না। ভাষা, ধর্ম ছিল না। এই গোত্র-ভাবনা আট-নশো বছর আগে কুলগুরুর কাছ থেকে বাঙালি পেয়েছেন। এসব কথা শুনতে বাঙালির ঠিক পছন্দ হয় না।

বাঙালির পরিবার যতদিন একান্নবর্তী ছিল ততদিন পুত্র পিতামাতার প্রতি দায়িত্বশীল ছিল। পরিবার

ভাঙল। ছেলেরা শৈশব থেকে ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হতে হতে বড় হল। খেলাধুল শিকেয় উঠল। পড়াশোনা ছাড়া তাদের জীবনে অন্য কোনো কর্ম নেই। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সায়েন্সে অথবা এম.বি.এ. ডিগ্রি নিয়েই তাদের ব্যস্ততা কলকাতা ছেড়ে বিদেশে অথব অথবা হায়দরাবাদে পাড়ি দিতে। যে ছেলে তাঁর স্বর্গের বাতি জ্বালাবে সে যখন তিনম নামমাত্র ফোন করে দায়িত্ব সারে তখন গুমরে মরেন বাবা-মা। এখনকার ছবিটা এই নব্বুইভাগ পিতামাতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন চাকরিরতা মহিলারা।

ধৃতরাষ্ট্র শুধু অন্ধ ছিলেন না, ছেলেদের ক্ষেত্রেও সেই অন্ধত্ব কাজ করেছে। বিখ্যাত ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম খুব কম দেখা যায়। ক্ষমতা হাতে থাকলে পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত ক মরিয়া হয়ে ওঠেন। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় সম্পর্কে একটি গল্প দুই সাংবাদিক বিধান রায়কে নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি দুর্গাপুর, কল্যাণী পশ্চিমবাংলার উন্নয়নের জন্যে অনেক ভাবনাচিন্তা তাঁর। এ কথা সবাই জানেন। অসৎ উপা করেন না, কারণ তাঁর নিজের অবস্থা বেশ ভালো। একজন সাংবাদিক হেসে বললেন হিসেবে অসাধারণ। দ্বিতীয় জন এত ভালো পছন্দ করছিলেন না। বললেন,—শুনেছি ওঁর একটু বেশি। প্রথম জন বললেন,—থাকলেও সেগুলো তো লাইম লাইটে আসেনি। বললেন,— পথের পাঁচালী ছবি দেখে উনি মর্ম ভালোভাবে বুঝতে পারেননি। টাকা গ্রামভিত্তিক ছবি বলে। প্রথম জন বলেন,—তাই বা কে দিয়েছিল? দ্বিতীয় জন বললে মানে লোকটার কোনো খারাপ দিক নেই? প্রথম জন হাসলেন,—কী করে থাকবে? বি তাই পুত্র নেই। পুত্র থাকলে তুমি অনেক দুর্নীতির রসদ খুঁজে পেতে।

প্রফুল্ল সেন বা অজয় মুখার্জী অবিবাহিত ছিলেন। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর একটি কন্যা, মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পুত্র আছে। এবং তাকে নিয়ে নানান গল্প প্রচলিত। কেউ কেউ ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে তিনি তুলনীয়।

ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পরে রাজীবের কোনো যোগ্যতা ছিল না প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। প্রধানমন্ত্রী করতে হয়েছিল। তাঁর পুত্র হিসেবে রাহুল তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হও এসব ক্ষেত্রে যোগ্যতার কোনো বিচার হয় না। পুত্রের অযোগ্যতা পিতার চোখে কখনও না। কজন শচীনদেব বর্মণের মতো ভাগ্যবান হন? শচীনদেব ছেলেকে সুযোগ না করে দি অনেক সংগ্রাম করতে হত। কিন্তু তিন পুরুষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, কোনো পুত্র সাহায্যের দরকার নেই, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নেই, উপেন্দ্র-সুকুমার-সত্যজিৎ।

পুত্রধন বড় ধন বলে যেসব পিতা গর্বিত তাঁদের সবসময় ভয়, কখন ধন হাতছাড়া বেছেবুছে এমন পুত্রবধূ নিয়ে আসেন যে মাথা নিচু করে থাকবে। মুশকিল হল, এখন ষোলো বছরের কিশোরীকে পুত্রবধূ করা যায় না; বাল্যকাল থেকে ছেলেও শিখে গে হতে। অতএব শিক্ষিতা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যে যত তাড়াতাড়ি পারে বাবা-মায়ের কাছ সরে যেতে চায়। পুত্র যে আর ধন নয়, ভবিষ্যতের ব্যাংক-ব্যালেন্স হিসেবে কাজ করবে বাতি জ্বালাবে না—এই সত্য বাঙালি সবে বুঝতে আরম্ভ করেছে।

জুলাই ২০০৭

ভালোবাসা, রাগ-অভিমান

মাঝে মাঝে নিজের ওপরেই রেগে যাই। কী দরকার ছিল লেখালেখি করার? মফস্‌সল শহরের লাইব্রেরির বইগুলো গিলতে গিলতে কলকাতায় এসে বাংলা পড়তে পড়তে কেন যে মাথায় লেখার ভূত চাপল! না চাপলে আজ স্বস্তিতে থাকতাম। সেটা, সেই শুরুর সময়ে মনে হত শুদ্ধ সাহিত্য করব। জীবনের কথা লিখব অকপটে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ তারশঙ্কর বিভূতিভূষণ যা লিখে গিয়েছেন তাকে আরও আধুনিক চেহারা দেব সাহিত্যে। কোনো আপস নয়। বুর্জোয়া শক্তির যেমন দালালি করব না তেমনি ইজমের মৌলবাদের কাছে মাথা বিকিয়ে দেব না। অর্থাৎ একজন স্বাধীনচেতা লেখক হিসেবে বেঁচে থাকব।

সামনে নজির ছিলেন অনেকেই। প্রথমেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দীর কথা মনে পড়ত। মানুষের কথা লিখতে গিয়ে আপস করেননি ভদ্রলোক। লিখে যা পেতেন তাতে অভাব ঘুচত না। ছোট্ট ফ্ল্যাটে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেও লিখে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। কয়েকবার গিয়েছি ওঁর কাছে। আর ভেবেছি এরকম জীবননিষ্ঠ লেখককে বাঙালি পাঠক অন্তত দুধে-ভাতে রাখল না কেন? পরক্ষণেই মনে হয়েছে উনি ওঁর কর্তব্য করেছেন, পাঠক যোগ্য হতে পারেনি, সেটা তাদের দুর্ভাগ্য।

তখন যাঁরা সাহিত্য এবং সততাকে একত্রিত করেছেন, লিখে মন না মানলে ছিঁড়ে ফেলতেন, সেই বিমল কর, রমাপদ চৌধুরীরা অবশ্য বড় কাগজে চাকরি করতেন। কিন্তু কখনও চাকরির জন্যে লেখার সঙ্গে আপস করেননি। তাঁদের পাঠক ছিল, কিন্তু তারা বই কেনার ব্যাপারে কার্পণ্য দেখিয়েছে। আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন সমরেশ বসু। একটি পত্রিকায় কিছুদিন সম্পাদকের ভূমিকায় চাকরি করা ছাড়া লিখে রাজার মতো বেঁচে ছিলেন। এবং কয়েকটি সিনেমার পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা ছাড়া বেশিরভাগই ছিল সৎ সাহিত্যের নিদর্শন।

অর্থাৎ এইসব ভাবনা নিয়ে বড় হয়েছি। আমার কোনো দল ছিল না অথবা কোনো দল আমার পাশে দাঁড়িয়ে মদত দেয়নি। শুরু থেকেই আমি সেইসব বিষয় নিয়ে লিখতে চেয়েছিলাম যা আগে কেউ লেখেননি। ফলে কারও সঙ্গে আমার তুলনা করার সুযোগ ছিল না। আমার চারপাশের মানুষদের অন্যরকম চেহারা লেখায় ধরতে চেয়েছি। দেখা গেল আমারও কিছু পাঠক তৈরি হয়ে গেল। তাঁরা প্রতি বছর আমার কাছে ভালো লেখা চাইছেন এবং আমি সেটা দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছি। তার বদলে তথাকথিত যাবতীয় সুখের চাবি আমার পকেটে চলে এল। বুদ্ধিজীবীরা জনপ্রিয় লেখকদের এককথায় বাতিল করে দেন। কিন্তু আমাকে তাঁরা না পেরেছেন গিলতে না ওগরাতে।

প্রথম গল্প বেরিয়েছে চল্লিশ বছর আগে, প্রথম উপন্যাসের বয়স বত্রিশ বছর। প্রতিটি সকালে কলম নিয়ে বসতে হয় হাজারখানেক শব্দ লেখার জন্যে। না লিখলে কথার খেলাপ হয়ে যাবে। আমি নাকি কথা দিলে কথা রাখি। এই কথা রাখার যন্ত্রণা যে কী ভয়ানক তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি। রমাপদদা বছরে একটা উপন্যাস লিখতেন। আমাকে পাঁচ-ছ'টা লিখতে হয়। কেন লেখেন

মশাই? কাগজের সম্পাদকরা যখন অনুরোধ করেন তখন না না বলতে বলতেও হ্যাঁ বে লিখে টাকা পাই বলেই কি লিখি? আমি এখন বলি শ্রমের বিনিময়ে টাকা পাই। এব কাগজ পত্রপাঠ, প্রায় আশিটি সংখ্যায় লিখে গিয়েছি ফিচার, শেখরের ভালোবাসার বিনিম পত্রপাঠে লিখতে পরিশ্রম হয় না। নিজের বিছানায় শুতে যেমন হয় না। যেমন ইচ্ছে তেম যায়। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে তো তা হয় না!

জমার খাতা প্রায় ভরে গেছে। পেয়েছি প্রচুর। বাংলাদেশি কাস্টম্‌স্ অফিসার থেকে ে রাঁধুনি—পেয়েছি অনেকের কাছে।

কিন্তু রোজ সকালে ভাবি, আর নয়। এবার কলম তুলে রাখি। অনেক হয়েছে সমরে খাওদাও, পড়ো আর বেড়াও। মাঝে মাঝে মনে হয়, ঈশ্বর যদি আমার গলায় সুর দিে আমি যদি ভালো খেলোয়াড়, অথবা অভিনেতা হতে পারতাম তাহলে রোজ টেবিলে ঝুঁ খোঁজ নিতে হত না। খুব আন্তরিকভাবে যে লেখা লিখলাম তার পাঠক বললেন—দূর! এট মজুদারের লেখাই নয়। আবার বেশ তাড়াহুড়ো করে যে লেখা লিখলাম তার প্রতিক্রিয়া হল তখনই রাগটা বেড়ে যায়।

কলকাতার প্রকাশকরা যে যা বলেন তাই বিশ্বাস করতে বাধ্য। সমরেশবাবু, আপনা বছর দেড় হাজার বিক্রি হয়েছে। হেসে বলি, বাঃ, খুব ভালো। যদি বলেন পাঁচশো বিক্রি তাও মানতে হবে। বিক্রির সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ করলে মন ছোট হয়ে যাবে। সেটা কি প ভদ্রলোক প্রেসের মালিক। আমার এক প্রকাশক তাঁর প্রেস থেকে আমার বই ছাপেন বছর ধরে। হঠাৎ ওই দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হল। প্রকাশক আর ওঁর প্রেসে বই না। প্রেসের মালিক এলেন আমার কাছে। জানালেন, তিনি এতদিন ধরে প্রকাশকের আদেশে করেছেন। তিন হাজার বই ছেপে এক হাজার বলেছেন। প্রকাশক নাকি দু'হাজার গোপ করেছেন, আমাকে জানাননি। উত্তেজিত হয়ে তাঁকে বললাম আমার সঙ্গে প্রকাশকের কা উনি রাজি হলেন না। উনি ফাঁস করে দিয়েছেন জানলে অন্য প্রকাশকরা তাঁর প্রেস ে ছাপবেন না।

রাগ হল। কিন্তু সেটা না গিলে উপায় কী?

কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের পাইরেট প্রকাশকরা আমার সব বই হুবহু ছেপে ে পাঠকদের কাছে অল্প দামে বিক্রি করছেন। এ দেশ থেকে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয় আগে একটি বই হাতে এল। গৌরকিশোর ঘোষের উপন্যাস "প্রেম নেই" আমার না বই হয়ে বেরিয়েছে ঢাকা থেকে। বিক্রি হচ্ছে নিউ ইয়র্কেও।

বইটি দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল পাইরেটরা আমাকে ধর্ষণ করছেন। সম্মানের কথা ওঁরা চিন্তাও করেননি। জানলাম, যেহেতু আমার বই-এর পাঠক আছে এবং দু গৌরদার নাম কিশোর তরুণ পাঠকদের কাছে অপরিচিত তাই আমার নামটা ব্যবহার কর বিক্রির জন্যে। এ যে কত বড় লজ্জাজনক ঘটনা। তাও আমাকে হজম করতে হচ্ছে।

তাই মাঝে মাঝে রাগ হয়।

চারপাশে এত অনৈতিক মানুষের ভীড় যে তাদের কাছে আমরা শক্তিহীন। তাই শুধু র আক্ষেপ করা ছাড়া আর একটি পথ আছে—

সেটা হল, কলম বন্ধ করা।

আগস্ট ২০০৭

দশে মিলি করি কাজ

বাইশ বছর বয়েসে আমি যখন সর্ব অর্থে বেকার, কলকাতায় থাকার জায়গা নেই, এর ওর দয়ায় কখনও ছুটির পরে কোনো অফিসের টেবিলে, কখনও বন্ধুর বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে রাত কাটাচ্ছি, দুপুরে প্রুফ দেখছি আর্মহার্স্ট স্ট্রিটের এক প্রেসে বসে আর দৈনিক একটাকার রোজগারে কফি হাউসে ঢুকে গলা ফাটাচ্ছি, ঠিক তখনই দুম্-করে একটা সরকারি চাকরি পেয়ে গেলাম। এম.এ. পড়ার সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু চাকরির বিজ্ঞাপন দেখলেই চিঠি পাঠাতাম। সেসব বিজ্ঞাপনে শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল অনার্স গ্র্যাজুয়েট। চাকরিগুলো ছিল আপার ডিভিশনের কেরানি অথবা ফুড ইন্সপেক্টরের। ব্যাংক বা সরকারি অফিসের বিজ্ঞাপন আমাদের আকর্ষণ করত। কলকাতায় থাকতে হলে টাকা চাই। যদি একটা চাকরি জুটে যায় তাহলে আমরা এই শহরে থেকে কেউ কবি কেউ অভিনেতা হওয়ার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি। সিক্সথ্ ইয়ারে পড়ার সময় হঠাৎ একটা সরকারি অফিস থেকে আমাদের আবেদনের জবাবে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার চিঠি এল। আমরা দল বেঁধে গেলাম, যেন সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। কোনো প্রস্তুতি ছিল না। থাকার কথাও নয়।

দৈনিক একটাকায় থাকা-খাওয়ার সংগ্রাম যখন চলছে তখন দুশো আটাশ টাকার মাইনে জানিয়ে সরকারি চাকরির চিঠি পেয়ে মনে হয়েছিল টাটা-বিড়লা হয়ে গেছি। আমার ওই চাকরিতে লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়নি, তিনজন লোক যেসব প্রশ্ন করেছিলেন তার জবাব যেমন জানি দিয়েছিলাম। এতেই যে চাকরি পাওয়া যায়, কল্পনা করিনি।

প্রথম দিন নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে নির্দিষ্ট অফিসারকে চিঠিটা দেখাতে তিনি সুপারভাইজারকে ডেকে দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। সুপারভাইজার প্রৌঢ় মানুষ। বললেন,—আপনি অন রেকর্ড আজ থেকেই জয়েন করলেন, কিন্তু এখন বাড়ি চলে যান।

—কেন?

—বারোটা থেকে 'পেন ডাউন' ডেকেছে ইউনিয়ন। কেউ কাজ করবে না।

—কী করবে?

—বসে কাগজ পড়বে, আড্ডা দেবে, নয়তো সিনেমা দেখতে চলে যাবে। ভদ্রলোক ভেতরে চলে যাওয়ার পরে আমি লিফ্টের দু'পাশের দেয়ালে সাঁটা পোস্টার পড়তে লাগলাম। 'অবিলম্বে পে কমিশনের রিপোর্ট বের করতে হবে।' 'শূন্য পদে লোক নিয়োগ করতে হবে।' 'কেন্দ্রীয় সরকারের কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও।' মনে হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার একটা বুর্জোয়া, স্বৈরাচারী সংস্থা, যারা কর্মচারীদের ওপর অত্যাচার করছে। কর্মচারীরা তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পুরো ধর্মঘট না করে পেন ডাউন ধর্মঘট কেন?

উত্তরটা জানতে পেরেছিলাম চাকরিতে যোগ দেওয়ার কিছুদিন পরে। পুরো ধর্মঘট করলে সরকার একদিনের মাইনে কাটতে পারে, শো-কজ করতে পারে। সার্ভিস-বুকে কালো ছাপ তুলে দিতে পারে।

কিন্তু অফিসে এসে সই করে সিটে বসে যদি সবাই কলম না ধরে তাহলে সরকার জব্দ

পরদিন সুপারভাইজারের কাছে যেতে তিনি কয়েকটা জায়গায় সই করিয়ে নিয়ে একজন ি দিয়ে বি সেকশনে পাঠিয়ে দিলেন। চারটে টেবিল-চেয়ার। দুটো খালি। বাকি তিনটেতে ম দুজন কাজ করছেন। যিনি বয়স্ক তিনি নামধাম জেনে বসতে বললেন। তারপর প্রশ্ন,— অভাব কীরকম?

—চাকরিটা পাওয়ার পর আর নেই।—বললাম।

—বা। শুনে খুশি হলাম।—ভদ্রলোক বললেন,—আপনাকে এখন বেশ কিছুদিন ধরে কাজ হবে। ওই রেজিস্টারটা নিন। ওটা গত বছরের। ওটা থেকে এই নতুন রেজিস্টারে নাম আ তুলুন।

এবার দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন,—পেনসিলে তুলবেন।

—পেনসিলে?

—হ্যাঁ। কাল এসে, যা আজ তুলবেন তার অর্ধেক রবারে মুছে নতুন করে লেখা শুরু ক নইলে দশদিনেই তোলা শেষ হয়ে যাবে।—হাসলেন তিনি।

দুপুরে দেখলাম চিকেন প্যাটিস আর কফি এল। আমাকেও দেওয়া হল। আপত্তি করতে যা কিন্তু আশ্বস্ত করা হল,—আরে এটা সেকশনের পয়সায় আনানো। পকেট থেকে যাচ্ছে না খান।

বিকেল চারটের সময় চতুর্থ চেয়ার ভর্তি হল। বসেই লোকটি বললেন,—জল কোথায়

পিয়ন জল এগিয়ে দিল। সেটা খেয়ে তিনি বললেন,—একটা তীব্র আন্দোলন শুরু হতে কম্প্যুটারের নাম শুনেছ?

দ্বিতীয়জন বললেন,—শুনেছি, কিন্তু—

—ভয়ংকর যন্ত্র। একটা যন্ত্র, এক হাজার মানুষ যে কাজ এক মাসে করে তা দশ মিনিটে দেয়। সরকার সেই যন্ত্র বসাতে চাইছে। তার মানে বুঝতে পারছ? নতুন লোক নিয়োগ দূরের আমরাই উদ্বৃত্ত হয়ে যাব। সবকিছু রেকর্ডেড হয়ে থাকবে। বোতাম টিপলেই জেনে নেবে অফি 'ফাইল খুঁজে পাচ্ছি না' বলার দিন শেষ হয়ে যাবে। সব ক'টা ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, প্রাণ কম্প্যুটার চালু করতে দেওয়া হবে না। দরকার হলে লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হবে। পারছ?

এই যে তোমরা ছেলেমেয়েকে দামি স্কুলে পড়াচ্ছ, দামি টিউটর রেখেছ—সব বন্ধ করে হবে। চাকরি যদি থাকেও তাহলে শুধু মাইনের টাকায় তো ওসব চলবে না। ইনি কে?—এ আমাকে দেখতে পেলেন তিনি।

সিনিয়র ভদ্রলোক আমার পরিচয় দিলেন।

—তার মানে তিন ভাগের বদলে এখন থেকে চার ভাগ হবে?

—না না, ওঁর কোনো দরকার নেই।

—গুড। আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায় হেড অফিসের ইউনিয়ন অফিসে মিটিং আছে। চলে অ ভাই। আচ্ছা উঠি।

ভদ্রলোক উঠতেই সিনিয়র ভদ্রলোক একটা খাম এগিয়ে দিতে তিনি খপ্ করে ধরে ঢুকিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। দ্বিতীয়জন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—ইউনিয়নের অ্যাসি সেক্রেটারি। আমাদের এখানকার রিপ্রেজেন্টিটিভ। জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেয়।

—কোথায় কাজ করেন?—বোকার মতো জিজ্ঞেস করেছিলাম।

—কেন? এই তো ওঁর চেয়ারে বসে গেলেন।

—সকালে তো দেখিনি!

—ইউনিয়নের কাজকর্ম সেরে এইসময়ে এসে সই করে যান খাতায়। কখনও ব্যাকডেটে সই করেন না। এখন আবার ইউনিয়ন অফিসে গেলেন। আচ্ছা, কম্প্যুটার এলে পার্টিরা আর আমাদের কাছে আসবে না?

—আমি জানি না। এখন কেন আসে?

—বাঃ! ভুল করে ফেঁসে যায়, বাঁচতে আমাদের সাহায্য নেয়। যা দেয় তা হয়ে যায় সেকশনের টাকা। তিনভাগ হয় সেটা। তুমি যদি নাও তাহলে চারভাগ হবে।

—না না, আমার দরকার নেই। কিন্তু তিনভাগ কেন? উনি নেন?

—সেটা নিতেই তো রোজ আসেন। নিয়ে আবার চলে যান। ইউনিয়ন করেন বলে স্ত্রী-সন্তানকে বঞ্চিত করবেন কেন?

ভদ্রলোক কাজে মন দিলেন।

সেপ্টেম্বর ২০০৭

কোকিলে

আমার বাবা-মা থাকতেন ডুয়ার্সের চা-বাগানে। আমি ঠাকুরদার সঙ্গে শহরে থেকে ভাে পড়তাম। গরম এবং পুজোর ছুটিতে চা-বাগানে বেড়াতে যেতাম। বাবার সঙ্গে কথা হত ম মায়ের সঙ্গেই বেশি। একবার ছুটিতে চা-বাগানে গিয়েছি। বাবার মুখোমুখি হতে তিনি করলেন,—তোমার এবার ক্লাস এইট, তাই না?

আমি মাথা নেড়েছিলাম,—না। নাইন।

বাবা বলেছিলেন,—ও। ভালো।

আমরা যখন স্কুলে পড়েছি তখন জানতাম পড়াশোনা করতে হয় বলেই পড়ছি। ৎ পড়াশোনা নিয়ে অভিভাবকরা তেমন মাথা ঘামাতেন না। স্কুলের শিক্ষক অথবা প্রাইভেট সেই দায়টা নিয়েছিলেন। স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজে ভর্তি হতে হয় তাই হয়েছিলাম। ক এসে স্কটিশ কলেজে বাংলায় অনার্স নিয়েছিলাম, যদিও সেন্ট পলস ইকনমিক্সে অনার্স দি খবর পেয়ে বাবা লিখেছিলেন, তুমি তোমার ভবিষ্যতের বারোটা বাজিয়ে দিলে।

কিন্তু কলকাতার কলেজে ভর্তি করতে তিনি সঙ্গে আসেননি। পরামর্শ দেননি, কী বিষ পড়লে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। আমাদের সময় অভিভাবকরা সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তিত এরকম হাতে-গোনা পরিবারে পাওয়া যাবে।

কলেজে পড়ার সময় মাথায় ঢুকল, পাশ করে চাকরি করতে হবে। যাঁরা বিজ্ঞান বা নিয়ে পড়ছে না তাদের সামনে খোলা থাকত স্কুলের মাস্টারি, ব্যাংক অথবা সরকারি ৎ কেরানিগিরি অথবা ফুড ডিপার্টমেন্ট, ইনকাম ট্যাক্স অথবা কাস্টমসের ইন্সপেক্টরের চাকরি। গ্রাজুয়েট হলেই এইসব চাকরির পরীক্ষায় বসা যায়। আমার সঙ্গে যারা অনার্স নিয়ে পাশ ৎ তাদের অনেকেই পরীক্ষা দিয়ে ওইসব চাকরিতে ঢুকে পড়েছিল। কেন বাংলায় অনার্স নি এই প্রশ্নের জবাব একটাই, যে-কোনো বিষয় নিয়ে অনার্স গ্র্যাজুয়েট হতে হবে যে; বাংল সহজ বিষয়। ওইসব চাকরির মাইনে পঁয়ষট্টি-ছেষট্টিতে তিন-চারশোর বেশি ছিল না। যেহে টাকায় একটা মেসে থেকে দু'বেলা খাওয়া যেত তাই ওই মাইনেতে সবাই সন্তুষ্ট থাকত। বছরের মধ্যে বিয়ে করে ফেলত। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়তে ঢুকত তাদের লক্ষ্য হত ক লেকচারারের চাকরি। ভালো ফল আর একটা ডক্টরেট ডিগ্রি থাকলে কথা নেই। কিন্তু ব্যাপার অভিভাবকদের কোনো ভূমিকা ছিল না। তেমন প্রভাবশালী বাবা হলে তাঁর ক্ষমতাবান বন্ধু খবর পেয়ে বলতেন,—কাল থেকে অফিসে এসো। অর্থাৎ কোনো পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ না চাকরি হয়ে গেল। আমার সঙ্গে পড়ত একটি ছেলে, ঘুম থেকে উঠত এগারোটার সময়।

আসত সাড়ে বারোটায়। ফর্সা, রোগা চেহারার ছেলেটি দামি পোশাক পরত। সে বলত,—তিনবারে স্কুল পেরিয়েছি। জীবনে বি.এ. পরীক্ষায় বসব না।

আমরা অবাক হতাম,—সেকি রে! তাহলে কলেজে ভর্তি হলি কেন?

—আমাদের বাড়িতে মা ছাড়া কোনো মেয়ে নেই। তাই কো-এডুকেশন কলেজে এসেছি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলব বলে।

—চাকরি করবি না?

—দূর! আমার বাবা এইট পর্যন্ত পড়েছিল, আমি তো ঢের বেশি।

জেনেছিলাম, একটা নামী সোনার দোকানের মালিক ওর ঠাকুরদা। সারাজীবন এগারোটা পর্যন্ত ঘুমোতে পারবে অনায়াসে। আমি জানি না এইরকম কোনো ছেলেকে এখনকার কলেজে পাওয়া যাবে কি না।

আমরা জানতাম আই.এ.এস. ইত্যাদি হতে পারলে প্রচুর ক্ষমতা এবং ভালো মাইনে পাওয়া যায়। কিন্তু কলেজে ঢোকার পর নাটক এবং সাহিত্য নিয়ে এত বেশি মাতামাতি করেছিলাম যে ওদিকে যাওয়ার কথা মাথায় আসেনি। বরং ওইসব চাকুরেদের আমরা শ্রেণীশত্রু হিসেবে ভাবতাম। মনে আছে, যাঁরা অত্যন্ত মেধাবী তাঁরা ওইসব পরীক্ষায় পাশ করে মুসৌরি বা দেরাদুনে ট্রেনিং নিয়ে চলে যেত।

আমার সহপাঠী যে বাংলা অনার্সের ভালো ছাত্র ছিল, গ্র্যাজুয়েট হয়েই ব্যাংকের চাকরিতে ঢুকেছিল। আটত্রিশ বছর চাকরি করে অবসর নিয়েছে সে। একদিন ফোন করে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মাঝখানে দু-একবার দেখা হলেও এবার দেখলাম তাকে রীতিমতো প্রৌঢ় দেখাচ্ছে। বলল,—প্রেশার হাই, ব্লাডসুগার হয়েছে। বাড়িটা বেশ সুন্দরভাবে সারিয়ে নিয়েছে। বসার ঘরের আসবাবপত্র বেশ আধুনিক। জিজ্ঞেস করলাম,—এত বছর কীরকম উপভোগ করলে?

—ভালো-মন্দয় মিশিয়ে। তিনটে প্রমোশন হয়েছিল।

—বাংলায় অনার্স নিয়ে, এম.এ. পড়ে অধ্যাপনা করোনি বলে আপশোস হয় না?

—না। একজন অধ্যাপক যে মাইনেতে রিটায়ার করে তার চেয়ে অনেক বেশি আমি পেয়েছি। কিন্তু জানো, আমি যে টাকায় রিটায়ার করেছি, আমার ছোট ছেলে তার চেয়ে বেশিতে শুরু করেছে। তখন আপশোস হয়।—সহপাঠী বলল।

—কেন?

—আমাদের সময়ে এই নতুন চাকরিগুলোর অস্তিত্ব ছিল না। যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের বিরুদ্ধতা ছিল, কিন্তু এখন কম্প্যুটার ছাড়া জীবন অচল। এখন মনে হয় আমাদের অভিভাবকরাও জীবন সম্পর্কে বড্ড উদাসীন ছিলেন।

—তোমার ছেলেমেয়েরা কী করছে?

—বড় বাঙ্গালোরে। এইচ আর-এ এমবিও করে বড় চাকরি করছে। ছোট্ট কম্প্যুটার সায়েন্স ডিগ্রি নিয়ে সানফ্রান্সিসকোতে।

—এখানে?

—আমি আর আমার স্ত্রী।

—ফাঁকা লাগে না?

—যতদিন চাকরি করতাম লাগেনি। এখন লাগে। কিন্তু আমার স্ত্রীর লাগে না।

—কেন?

—তাঁর মতে, ওরা ওদের জীবনে সফল হয়েছে। ওরা যে লক্ষ্য সামনে রেখে বড় সেই লক্ষ্যে ঠিকঠাক এগোচ্ছে। তাই তিনি খুশি।

—সেটা কীরকম?

—দ্যাখো, দুজনকেই ইংরেজি মাধ্যমের ভালো স্কুলে পড়িয়েছি। ছোটটা ক্লাস সেভেন কম্প্যুটার ব্যবহার করতে শিখেছিল। ওদের পড়াশোনার পরিকল্পনা আমার স্ত্রী করেছেন ওপরে যাতে নাম্বার থাকে তার দিকে নজর রাখতেন তিনি।

—পড়াশোনা ছাড়া আর কী করত? খেলা, গান-বাজনা?

—না হে। ওসবের জন্যে সময় ছিল না ওদের।—সহপাঠী বললেন,—ক্লাস এইট থেকে লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া হয়েছিল।

—ওদের বন্ধুবান্ধব?

—স্কুলেই যা মিশত। বন্ধুরাও তো একই পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে।

—তোমার কী মনে হয় না এই পদ্ধতি এখানকার সংস্কৃতি, সাহিত্যকে আরও এগিয়ে সাহায্য করবে না?

—দ্যাখো, তার জন্যে বাংলা মিডিয়ামের ছাত্ররা আছে। আছে পড়াশোনায় অম ছেলেমেয়ে। তাই না?—সহপাঠী হাসল।

—ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে?

—হ্যাঁ। প্রায়ই ই-মেল করে। বড়ছেলের ছুটি কম। বছরে একবার আমরাই যাই। ছো অত দূর থেকে আসা প্রতি বছর সম্ভব নয়। তা ছাড়া গাড়ি-বাড়ি কিনেছে। জড়িয়ে গে

—তুমি আমেরিকায় যাও না?

—না।

—আচ্ছা, তুমি যদি কলকাতার বাইরে চাকরি করতে তাহলে তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে অনিয়মিত দেখাশোনা করতে? চাকরির জায়গায় বাড়ি বানাতে, যখন তোমাদের এত ব কলকাতায় আছে?

—না। করতে পারতাম না। কারণ সেই চাকরি আমাকে তেমন শক্তি জোগাত না

—তোমার কি মনে হয় না এখন এই ছেলেরা অনেক বেশি স্বার্থপর?

—একদম না। চাকরির কারণে ওদের বাইরে থাকতে হচ্ছে। ছেলেমেয়ে-স্ত্রী নিয়ে যেখা এবং থাকবে সেখানেই শেকড় নামানো স্বাভাবিক। ছোটছেলে এখন মার্কিন নাগরিক। সে ত এবং স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করে। আমাদের খবর নেয়। যদি অর্থাভাবে পড়ি তাহলে জানাম পাঠাবে। স্বার্থপর বলব কেন? আমাদের সঙ্গে সবসময় থাকে না বলে? তাহলে দ্যাখো, ব ফেলে রেখে সাধারণ চাকরি করা ছেলে ফ্ল্যাট ভাড়া করে চলে যাচ্ছে একই শহরে। বাব খবরই রাখে না। তাদের নিশ্চয়ই স্বার্থপর বলবে তুমি। কিন্তু তাদেরও তো নিজস্ব সমস্য তাই না? আমাদের ছেলেদের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে আমরাই সাহায্য করেছি। আমার বেলা বাবা-মা তা করেনি। তাই ছেলেমেয়েদের স্বার্থপর বলব কেন?

—ধরো তোমাদের একজন মারা গেলে—

—ওটাই সমস্যা হবে। আগে হোক, তখন দেখা যাবে।

আমাদের সময়ে বিনোদনের মাধ্যম খুব কম ছিল। রেডিয়োতে গান শোনা, পয়সা জমিয়ে

শো দেখা আর গল্পের বই পড়া ছাড়া বিনোদিত হওয়ার অন্য কিছুর খবর জানা ছিল না। এখন হাজারটা মাধ্যম এসেছে। ছেলেমেয়েরা তার সুযোগ নিচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক।

আমাদের সময়ে সীমিত চাকরি ছিল। তার মাইনেও কম। কিন্তু এখন একটু ভালো ছেলের জন্যে প্রচুর মাইনের চাকরি অপেক্ষা করছে। তিরিশ থেকে ষাটের বয়সটায় তাঁরা ভাববেন তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, ছেলেমেয়েকে নিয়ে। সেটা যাতে ঠিকঠাক করে তার জন্যে শৈশব থেকেই তাঁদের বাবা-মা তৈরি করেন। যখন করেন তখন থেকেই তাঁদের তৈরি হওয়া উচিত—এই ভাবনায়, ওঁদের জীবন ওঁদের। নার্সারি স্কুলে বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া, টিফিন সহপাঠীকে খাইয়েছিল বলে যে শিশুকে ধমক দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল, কাউকে না দিতে; শিশু সেদিন বুঝেছিল তাকে স্বার্থপর হতে হবে।

নিজের স্বার্থে কাকে পর করবে সেটা সে ঠিক করবে।

আমার সহপাঠীর স্ত্রীকে আমি শুধু বুদ্ধিমতী বলে মনে করি না, তাঁকে আমি বাস্তববাদী অ্যাখ্যা দিতে চাই।

ডিসেম্বর ২০০৭

চলে যা (তসলি) মা প্র

তসলিমাকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকায় বুদ্ধিজীবীরা সরব হয়েছেন। কিছু হুলিগ থেকে পার্কসার্কাসে ঘণ্টাকয়েক আস্ফালন করেছিল, গাড়ি ভাঙচুর করেছিল আর পশ্চিমব পুতুলের মতো তাদের দিকে তাকিয়েছিল। বলা হয়েছে, সেদিন পুলিশ যদি উপযুক্ত ব তাহলে দেশে রায়ট লেগে যেত। হিন্দু-মুসলমানরা পরস্পরকে খুন করত। তাই কোনো পা না দিয়ে পুলিশ দর্শক হয়েছিল। শেষে বাধ্য হয়ে মিলিটারির শরণাপন্ন হয় সরকার। পথে নামতেই হুলিগানরা উধাও হয়ে যায়। শান্তি চলে আসে।

ধরা যাক, মিলিটারিদের দেখে আরও খেপে গিয়ে বোমা ছুটতে লাগল ওরা। মিলি হয়ে গুলি চালাল এবং কয়েকজন হুলিগান মারা গেল। যেহেতু ওইসব হুলিগানরা মুসলমান তাই পুলিশ তাদের অন্যায় দেখলে মারলে দাঙ্গা হবে, মিলিটারি মারলে হবে না? নিন্দুক মিলিটারিরা মারলে যদি দাঙ্গা হয় তাহলে তার দায় স্বচ্ছন্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রের ওপ দিতে পারতেন। বলতেন, তাঁরা মানুষ মারার বিপক্ষে। হয়তো পার্টির মন্ত্রীরা সহানুভূতি মৃতদের বাড়ি গিয়ে।

তাহলে এই দাঁড়াল, মুসলমানদের মধ্যে যারা সমাজবিরোধী তারা যা ইচ্ছে তাই ক পারে কারণ সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সাহস পান না। তাঁরা ভয় পান, এর ফলে ভোট হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু সমাজবিরোধীদের দ্বিতীয় পরিচয় থাকে না। মুসলমান নন। যে-কোনো ভদ্র মুসলমান এইসব কাজ সমর্থন করেন না। সমাজবিরোধী মারা গে কখনোই সরকারকে দায়ী করবে না। তবু ভয় যাচ্ছে না সরকারের। আর এই ভয় প ভদ্র মুসলমানদের ওপর অনাস্থা রাখা এবং অপমান করা, তা বুঝতে চাইছেন না।

ওই কয়েকজন সমাজবিরোধী পুলিশকে দেখে ভয় পেল না, মিলিটারিদের দেখে পাল এর জন্যে দায়ী বর্তমান সরকার।

গত দেড় বছরে পুলিশের ইমেজ যেটুকু তলানিতে ঠেকেছিল তা বোধহয় শেষ পার্কসার্কাসের ঘটনায়। নন্দীগ্রামে পুলিশ ঢুকতে পারেনি। গুলি চালিয়ে কিছু নিরীহ মানুষ শোনা যায়, তাদের সঙ্গে ক্যাডাররা ছিল। কেন পুলিশ গুলি চালিয়েছিল? না, নন্দীগ্রামে র অরাজকতা সৃষ্টি করে, প্রশাসনকে কাজ করতে না দিয়ে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়েছিল ত ঘটাতে না পেরে পুলিশ বাধা পেয়ে গুলি ছোঁড়ে। তার পরের কয়েক মাস অপদার্থতার পুলিশ কোথাও নেই। যে যা ইচ্ছে তাই করছে। পুলিশ ধরে মেরে ফেলে দিলে? ব্যব হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত সি.আর.পি.এফ. ডাকা হল। তারা আসার আগে নির্দেশ গেল যে ক' তখনও ওখানে আছে তাদের জগন্নাথ হয়ে যেতে। রাতের অন্ধকারে ক্যাডাররা অস্ত্র

পুনর্দখল করে নিল নন্দীগ্রাম। মানুষ দেখল মাইনে নেওয়া পুলিশ দশ মাসে যা পারল না তা পার্টির ক্যাডাররা করে ফেলল।

রেজানুরের ঘটনায় পুলিশ কমিশনার সমেত আরও চারজনের অপসারণ যে পুলিশের ওপর থেকে জনসাধারণের শেষ আস্থা চলে যাওয়া, তাতে আর কোনো সন্দেহ থাকল না। শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপর নন্দনের পাশে পুলিশের আক্রমণ তাদেরই হাস্যকর করে তুলল, যখন পুলিশ কমিশনার ক্ষমা চাইলেন। এখন মানুষ জেনে গেছে যে, কোনো বিপদে সরকার হয় মিলিটারি নয় সি.আর.পি.এফের শরণাপন্ন হবেন। সমাজবিরোধীরা তাই বেজায় খুশি।

সেদিন কলকাতার রাস্তায় কিছু অবাঙালি সমাজবিরোধী হঠাৎ ভাঙচুর করতে আরম্ভ করল তসলিমাকে সহ্য করতে না পেরে। এই লোকজনগুলো তসলিমা সম্পর্কে কিছু জানে না, তাঁর লেখাপড়া দূরের কথা, বইয়ের নামও শোনেনি। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, কেউ বা কারা ওদের লেলিয়ে দিয়েছিল কাজটা করার জন্যে তাদের বলা হয়েছিল, পুলিশকে উত্তেজিত করতে, যাতে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। তাহলেই সারা শহরে তাণ্ডব দেখানো সম্ভব হবে। পেছনে থেকে যারা এই কাজটা করেছিল তারাও কি তসলিমার লেখা পড়েছে? মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে একজন ইমাম, যিনি ফতোয়া জারি করেছিলেন, টিভির ক্যামেরার সামনে তসলিমার লেখার নামও বলতে পারেননি। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল তসলিমা ইস্যুটাকে সামনে রেখে ঘোঁট পাকানো। পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি তৈরি করা। তাঁরা ভালো করেই জানতেন, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বাহিনীর কাছ থেকে কোনো ভয় নেই। তারা নির্বিষ। সরকার যে মিলিটারির শরণাপন্ন হবেন তা ওরা আন্দাজ করেনি।

তসলিমা এখন কলকাতায় থাকেন। কলকাতায় থাকতে তাঁর ভালো লাগে। যতদূর জানি, এখানে এসে তিনি কারও পাকা ধানে মই দেননি। মাঝেমধ্যে কোনো কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে কবিতা পড়েছেন। ভারতে থাকাকালীন কোনো বিতর্কিত লেখা লিখেছেন কি না জানি না। লিখলেও সেগুলো প্রচারিত কাগজে ছাপা হয়নি। ভারত সরকার তাঁকে এখানে থাকার জন্যে ভিসা দিয়েছেন, মাঝে মাঝে তার নবীকরণও করছেন। সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করে কোনো প্ররোচনামূলক লেখা তিনি লেখেননি। তাঁর যেসব লেখা নিয়ে তাঁর ধর্মাবলম্বী মানুষের একাংশ ক্ষিপ্ত, সেগুলো লেখা হয়েছিল ভারতবর্ষে এসে বাস করার অনেক আগে। সময় বয়ে গেছে, যে কারণে ওই লেখাগুলো লেখা হয়েছিল তার প্রয়োজনও মোটামুটি মিটে গেছে। তাহলে আবার এই ভয়ংকর দাঁত দেখানো কেন?

ঘটনাটি ঘটার পর দুটো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। কলকাতার তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর কবি-অভিনেতারা টেলিভিশনের সামনে এসে প্রায় অশ্রুপাত শুরু করলেন তসলিমার জন্যে। একজন তো বলেই ফেললেন, তসলিমা আমাদের ঘরের মেয়ে, তাকে কেন বের করে দেওয়া হবে? বেশিরভাগই বললেন, একজন সাহিত্যিকের ওপর এই বর্বরোচিত অত্যাচার মেনে নেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাতের অন্ধকারে তাঁকে রাজস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছেন এটা অত্যন্ত অনৈতিক কাজ।

আবার বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান শ্রী বিমান বসু ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন, যাকে নিয়ে এত গোলমাল তার এ রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত।

কথাটা খুব নির্মম বলে হইচই বাধালেন কেউ কেউ। তসলিমা চলে গেলেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। কয়েকদিন বাদে শুনলাম তিনি তাঁর 'দ্বিখণ্ডিত'র কয়েকটা পাতা বাদ দিতে সম্মত হয়েছেন। যে তসলিমা দ্বিখণ্ডিতকে অক্ষত রাখতে হাইকোর্টে মামলার পরে জয়ী হয়েছিলেন সেই তিনি, বোঝাই যাচ্ছে, চাপের কাছে নতি স্বীকার করলেন। কেন? কেউ তুললেন গ্যালিলিয়োর প্রসঙ্গ। চার্চের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন সেই বিজ্ঞানী, যিনি বলেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। বুদ্ধিজীবীদের কাছে গ্যালিলিয়ো আর তসলিমা একাকার হয়ে গেল।

আপনার বাড়িতে কোনো অতিথিকে জায়গা দেওয়ার পর যদি দেখেন তাকে নিয়ে একের পর

এক ঝামেলা হচ্ছে, আপনি কতদিন সেটা সহ্য করবেন? আপনি যদি দেখেন তাঁর অসংগতি আছে তাহলে কদিন তাঁকে মেনে নেবেন? একসময় কি আপনার মনে হবে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে আপনি রেহাই পাবেন? হ্যাঁ, তিনি যদি অতিথি না হয়ে ঘরে তাহলে ভাবাবেগ বদলে যাবেই। সেই মানুষটি যদি সত্যের জন্যে লড়াই করেন তাহলে সাহায্য দরকার হবে না, সাধারণ মানুষের সমর্থন পাবেন তিনি।

তসলিমা সেটা পেলেন না। এখন লোকে ওঁর পরিচয় সমাজ-সংস্কারক, ফিচার লি কবি হিসেবে জানে। ওঁকে সাহিত্যিক হিসেবে মানতে চায় না দু-দেশের বাংলা ভাষার ছাড়া যাঁদের জন্যে তিনি লিখছেন তাঁরাও বোধহয় ওঁকে সরল মনে গ্রহণ করতে পা আমাদের মিডিয়া এবং বুদ্ধিজীবীরা ওঁকে সাহিত্যিক বানিয়ে যে প্রচার করছেন তা মেনে নি না জনসাধারণ। দুই বাংলায় ভালো গল্প-উপন্যাস লেখেন এমন তরুণের সংখ্যা কম নয় মানুষের জানা হয়ে গেছে।

এক সাংবাদিক বলছিলেন, আমেরিকা এবং ব্রিটেনের গণতন্ত্র তো বিখ্যাত। সেখানে বিদেশি যদি এমন কিছু লেখেন যার জন্যে সেখানকার কিছু মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ট্রাম-এ তাহলে ওই দেশদুটোর সরকার কি তাঁকে আরও আতিথ্য দেবেন না দেশ থেকে চলে যে

মাননীয় বামফ্রন্ট-চেয়ারম্যান মনের কথাটি বলে পরে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেছে পুলিশের মতো সরকারি নেতারা যদি এরকম ভূমিকা বদল করেন তাহলে সবাক ছবির হয়ে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই।

জানুয়ারি ২০০৮

অহেতুক পরামর্শ

এবারের বইমেলা পার্কসার্কাস ময়দানে। শীতের সময় যে ময়দান সার্কাসের জন্যে বিখ্যাত ছিল সেখানে এবার ট্র্যাপিজের বদলে বই বিক্রি হবে। এতকাল ময়দান ছিল বইমেলার বারো দিনের সাম্রাজ্য। উত্তর থকে দক্ষিণের মানুষ পিল পিল করে ছুটতেন সেখানে। আগুনে পুড়ে গেলেও তাঁদের উৎসাহ কমেনি। শতকরা দশ ভাগ মানুষ বই নেড়েচেড়ে দেখতেন। কিনতেন। বাকি নব্বই ভাগ যেতেন স্রেফ ঘুরতে অথবা আড্ডা মারতে। হাজার হাজার মানুষ সেজেগুজে বইমেলাকে রঙিন করছে সেটা দেখায় আনন্দও ছিল। তবে বই-এর চেয়ে পিঠেপুলি, চপ-কাটলেট, ফ্রায়েড রাইস গিলতে আগ্রহ ছিল বেশি। দু'বছর আগে একটি পরিবার দল বেঁধে এসেছিলেন। ঠাকুমা থেকে নাতনি, সাতজনের দল। ধুলোর ওপর চাদর বিছিয়ে বসেছিলেন। সামনে খাবারের দোকান থেকে কেনা খাবারের স্তূপ। দূর থেকে দেখলাম, দুজন বয়স্কা মহিলা আর একটি তরুণী সেই দলে যোগ দিলেন। দশজনে বেশ খাওয়াদাওয়া হল। গল্পগুজব, তারপর সন্ধের রঙ ঘন হতে ওঁরা উঠলেন। ঠাকুমা তরুণীর চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে হাসলেন। নাতনি আমাকে চিনতে পেরেছিল। সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সে জোর করে। জানলাম, এই সাতজনের পরিবার বইমেলায় এসেছে ওই তরুণীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে। তরুণী এসেছে মা-মাসির সঙ্গে। ওকে পছন্দ হয়ে গেছে সাতজনের। এই ফাল্গুনেই বিয়ে হবে।

ময়দানের মেলায় চারধারে বই। দশ শতাংশ বই দেখেন, নব্বই শতাংশ বেকার থাকেন না। কেউ প্রেমে পড়তে চায়, কেউ বহু বছরের পুরোনো প্রেমিকাকে ছেলেমেয়ে সমেত আবিষ্কার করে বুকে চিন্‌চিনে ব্যথা উপভোগ করে। হ্যাঁ, ইদানীং পকেটমাররাও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেইসঙ্গে ইলেকট্রনিক মিডিয়া তাঁদের স্টলের সামনে বিনোদনের আসর বসাত। মাটিতে বসে তরুণ শিল্পীরা ছবি এঁকে যেত সামান্য পয়সার বিনিময়ে।

বাঙালির এই পার্বণে বাদ সাধলেন পরিবেশবিদ্‌রা। হাইকোর্ট তাঁদের সমর্থন করলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অভয় সত্ত্বেও মেলা বন্ধ করতে হল ময়দানে। তখন হাতে আর সময় নেই। মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর বদান্যতায় মেলা চলে এল সল্টলেক স্টেডিয়ামে। আর কোনো জায়গা নেই। উদ্যোক্তারা নিমপাতা খাওয়ার মতো মুখ করে গোছগাছ করলেন। যিনি থাকেন বেলাহায় বা হাওড়ায়, তাঁর পক্ষে সল্টলেকের মেলায় বড়জোর একদিন যাওয়া সম্ভব। আর এই অসময়ে নামল বৃষ্টি। তবু নেশা এমনই জিনিস যে মেলা জমে উঠল শেষ তিনদিনে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হল।

এবার উদ্যোক্তারা প্রথমেই সল্টলেক নাকচ করেছেন। ওখানে মেলা হলে ময়দানে-যাওয়া অন্তত ষাট শতাংশ মানুষকে পাওয়া যাবে না। গতবার টিকিটের ওপর লটারির লোভ দেখিয়েও সরকার বাস চালিয়ে যাত্রী নিয়ে যেতে পারেননি। কারণ যাত্রীরা বেশিরভাগ সময় বাসের দেখা পাননি। নিয়মিত বাস সার্ভিস বাইপাস দিয়ে না থাকায় একেবারে বইমনস্ক মানুষ ছাড়া কেউ ওদিকে পা বাড়াননি।

এবার প্রথম প্রস্তাব ছিল সায়েন্স সিটির উলটোদিকে সরকার যে মিলন মেলার জন্যে মা সেখানে বইমেলা হোক। দেখা গেল মিলন মেলায় বইমেলার চাহিদা অনুযায়ী জমির এব পাওয়া যাবে। মাঠ বলে যা বলা হচ্ছে তা হল উঁচুনিচু এবড়োখেবড়ো জমি। ওখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সরকার জমিটাকে ব্যবহারের উপযোগী করতে কোনো উদ্যোগ নেনা বইমেলা হতে পারে না।

উদ্যোক্তাদের বাসনা ছিল রবীন্দ্র সরোবরে বইমেলা করার। মেট্রো কাছে, প্রচুর বাস রয়েছে শহরতলির ট্রেনও। কিন্তু রবীন্দ্র সরোবরের মালিকানা কার? অনেকগুলো ক্লাব মামলা চালাচ্ছে ওখানে থাকবে বলে। সেগুলোর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জায়গা প না। মর্নিং ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন তাঁদের হাঁটার স্বাধীনতা হারাতে নারাজ। অতএব

শেষে এই পার্কসার্কাস ময়দান। প্রায়ই বিকেলে দেখি পার্কসার্কাসের ওই গোল চত্বরে জ্যামবন্দি হয়ে রয়েছে। মেলা শুরু হলে তা বহুগুণ বাড়বে। এই দোহাই মানলে মেল দিতে হয়।

মেলা বন্ধ করলে লাভ কী, লোকসান কী? বইমেলা এখন আমাদের সেন্টিমেন্টের স গিয়েছে। দুর্গাপুজোর পরে বাঙালির বড় উৎসব এটা। পড়ুয়া বাঙালি তো বটেই, তা শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষ উপকৃত হন এই মেলার জন্যে। প্রকাশকদের সারাবছরের খরচের বইমেলা জোগায়। এ তো গেল লাভের কথা। লোকসান হল, পাড়ার ছেলেরা ওই ময়দানে খেলতে পারবে না। আশেপাশের স্কুলের ছেলেমেয়েদের যাতায়াতের অসুবিধে হ জন্যে। তীব্র যানজট হবে। ধুলো উড়লে পরিবেশ নোংরা হবে। এবারের মেলার পর মানুষ ঠিক করবে বইমেলা চালু রাখা বা বন্ধ করা উচিত কি না।

জায়গা কমে গেছে এবার। চা-কফি ছাড়া খাবারের স্টল বন্ধ করা হবে বলে শুনলা কথা। মেলা থেকে বেরোলেই তো প্রচুর খাবারের দোকান। মেলার জায়গা দখল করা কেন? ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সঙ্গে বইমেলার কী সম্পর্ক? ওঁরা তো শিল্পীদের ধরে স্টলে বিনোদনের আসর বসান। বই বিক্রি করেন না তো। কিন্তু ওদিকে হাত বাড়ালে এ এমন পেছনে লাগবে যে উদ্যোক্তারা চোখে সর্ষের ফুল দেখবেন। তাই ওঁরা থাকছে

অতএব এই মেলায়, বলা যেতে পারেই, বই আর বই, বই ছাড়া কিছু নেই। মনে মাসিমা-ঠাকুমারা আর পাত্রী দেখতে এবার আসবেন না। প্রেমিক-প্রেমিকাদের অবশ্য থাম না।

কিন্তু উদ্যোক্তাদের কাছে আমার একটা প্রস্তাব রাখতে চাই। টিকিটের বদলে আপন দশ বা পাঁচ টাকার কুপন বিক্রি করুন। সেই কুপন দেখালে যে-কোনো দর্শক একটা ব ওই টাকা বিক্রেতা মূল দাম থেকে ছাড় দেবেন। দশ বা পাঁচ টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় অন্তত একটা বই কিনবেন। বিক্রেতা সেই কুপন উদ্যোক্তাদের কাছে জমা দিলে কুপনে দাম উদ্যোক্তারা তাঁদের ফিরিয়ে দেবেন। অনেক বিক্রেতা প্রচলিত দশ শতাংশ ছাড়ের বদলে কুড়ি মেলায় দিয়ে থাকেন। তাঁদের সেটা দিতে হবে না। ফলে লোকসানের কোনো সম্ভা

উদ্যোক্তারা দশ টাকার কুপন হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না। পাঁচ টাকার হলে হওয়ার সম্ভাব সেক্ষেত্রে প্রতিটি দর্শক একটা বই কিনছে—এই আশ্বাসে তাঁদের বইমেলা করার উদ্দেশ্য পূর্ণ হচ্ছে বলে তৃপ্তি পেতে পারেন।

প্রস্তাবটি বিবেচনা করলে খুশি হব।

ফেব্রুয়ারি ২০০৮

ওহে সমরেশ...

খুব সংগত কারণেই পার্কসার্কাসের বাসিন্দারা হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। বইমেলা ওখানকার পার্কে হলে, রোজ দু'লক্ষ মানুষ সেই মেলায় ভিড় জমালে, তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হতে বাধ্য। চারপাশে স্কুল, নার্সিংহোম, হাসপাতাল, কলেজ এবং বাইপাস থেকে লক্ষ লক্ষ গাড়ির শহরে ঢোকার মুখে বাঙালির সেরা দ্বিতীয় পার্বণের ব্যবস্থা করলে জায়গাটা নরক হয়ে যেতে বাধ্য। মেলা নেই, এমন বিকেলে পার্কসার্কাসের মোড় পেরোতে কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করতে হয়।

মাননীয় হাইকোর্ট ওঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে মেলা বন্ধ করেছেন।

গতবার হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল—ময়দানে মেলা করা চলবে না। তার বিরুদ্ধে গিল্ড সুপ্রিমকোর্টে আপিল না করেও ভেবে নিয়েছিল এবারও ময়দানে মেলা হবে। নিশ্চয়ই তারা সরকারের কাছে ভরসা পেয়েছিল। হয়তো সরকার দিল্লির সঙ্গে কথা বলে সেনাবাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রেখে ময়দান ব্যবহারের অনুমতি আদায় করে দিতে পারবেন বলে তারা ভেবেছিল। এরকম ভাবনা গিল্ড যে ভেবেছিল, যে-ই আশ্বাস তাদের দিন না কেন, শিশুর মস্তিষ্ক ছাড়া কেউ ভাববে না। যখন বোঝা গেল সরকারের কাছ থেকে ময়দান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই তখন তারা হাতড়াতে লাগল, কোথায় মেলা করা যায়। মিলন মেলা এখনও বইমেলার জন্যে প্রস্তুত নয়। রবীন্দ্র সরোবরে মেলা করা যেত। পাতাল রেল, লোকাল ট্রেন ছাড়াও প্রচুর বাস থাকায় মানুষ সহজে যেতে পারত। কিন্তু দেখা গেল সেখানকার অধিকার নিয়ে নানান সংস্থা ইতিমধ্যে মামলা করে বসে আছে। তখন মাননীয় মেয়র উপদেশ দিলেন পার্কসার্কাসে মেলা করতে। এ নিয়ে নানান কথার পর মেলার অনুমতি গিল্ডকে দিলেন মেয়র সাহেব। একবারও ভাবলেন না, দু'লক্ষ লোকের পায়ের ধুলো বহন করা ওই পার্কের পক্ষে সম্ভব নয়। গিল্ডও কোনোমতে একটা মেলা ঠিক সময়ে উতরে দিয়ে আন্তর্জাতিক মেলা কমিটির কাছে নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে বাস্তব ভুলল। কেউ কেউ যখন প্লেনে বসে আছেন তখন মাননীয় হাইকোর্ট প্রত্যাশিত রায় ঘোষণা করলেন। হার্ট অ্যাটাকে অপ্রত্যাশিত মৃত্যু হলে আমরা হাহুতাশ করি, কিন্তু সাঁতার না জেনে জলে লাফ দিলে, ডুবে মৃত্যু হবে জেনেও, যে জলে ঝাঁপ দেয় তার জন্যে কোনো সহানুভূতি মনে আসে না। প্রশ্ন হল, মেলা শুরুর আগের বিকেলে কেন রায়টি ঘোষিত হল? ওটা যদি দিন তিনেক আগেও হত তাহলে হয় মেলা স্থানান্তরিত করা যেত নয় বিদেশিদের মেলায় আসতে নিষেধ করা সম্ভব হত। মাননীয় হাইকোর্ট যদি রায়দানে সময় না নিতেন তাহলে কলকাতার মানুষ বিদেশিদের কাছে লজ্জায় পড়তেন না।

কিন্তু ওঁরা এসে গেছেন, বিয়ে ভেঙে গেছে, তবু বরযাত্রীরা এলে নমঃ নমঃ করে কিছু অনুষ্ঠান করা দরকার। মেয়রের হাতে কলকাতার টাউন হল আছে। সেখানে বিদেশিদের নিয়ে গিয়ে প্রতীকী

বইমেলার উদ্বোধন করা হল ঘণ্টা বাজিয়ে। উদ্বোধন হল, কিন্তু মেলা হল না। মে যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠান শেষ করে মন্ত্রপাঠও হল, কিন্তু সিঁদুর দান হল না। শুভদৃষ্টিও বর ছিল না। তবু, বিদেশিরা তাঁদেব বক্তব্য রেখেছেন; আমরা, আমাদেরও।

মজার ব্যাপার হল, পরেরদিন বিকেলে ময়দানে প্রতীকী বইমেলার আয়োজন করা হল মিলিটারি এবং পুলিশকে উপেক্ষা করে। কয়েকজন লেখক-অলেখক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিলে বইয়ের দোকান ছিল না। ব্যাপারটা যাদের কাছে হাস্যকর এবং ছেলেমানুষি বলে মনে হয়ে দোষ দেওয়া যায় না। যদি বলা হত, বইমেলা করতে না দেওয়ার জন্যে প্রতিবাদ করতে হয়েছি, তাহলে স্বাভাবিক মনে হত। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা দিয়ে ময়দানে বইমেলা ক মধ্যে অক্ষমের আস্ফালন দেখতে পাওয়া গিয়েছে। মিলিটারি যদি সেদিন সবাইকে অ অভিযোগে গ্রেপ্তার করত তাহলে কিছু বলার ছিল না। তখন মেলা হবে—এমন আশ কম। যাঁরা প্রতীকী মেলা নিয়ে খেলা করছেন তাঁদের একটি আস্ত বইমেলা সংগঠনে নেই। তাঁরা ময়দানে গিয়ে কবিতা পড়তে পারেন, কিছু সরকার বা গিল্ড-বিরোধী স্লো পারেন, ব্যস, ওইটুকুই। অতীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থমেলা করতেন। তাতে সরকারি এত চড়া থাকত যে মানুষ প্রায় বর্জন করায় সেই মেলা বন্ধ হয়েছিল। গিল্ডের বিরোধী পুস্তক বিক্রেতা সংস্থা গতবার নিজেদের উদ্যোগে একটি বইমেলার আয়োজন করে চূড়ান্ত ব্যর্থ এদিকে আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী মেলা করতে না পেরে গিল্ড বলেছে তারা এ ব করবে না। অথচ সুষ্ঠুভাবে মেলা সংগঠিত করার অভিজ্ঞতা একমাত্র তাদেরই আছে।

গতবার ঠিক এই অবস্থায় উদ্ধারকর্তা ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুভাষ চক্রবর্তী, নিজের সল্টলেক স্টেডিয়ামে গিল্ডকে মেলা করতে দিয়েছিলেন। সেখানে জায়গা-জমির অভাব বাইপাসের গায়ে স্টেডিয়ামে কীভাবে বেহালা, গড়িয়া, বালী থেকে পাঠকরা পৌঁছবেন? বাস সল্টলেকে যায় এবং সেগুলো স্টেডিয়াম থেকে বেশ দূরত্বে যাতায়াত করে। একটা ম্যাচ বা একটা জলসায় মানুষ কষ্ট করে স্টেডিয়ামে যেতে পারে, কিন্তু দশদিন ধরে যা কষ্ট কেন সহ্য করবে? ফলে ময়দানে যত পাঠক যেতেন তার অর্ধেকও যেতে পারেন দশদিনে পাঁচদিন যেতেন তিনি একদিন গিয়েছেন। তবু মেলা হয়েছিল। বড় প্রকাশকরা ভাে পেয়েছেন, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ছোট প্রকাশকরা।

এবার মেলা হচ্ছে জানার পর ছোট-বড় সব প্রকাশক বই ছেপেছেন। ছোট প্রকাশকরা ধার ভালো ব্যবসা করবেন বলে। মেলার সময় বই-এর বিজ্ঞাপন নিয়ে দেশ বা অন্যান্য পত্রি হয়। তাতে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। কিন্তু পার্কসার্কাসে মেলা হল না। ধারের বোঝা মাথা বিজ্ঞাপনের টাকা জলে যাওয়ায় প্রায় পাগল হওয়ার মতো অবস্থা। সর্বত্র হাহাকার। শু পত্রিকা বিজ্ঞাপন ছেপেছিল তারা খুশি।

এই অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এগিয়ে এলেন। পয়লা মার্চ থেকে দশদিন স বইমেলা হবে। নাম রাখলেন—"বইমেলা ২০০৮।" বললেন, প্রচুর বাস থাকবে, অন্যান দেওয়া হবে। চেষ্টা করা হবে প্রকাশকদের কাছ থেকে স্টলভাড়া না নিতে, যাতে তাদের হয়। কিন্তু মেলার দায়িত্ব গিল্ডকে দেওয়া হবে না। তিনি প্রথমে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থে নিয়ে কমিটি করলেন। সেই কমিটিতে ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দপ্তরের অফিসারদের ঢোকালে সম্পাদক একজন আমলা। সরকারি উদ্যোগে মেলা যখন হচ্ছে তখন সরকারি অফিস থাকবেনই।

শুনেছি অনেকগুলো কমিটি হয়েছে। সেইসব কমিটির সদস্য সংখ্যাও প্রচুর। এঁদের বেশিরভাগেরই মেলা করার অভিজ্ঞতা নেই। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের ভয় থেকেই যাচ্ছে। অনভিজ্ঞ লোকজন স্বজনপোষণ করতে তৎপর হবেন, এটাই নিয়ম। সুভাষবাবুর পক্ষে সেই অরাজকতা সামলানো সম্ভব হলে বইমেলা বেঁচে থাকবে।

আগেও দেখেছি, এবারও অন্যথা হয়নি। যাঁদের লেখা বই নিয়ে বইমেলা হয় তাঁরা মেলা কর্তৃপক্ষের কাছে অবহেলিত হয়ে থাকেন। সেমিনারে কয়েকজনকে ডাকা হয়, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই পরামর্শ নেওয়া হয় না। খবরের কাগজে পড়েছিলাম, এবার সুভাষবাবু লেখকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। হয়তো ঠিক কথা। আমি পাইনি, তাই জানি না। নিজেকে প্রশ্ন করছি—ওহে, সমরেশ, তুমি কি লেখক?!!

মার্চ ২০০৮

DA

খুব দ্রুত আমাদের পরিবারের চেহারাটা বদলে যাচ্ছে। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে পরিবারের শেষ কথা বলতেন আমার পিতামহ। সেটা বাবা-কাকাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ন মেনে নিতে বাধ্য হতেন। বাড়ির বউদের মাথার ওপর শুধু স্বামী ছিলেন না, শ্বশুররাও ৎ তাঁকে উপেক্ষা করে স্বামী বলতে পারতেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে সম্প করে ভেঙে যেত না সেই কারণে। আমার বিধবা পিসিমা, যিনি বাবাকে মানুষ করেছেন, বড় করার চেষ্টা করেছেন, তিনি মাকে খুব ভালোবাসতেন। মায়ের কোনো অসুবিধে বাবার হলে পিসিমা রুখে দাঁড়াতেন।

সময় দ্রুত বদলে গেল। এই পিতামহ বা পিসিমারা আজকাল প্রায় সব পরিবার থেকেই যেসব বৃদ্ধ অবসর নিয়ে পুত্রের সংসারে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের বেশিরভাগই ব্যক্তিত্ব ফেলেছেন। পুত্রের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তাঁদের নেই। পুত্রবধূর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নাতি-নাতনিকে স্কুলে দেওয়া-নেওয়া করতে বাধ্য হন, শরীর খারাপ হলেও।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারগুলো এখন স্বামী-স্ত্রীর।

(ক) একসময় ছেলেমেয়ে প্রেম করলে বাবা-মা খেপে যেতেন। সেই প্রেম ভাঙার চেষ্টা ব এখন কেন প্রেমে পড়ছে না—বলে হাহুতাশ করেন। উপযুক্ত ছেলেমেয়ে নিজেরা পছন্দ কে করলে তাঁদের দায় থাকে না। মেয়ে বলতে পারবে না—তুমি আমার জীবন নষ্ট করে দিয়েছ বিয়ের মধ্যে পাঁচটাই এখন টিকছে না। প্রেম করে বিয়ে করলে বাবা-মায়ের ঘাড়ে দায় চাপ

(খ) এখন মোটামুটি ভালো ছেলেমেয়েরা আইটি অথবা ম্যানেজমেন্টের চাকরি পেয়েই ক থেকে পালাতে চাইছে। তারা বিয়ে করলে বাবা-মায়ের সঙ্গে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। বিয়ে কিছুদিন একসঙ্গে থাকার পরে যদি সম্পর্ক না টেকে তাহলে যে কারণগুলো মুখ্য হয়ে ওঠে ে এইরকম—

১। এখন স্বামী-স্ত্রীর চাকরি তাদের অনেকটা সময় কেড়ে নিয়েছে। বাড়ি ফেরার পরে সং কাজগুলো পুরুষ চায় নারী করুক, নারী চায়—দুজনে ভাগাভাগি করতে।

২। সন্তানের জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীর ইচ্ছে সবসময় মেনে নিতে পারে না স্ত্রী। তার চ গুরুত্ব, সন্তান মানুষ করার ঝামেলার কথা তাকে ভাবতে হয়। চাকরি ছেড়ে বাড়িতে বসে সম্ভব নয়। আবার স্বামী যে ঝামেলা মেটাতে কাজের লোকের ওপর নির্ভর করতে চায়, মেনে নিতে পারে না সে।

৩। দুজনের ইগো এত প্রবল যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

৪। সংসারে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নেই, যার মাধ্যমে সমঝোতা হতে পারে।

৫। দুজনের চাকরির জায়গা দুই শহরে হলে ব্যবধান থেকে একসময় নিরাসক্তি জন্ম নেয়। তখন আবেগ ধীরে ধীরে কমে আসে।

৬। স্ত্রী স্বামীর সান্নিধ্য চায়; অফিসের সময়টুকু বাদ দিয়ে। স্বামীর বাইরের জগত, বন্ধুদের আকর্ষণ স্ত্রীর কাছে সন্দেহের বিষয় হলে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্বামীর জীবনে স্ত্রী ছাড়াও বন্ধুবান্ধবদের আকর্ষণ থাকবেই। সম্পর্ক একটু পুরোনো হলে অফিসের বাইরের পুরো সময়টা স্ত্রীর সঙ্গে কাটানো মানে একঘেয়েমিতে আক্রান্ত হওয়া। যেহেতু স্ত্রীর সংসারে কথা বলার জন্যে তৃতীয় ব্যক্তি নেই, তাই তিনি মানতে পারেন না।

৭। স্ত্রীর পদমর্যাদা এবং মাইনে যদি স্বামীর থেকে বেশি হয় তাহলে স্বামী একটু একটু করে হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত হন।

৮। বাড়িতে ছুটির দিনে স্ত্রীর আত্মীয়দের অবাধ যাতায়াত এবং স্বামীর আত্মীয়রা এলে নিরুত্তাপ ব্যবহারে ক্রমশ আসা বন্ধ হয়ে যায়।

বিবাহ মানে শুধু শরীরের আনন্দ পাওয়ার আইনি ছাড়পত্র বলে ভাবার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। আগে অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়ের বিয়ে হত, তাদের বয়েস বাড়ার পথে অভিভাবকদের ভূমিকা ছিল। এখন দুজন প্রাপ্তবয়স্ক, দুটো আলাদা রুচি এবং ব্যক্তিত্ব একত্রিত হয়ে যদি দীর্ঘদিন সম্পর্কটা না টানতে পারে তাহলে অভিযোগের আঙুল তুলে লাভ নেই।

বছর কুড়ি আগেও যে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু লাগত, সমালোচনার বিষয় ছিল, সেই স্টে টুগেদার বা একত্রে থাকা এখন বেশ চালু হয়ে গিয়েছে। আইনের বাঁধন ছাড়াই দুটো সমমনস্ক মানুষ পরস্পরকে ভালোবেসে একত্রিত হল। যদি সম্পর্ক টিকল তো ভালোই, নইলে আলাদা হতে আদালতের দরজায় যেতে হবে না।

ব্যাপারটা অভিভাবকরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিচ্ছেন।

একটা গল্প বলি। মেয়ে বিয়ে করতে রাজি নয়। বাবা-মা চিন্তায় পড়েছেন। শেষপর্যন্ত মেয়ে এসে জানাল,—তোমাদের কথাটা কীভাবে বলি! আসলে আমি একজনকে ভালোবাসি।

বাবা-মা উৎসাহী হয়ে বললেন,—বাঃ, সুখবর। নাম কী?

—স্নিগ্ধা।

—একি! এ তো মেয়ের নাম!—চমকে উঠলেন বাবা।

—হ্যাঁ।—মেয়ে মাথা নাড়ল।

বাবা-মায়ের মুখ কালো হয়ে গেল। এইসময় মেয়ের মোবাইল বেজে উঠল। মেয়ে সেটা অন করে বলল,—ও স্বরূপ! কী ব্যাপার? গোয়াতে যাচ্ছ? না না, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। জানি, কিন্তু—স্যরি।—মোবাইল অফ করে দিল মেয়ে। তারপর বলল,—বিরক্তিকর। স্বরূপ বলছে আমাকে প্লেনে করে গোয়ায় বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়। রাবিশ!

সঙ্গে সঙ্গে বাবা ও মা একসঙ্গে বলে উঠলেন,—না না, তুই গোয়া বেড়িয়ে আয় মা, প্লিজ যা.....।

এপ্রিল ২০০৮

বুক ভেঙে যায় বি

যাই বলুন আর তাই বলুন সাহিত্য-চলচ্চিত্রকে হ্যাকে মেরে বিজ্ঞাপন এখন এমন এক আ শিল্প হয়ে উঠেছে যার তুলনা একমাত্র এদেশীয় মহিলাদের সঙ্গেই করা যেতে পারে। যাঁরা এই শেখরের মতো বিদ্যাসাগরীয় মানসিকতা যাঁদের, তাঁদের কথা ছেড়ে দিন।

এদেশীয় মহিলাদের দিকে তাকান। বেশি নয়, আটচল্লিশ বছর আগে বাড়িতে ফ্রক, কলে সামলে এসে লেডিস কমনরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, যখন অধ্যাপক ক্লাসে যাে তাঁর পিছু নেবেন। ক্লাসরুমে তাঁদের বসার জায়গাও আলাদা ছিল। ক্লাস শেষ হলে আবার অধ্ পেছন পেছন ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে ফিরে যেতেন নিজস্ব কমনরুমে। আমাদের সহপাঠ ছড়া আওড়াত—রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় ক্লাসে। তখন তাঁদের জামার হাতা থাকত প্রা ছোঁয়া; কমলে, কনুইয়ের ওপরে কখনোই নয়। সন্ধের পর ট্রামে বা বাসে তাঁদের একা দর্শ যেত না। ওই পড়তে পড়তেই বিয়ে হয়ে যেত বি.এ. পাশ করে ইউনিভার্সিটিতে আসতেন বে সিঁথিতে সিঁদুর বুলিয়ে। শতকরা নব্বুইভাগ বাকি জীবন সংসার করেছেন। চল্লিশে পা দি থেকে রঙ উধাও করেছেন। তখন তাঁদের শাশুড়ি হিসেবে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা চলত তাঁদের মধ্যে খোকা হয়ে মা খুঁজে তৃপ্ত হত।

সেসময় বিজ্ঞাপনের চেহারা কীরকম ছিল? সিনেমার বিজ্ঞাপন—'আসিতেছে আসিতেছে অসিতবরণ অভিনীত পারিবারিক ছবি।' নিচে দুই নায়ক-নায়িকার মুন্ডু চাপা হত। আর প্রেক্ষাগৃহের নাম। তাই দেখেই ভরদুপুরে মা-মাসিরা রিকশায় চেপে সিনেমা-হলে ম্যাটিনি ঢুকে কাঁদতে বড় ভালোবাসত। সত্যজিৎ রায়ের ছবির বিজ্ঞাপন দেখে বাঙালি একটু ঘাবড়ে গি প্রথমে ভেবেছিল, এ নিশ্চয়ই ভালো 'বই' নয়। দেখতে গেলে টাকাটা জলে যাবে। কিন্তু ' পরিবারের হাসিকান্নার কাহিনী' বিজ্ঞাপনে পড়লে শনিবার সন্ধেবেলায় গিন্নিকে নিয়ে 'বই' যেতেন কর্তা।

সেই মেয়েরা যখন আগল ভেঙে বাইরে এল, বলল, আগে নিজের পায়ে দাঁড়াব তারপ কথা বোলো, তখন 'গেল গেল' রব উঠেছিল। স্কুল, বড়জোর কলেজের মাস্টারি, তার চাকরি করে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েরা। বাঙালির অন্তঃপুরের মেয়েদের কি তা মানায়? কি যদি একবার ফাটল খুঁজে পায় তাকে আটকাবে কার সাধ্য? মেয়েরা এত দ্রুত পৃথিবীটা করে ফেলল যে পুরুষরা এখন খাবি খাচ্ছে।

এবারের বইমেলায় একটি মেয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল,—আঙ্কেল, একটা কথ পারি?

—নিশ্চয়ই।—আমি পাঁচফুট চার ইঞ্চি লম্বা, ছিপছিপে শরীর, জিন্‌স্ আর টপে শোভিত দিকে তাকালাম।

—আমি উৎসা। ইকনমিক্সে এম.এসসি. করছি। বাই এনি চান্স, আপনি স্কটিশে যখন পড়তেন তখন সুপ্রভা নামের কোনো ক্লাসমেটকে চিনতেন?

সুপ্রভা! অধ্যাপকের পেছনে আসাযাওয়া করত যারা তাদের মধ্যে কার নাম সুপ্রভা ছিল? উৎসা হাসল,—জানি মনে করতে পারবেন না। ভদ্রমহিলা আমার মা।

দূরে দাঁড়ানো, কুঁচি না দিয়ে শাড়ি পরা এক গিন্নি হয়ে যাওয়া মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসে উৎসা বলল,—তোমরা একসঙ্গে পড়তে।

সুপ্রভা বললেন,—আপনার লেখা ভালো লাগে। আপনার চেহারায় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে। মেয়ে না বললেও চিনতে পারতাম।

পাশাপাশি দুই প্রজন্মের আকাশ-পাতাল ব্যবধান অবাক হয়ে দেখছিলাম।

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে। এখনকার বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ, নস্যির বিজ্ঞাপনেও স্বল্পবাস মহিলার ছবি ছাপা হয়। ক'টা মেয়ে নস্যি নেয়? অভিযোগ, পোশাক কমাতে কমাতে এখন যে পর্যায়ে চলে এসেছেন বিজ্ঞাপনের মহিলারা তাতে রুচিবাবু খুন হয়েছেন। বিজ্ঞাপনের বিশাল হোর্ডিং শহরের আকাশ ঢেকে ফেলেছে।

আমার চারপাশে সুন্দরী মেয়ের সংখ্যা বড় কম। বাংলা ছবির নায়িকাদের আর যাই হোক সুন্দরী বলা যায় না। বিজ্ঞাপনগুলোর দৌলতে আমি শয়ে শয়ে সুন্দরী দেখার সুযোগ পাচ্ছি। ওই যে মেয়েটিকে রোজ হোর্ডিং-এ দেখি, যে ভাইয়ের সঙ্গে খুনসুটি করত, এখন যাচ্ছে শ্বশুরবাড়ি, ওর মুখটা দেখলে মন পবিত্র হয়ে যায়। কিংবা মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপনে একটি শিশুর সঙ্গী কুকুরটিকে দেখে মনে হয় দারুণ ছোটগল্প পড়লাম। অথবা দুই ফেন্সিং-এর দু'পাশে দাঁড়ানো দুটো দেশের দুই বালক একসঙ্গে খেলবে বলে মাঝখানের নো ম্যান্‌স্ ল্যান্ডে চলে এসে বল খেলতে লাগল, এয়ারটেলের সৌজন্যে বিজ্ঞাপন কতটা আধুনিক হতে পারে তা জানতে পারলাম।

হ্যাঁ, যে মধ্যবিত্ত সুন্দরী বউটি পারফিউমের গন্ধে উন্মাদ হয়ে শরীরের স্বাদ নিয়েছিল পুরুষটির কাছ থেকে তা বাড়াবাড়ি হলেও তৃপ্ত মহিলার মুখের অভিব্যক্তিকে এখনও ভুলতে পারিনি। শীতে যে শীতবস্ত্র ব্যবহার না করে বিপাকে পড়ে, বুলাদি তাকে সতর্ক করে দেন, কন্ডোমের ক্ষেত্রে এই অমনোযোগ অনেক বেশি ক্ষতি করবে।

রঙিন হয়েছে বিজ্ঞাপন। প্রতিটি বিজ্ঞাপনের পেছনে এখন আধুনিক ভাবনা কাজ করছে। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের তৈরি শালীনতাবোধ আহত হচ্ছে, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে গত আটচল্লিশ বছরের বিজ্ঞাপনের পার্থক্য উৎসা আর তার মায়ের মতো।

এককালে বাংলা ছবি নিয়ে গর্ব করতে গিয়ে হিন্দি ছবিকে গালাগাল দেওয়া হত। মেলোড্রামা, অবাস্তব ছবিকে বলা হত—হিন্দি ছবি বানিয়েছে। আর এখন হিন্দি ছবির মান, অভিনয়, বিষয় নির্বাচন যে জায়গায় চলে গেছে তার কাছে বাংলা ছবিকে লিলিপুট দেখাচ্ছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই বোধহয় আধুনিকতার অন্যতম শর্ত।

মে ২০০৮

দিব

আন্তর্জাতিক দিবস-এর পরিকল্পনা যিনি প্রথম করেছিলেন তাঁর নিশ্চয়ই সাধু উদ্দেশ্য ছি গোটা দিন সারা পৃথিবীর মানুষ বিশেষ ইস্যুতে একত্রিত হলে তার মর্যাদা বাড়বে, চিলির সঙ্গে চীনের মানুষের যোগসূত্র তৈরি হবে।

কিন্তু একজন জল গড়িয়ে দিলেই অন্যান্যরা সেই জলে জল ঢালতে শুরু করেন। আ দিবসের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে তিনশো পঁয়ষট্টি যদি ছাড়িয়ে যায় তাহলে কী হবে? আর মাস বছরের শরীরে গুঁজে দিলে যে ভালো হত তা এখন কারও কারও মনে হচ্ছে।

গত সপ্তাহে ইতালির ভেনিস শহরের একটা খবর পড়েছিলাম। সেখানে নাকি প্রচুর নিয়ে ডন সম্মেলন করা হচ্ছে। পুলিশ প্রথমে অনুমতি দেয়নি। কিন্তু উদ্যোক্তারা প্রতিশ্রুতি আমন্ত্রিত জনেরা সেইরকম আচরণ করবেন যা ধর্মীয় সম্মেলন বা রাজনৈতিক সম্মেল দিতে আসা প্রতিনিধিরা করে থাকেন।

খবরটা পড়ে অনেক কাল আগের কথা মনে পড়ে গেল। আমি তখন স্কটিশ চার্চ ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র। আমাদের কলেজে নুকু নামের একটি ছেলে ছিল যার মাস্তানি ছিল। বসন্ত কেবিন থেকে কসমস রেস্টুরেন্ট, হেদুয়ার এই দিকটায় তখন নুকুর শাসন চলত পট্‌কা নুকুর নাকি ছুরির হাত ছিল দারুণ। কেউ ওর সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বললে নুকু তাকে দিত। সোডার বোতল ছুঁড়ে কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো যায় তা নুকুর কাছে শিখতে চাইত বস্তুত নুকুকে বিডন স্ট্রিটের ওই অচলের লোকজন বেশ সমীহ করে চলত।

আমরা বসন্ত কেবিনে আড্ডা মারতাম। একদিন নুকু এসে বসল, সামনের চেয়ারে। ভাইটি, একটা দরখাস্ত লিখে দিতে হবে।

জিজ্ঞেস করলাম,—কীসের দরখাস্ত?

—আরে শালা, মহাজাতি সদনটা ভাড়া করব ঠিক করেছি। কিন্তু ওরা বলছে দরখাস্ত হবে। তাকে লিখতে হবে, কীসের অনুষ্ঠান হবে।

—বেশ তো, লিখে দিচ্ছি! কে কে আসছে? হেমন্ত? সন্ধ্যা?

—ফোট্! ওসব গানফানের অনুষ্ঠান তোরা কর। আমি ওই লাইনে নই। বেশ গুছি দে তো। মহাজতি সদনে আমি সারা কলকাতা মাস্তান সম্মেলন করব। একদম নতুন জিনিস। য হবে।—নুকু বলেছিল।

সারা কলকাতা মাস্তান সম্মেলন! আমরা হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তানসেন সম্মেলন, বঙ্গ স আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু মাস্তান সম্মেলন?

নুকু বোঝালো,—দ্যাখ্, পাড়ায় পাড়ায় চুনোপুঁটি ছোকরারা মাস্তান হওয়ার স্বপ্ন দেখছে

কন্ট্রোলে আনা দরকার। ধর, পুরো কলকাতাটা বারোটা এলাকায় ভাগ করব। প্রত্যেক এলাকায় একজন হেড মাস্তান থাকবে। তার আন্ডারে একশো বা হাজার থাক, হেড মাস্তানের পারমিশান নিয়ে তাদের কাজ করতে হবে। এক এলাকার মাস্তানদের সঙ্গে অন্য এলাকার মাস্তানদের ঝামেলা হলে দুই এলাকার হেড মাস্তানরা বসে মিটমাট করে নেবে।

—এই বারো জন হেড মাস্তান কে বেছে নেবে?

—আমি।—নুকু হাসল,—আমি অলরেডি খবর নিয়ে লিস্ট বানিয়ে ফেলেছি। কোনো স্বজনপোষণ করিনি। সবাই যাকে ভয় পায়, সমীহ করে, তাকেই নিয়েছি।

—সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবে কে?

—হয় গোপালদা নয় রামদা।—নুকু হাসল,—গোপালদারই চান্স বেশি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেন। জানিস নিশ্চয়ই, বিধান রায় পর্যন্ত ভালোবাসতেন।

—সেক্রেটারি?

—আমি ছাড়া আর ভালো লোক পাবে নাকি? আর হ্যাঁ, মহাজাতি সদনের যা সিট তা থেকে একশো সরিয়ে রেখে বাকিটা বারো ভাগ করে হেড মাস্তানদের দিতে হবে যাতে তারা ঠিকঠাক শিষ্যদের নিয়ে আসতে পারে।—নুকু বুঝিয়ে বলল।

দরখাস্ত লিখে দিলাম। কিন্তু নুকুকে পুলিশ ধরায় সম্মেলন ভেস্তে গেল। শুনেছি নুকু কোনোমতে পাসকোর্সে বি.এ. পাশ করে ল পড়েছে কয়েক বছর ধরে। এখন বোধহয় ওকালতি করে।

ইতালির খবরটা পড়ে নুকুর মুখ মনে পড়ল। চল্লিশ বছর আগে নুকু যা ভাবতে পেরেছিল আজ ওরা ভাবছে।

তখনই মাথায় ভাবনাটা এল। আচ্ছা, কেউ কি ভাবছে একটা আন্তর্জাতিক মাস্তান সম্মেলনের আয়োজন করব? যেদিন ওটা হবে সেই দিনটাই হবে আন্তর্জাতিক মাস্তান দিবস। সে দিনটা শুধু মাস্তানের দিন। ঘরে-বাইরে, রাস্তাঘাটে শুধু মাস্তানরাই ঘুরবে। দিনভর চলবে মাস্তানি। চিলি এবং চীনে, একই সঙ্গে।

এসব যখন ভাবছি তখন পাশের বাড়িতে চিৎকার শুরু হল। জানলা দিয়ে লক্ষ্য করলাম, সুহাসবাবু মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে যাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী সামনে দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারলাম, লুকিয়ে সিগারেট খেতে গিয়ে সুহাসবাবু ধরা পড়ে গেছেন।

নুকু কোথায় জানি না। আন্তর্জাতিক মাস্তান দিবস চালু হলে অনেক ঘরনি খুশি হবেন, স্বীকৃতি পাবেন, এটা নুকু জানল না!

জুন ২০০৮

WRONG

আচ্ছা কে না পালটি খায়? কোন রামছাগল মনুষ্য-সমাজে আছে যে সিংহ তেড়ে আসছে বুক চিতিয়ে ভোঁতা শিং উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে? আরে, আপনি বাঁচলে তবে তো বাপের না পারব! বাপ মানেই পূর্বপুরুষ। তাঁদের ইতিহাস বলার জন্যে পালটি খাওয়া একেবারে শা

সমাজে নির্বোধ ব্যক্তির সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। তবে এরা মাত্র একটাই শিক্ষা বিড়া থেকে পেয়েছে—যে পালাবে সে বাঁচবে। একটাই পথ। তাই যে-কোনো সমস্যা এলেই সুড় করে সরে দাঁড়ায়। তখন তাদের একমাত্র বিনোদন হল পরচর্চা করা। পরচর্চা মানে অপদার্থ বলে কৃতার্থ হওয়া।

এদের মতে দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব নাকি পালটি খেতে চোখের পলক ফেলার করেন না। যারা পালটি খায় তাদের ওপর তো বিশ্বাস রাখা যায় না, কিন্তু দেশের দা নিয়েছেন তাঁদের এড়িয়েও তো বাঁচা যায় না। তাই একনম্বরের পালটিবাজ জেনেও এঁ দিতে হয়। যখনই কোনো বৃহৎ সমস্যা থাবা বাড়ায় তখনই রাজনৈতিক নেতারা নিজেদে থেকে সরে আসেন। তখন তাঁদের বক্তব্য একটাই—পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে উপায় নেই। তাই দেখে নিরাপদ দূরত্বে বসে যারা 'পালটি খেল পালটি খেল' বলে চ্যাচা জানে ওই চিৎকারেই তাদের যাবতীয় আনন্দলাভ হয়ে গেল।

কংগ্রেসিদের মধ্যে পালটি খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। কংগ্রেসে পাত্তা না পেলে চলে য কংগ্রেসে। সেখানে যাওয়ার পর পায়ের তলার মাটি নড়বড়ে হলে ফিরে এসো কংগ্রেসে রমরমা দেখে আধা-বড় নেতা ছুটেছিলেন তৃণমূলে। যাওয়ার পর দেখলেন তাঁদের কো নেই, মমতার ইচ্ছেই শেষ কথা, শুনলে তুমি নেতা থাকবে, নইলে জগন্নাথ, তখন হুড়মুড়ি কংগ্রেসে ফিরে আসতে হল। দু-একজনের, যাঁদের এখনও চক্ষুলজ্জা অবশিষ্ট আছে তাঁরা না। অর্ধমৃত সৈনিক হিসেবে তৃণমূল-ক্ষেত্রে পড়ে থাকলেন। মজার ব্যাপার হল, কংগ্রে বেরোবার দরজা যেমন খোলা থাকে, ঢোকারটাও বন্ধ হয় না। হোটেলের কিছু নিয়মকা ধর্মশালার সেই বালাই নেই।

কম্যুনিস্ট দলগুলো থেকে বেরিয়ে গেলে তোমার কেরিয়ার শেষ। বেশকিছু উঠতি ে করেছিলেন দল থেকে বেরিয়ে নতুন দল করতে, তাঁরা এখন শুধুই স্মৃতি। কম্যুনিস্টদে হল, দল থেকে বেরিয়ে তাঁরা কংগ্রেসে ঢুকতে পারেন না। এক-আধজন তৃণমূলে ঢোকার পর পাবলিক ভোটের বাক্সে তাঁদের মাথা মুড়িয়ে অ্যাইসা ঘোল ঢেলে দিয়েছে যে বাকি পিট্‌পিটিয়ে তাকিয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাজনৈতিক দাদাদের পালটি খাওয়া সাতখুন মাফ।

কলেজে আমার সঙ্গে একটি রোমিও পড়ত। সে মাসে একটি প্রেম করত। দ্বিতীয় ম

প্রেমে যাওয়ার সময় আমাদের জানাত যে ওর মায়ের নাকি মেয়েটিকে পছন্দ নয়। এই করে করে এক বছরে বারোটি প্রেম সেরে ফেলল সে। তেরো নম্বর মেয়েটির সঙ্গে যখন তার তুমুল প্রেম চলছে তখন সে একদিন বিধ্বস্ত অবস্থায় কলেজে এল। ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ফেলছে, পোশাক, চুল উসকোখুসকো। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলল,—ও পালটি খেয়ে গেছে।

কীরকম পালটি? শুনলাম প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে গিয়েছিল বাড়িতে। বাবা-মা-কাকার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তারপর তিনদিন প্রেমিক-প্রেমিকার দেখা পায়নি। ফোন করলেও কথা বলেনি। কাল বিকেলে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। সে তার গভীর প্রেম নিবেদন করতে গেলে মেয়েটি বলেছে,—ছিঃ! আজ বাদে কাল আমি তোমার কাকিমা হব, এসব কথা আমাকে বোলো না।

শুনে মাথায় বাজ পড়ে গিয়েছিল প্রেমিকের। রাত্রে শুনেছে বাবা-মা নাকি ওদের বাড়ি যাবে বিয়ের কথা বলতে। এই তিনদিন তার অবিবাহিত, বড় চাকরি করা কাকা ওর সঙ্গে দামি রেস্টুরেন্টে ঘুরে ঘুরে মন দেওয়া-নেওয়া সেরে ফেলেছে।

সেদিন পালটি খাওয়ার এই ঘটনা শুনে আমরা অবশ্য খুশি হয়েছিলাম। পরবর্তী কালে দেখেছি, যে ঠিকঠাক পালটি খেতে পারে সে জীবনটাকে ভালো উপভোগ করতে পারে। বেঁচে থাকাটা বৈচিত্র্যে ভরে যায়। বিবাহিত জীবনে যে কতবার পালটি খেতে হয় তা সবাই জানেন। গৃহশান্তি বজায় রাখতে মা-বোনেদের কাছে একরকম, আবার স্ত্রীর কাছে ওই এক ইস্যুতেই অন্যরকম না হলে সংসার শ্মশান হয়ে যাবে।

পালটি কে না খায়? ফুটবলার খাচ্ছে, বাড়ির কাজের লোক খাচ্ছে; পালটি খাওয়া হল বেঁচে থাকার একমাত্র রাস্তা।

পালটি জনসাধারণ নিজে খেতে পারে না। তাদের খাওয়ানো হয়। কোনো একটি এলাকায় বামপার্টি প্রত্যেকবার জিতত। নির্বাচনে ডানপার্টির ভরাডুবি হত। গতবার বামপার্টির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হল একজন স্কুলশিক্ষককে। এলাকার সবাই তাঁকে সরল সহজ মানুষ বলে জানত। উনি হারবেনই জেনে কেউ কেউ আপশোস করতে লাগল, কেন দাঁড়াতে গেলেন! নির্বাচনের আগের দিন বোমাবাজির মধ্যে আচমকা চলে গিয়ে তাদের বোঝাতে চাইলেন বৃদ্ধ। কিন্তু বোমার ঘায়ে আহত হয়ে হাসপাতালে যেতে হল তাঁকে। নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেল। তারপর যখন আবার নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হল তখন শিক্ষকের স্ত্রীকে মনোনয়ন দিল ডানপার্টি। শিক্ষক কিছুটা সুস্থ হলেও হাঁটতে পারেন না। তাঁর স্ত্রী বক্তৃতা দেননি আজও। শুধু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন,—ওরা আমাকে বিধবা করতে চেয়েছিল ভাই। আপনারা দেখবেন।

পালটি খেয়ে গেল পাবলিক। সহানুভূতির হাওয়ায় জিতে গেলেন ভদ্রমহিলা।

পালটি খায়নি বলে অচলপত্র বাঁচেনি। এখন মনে হচ্ছে, দীর্ঘ জীবনের জন্যে পত্রপাঠের অবিলম্বে পালটি খাওয়া দরকার।

কিন্তু পালটি খাওয়ার পর কী চেহারা নেবে তা আগে জানা দরকার। শেখরের উচিত অবিলম্বে শ্রীযুক্ত প্রদীপচন্দ্র সরকারকে সম্মোহন করে তাঁর মুখ থেকে সঠিক তথ্য জেনে নেওয়া।

জুলাই ২০০৮

আমরা সবাই স্ব

ব্রিটিশদের খুব বদনাম ছিল কন্‌জারভেটিভ বলে। তারা যেখানে সেখানে কলোনি তৈরি ক সেইসব দেশে নিজেদের ধ্যানধারণা, অভ্যেসগুলো এমনভাবে ইনজেক্ট করেছিল যাতে সেই দেশ মানুষদের রক্তে বেশ কয়েক পুরুষ ধরে ওগুলো বয়ে চলে। ওরা আমাদের শিখিয়েছিল শৃঙ্খলা। এগুলোর বেশিরভাগই ওদের নিজেদের স্বার্থে হলেও আমাদের পূর্বপুরুষরা তা নক বেশ সম্মানিত বোধ করতেন। মহিলাকে দেখলে টুপি খোলা বা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ানো, খেতে বসার সময় চামচ-কাঁটার শব্দ না করা, গপগপ করে না চিবোনো থেকে পোশাকেরও নর্ম তারা তৈরি করে দিয়েছিল। বিনোদনের জন্যে শহরে বেশ কয়েকটি ক্লাব তৈরি করেছিল প্রথম দিকে আমাদের পূর্বপুরুষদের সেইসব ক্লাবে ঢোকার অনুমতি ছিল না। পরে অনুমতি পাওয়া গেল তখন পায়ে জুতো-মোজা এবং শার্টে কলার থাকা বাধ্যতামূলক হল।

ব্রিটিশদের চলে যাওয়ার কথা ছিল সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্টে। সুভাষ চক্রবর্তী যতই পায়ের মানুষ নিয়ে ক্লাবের ভেতর তোলপাড় করুন না কেন, আমাদের রক্ত থেকে ব্রিটিশ ব তো সহজে যাওয়ার নয়! এখনও কলারহীন গেঞ্জি পরে ক্লাবে ঢোকা যাবে না, পায়ে জুতো বাধ্যতামূলক ছিল এই সেদিন পর্যন্ত। এখন স্যান্ডেল পরে ঢোকা যাচ্ছে, যদি তার স্ট্র্যাপ অর্থাৎ ন্যাংটো পা থাকলে চলবে না, তাতে ঘোমটা পরাতে হবে। রেসকোর্সের মেম্বার্স এনক্লে আবার জিন পরে ঢোকা যাবে না।

সকালে কাউকে ফোন করলে গুডমর্নিং বলতে হবে। তাছাড়া ফোন তুলে 'হ্যালো' ন 'বলুন' বলতে পারে পাঁচ শতাংশ বাঙালি। প্রথম পরিচয়ের সময় করমর্দন করতে হবে পু সঙ্গে, মেয়েদের সঙ্গে নয়। কেন নয়? কেন 'হ্যালো' বলে হাসতে হবে অথবা দুটো হাত যুক্ত দেখাতে হবে?

কয়েক শতক ধরে আমরা ব্রিটিশ কালচারে হাঁসফাস করছিলাম। স্বাধীনতার পর কলকাতায় গোনা 'বার' ছিল, সিনেমা এবং থিয়েটার হল ছাড়া বিনোদনের জায়গা ছিল না। সেসব জ মদের পরিমাণ পেগ অথবা টিকিটের শ্রেণী ড্রেস সার্কেল, ব্যালকনি অথবা ফার্স্টক্লাস ইত সীমাবদ্ধ ছিল, যা কিনা ব্রিটিশদের দান।

কাঁহাতক এসব পোষায়? প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ওরা চলে গেলেও অনেক সহ্য করেছি ত গত দশ বছরে হাঁসফাস করে জাল ছিঁড়ে বেরোবার চেষ্টা করেছি। যেমন করে ডিমের ে প্রথমে চিড় ধরায়, তারপর দুমড়ে মুচড়ে ফেলে পাখির ছানা বেরিয়ে আসে, তেমনি বেরিয়ে এ এখনও ডানায় জোর আসেনি বলে উড়তে পারছি না।

উড়তে একটু সময় লাগেই। লাগুক। কিন্তু বেরিয়ে এসে যে ফর্মা দেখাচ্ছি তাতে ব্রিটিশ রক্ত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। বলা যেতে পারে, এতদিন পরে আমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারছি।

এই যুক্তির প্রভাব পড়েছে সর্বত্র। পঞ্চাশ থেকে এক লক্ষ খরচ করলে আমরা কোনো কোনো ক্লাবের সদস্য হয়ে যেতে পারছি। স্ট্র্যাপ-চপ্পল পরে সই করে মদ খাচ্ছি চুটিয়ে। পাজামা-চটি পরে মদ খাওয়ার জন্যে বারগুলো রয়েছে। সন্ধের পরে বন্ধুরা বাড়ি এলে জিজ্ঞেস করছি—কী খাবে? হুইস্কি না রাম? মা-বাবা-পিসিরা দেহ রাখার পর বাড়ি থেকে চায়ের পাট উঠে গেছে প্রায়। এখন নব্য বাঙালি সকালে উঠে থিন অ্যারারুট বিস্কুট আর কমপ্লান খেয়ে স্বামী-স্ত্রীতে অফিসে যায় বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে। অফিসেই ব্রেকফাস্ট সারে, লাঞ্চও করে। ছুটির পরে ক্লাব বা রেস্তরাঁয় গিয়ে ডিনার সেরে বাড়ি ফেরে রাত দশটায়। অতএব বাজারে যেতে হয় না, রান্নার বালাই নেই।

রবিবারের জন্যে শ্বশুরবাড়ি তো আছেই।

এখন বাঙালির দুটো চরিত্র। একটা মাটির ওপরে, সেখানে বাপ-ঠাকুরদার একটু ছোঁয়া এখনও থেকে গেছে। অন্যটা মাটির নিচে। সেখানে আমি কার, কে আমার। সতেরো বছরের ধানি লংকার মতো শরীরে জিন্‌স আর টপ্‌ জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে তরুণী। তার কাঁধের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে রড ধরেছে যে যুবক, তার শরীরে ঈশ্বর মাংস দিয়েছেন কৃপণ হাতে। দেখলেই বোঝা যায়, পাঁচশো মুরগি কিনে এনে বাড়ির দশজনের জন্যে রাঁধা হয় যে সংসারে, সেখান থেকে এসেছে। কানে দুল, পরনে ফেডেড জিন্‌স, গেঞ্জি, চুলের ঝুঁটি কায়দা করে বাঁধা। দুজনে পাতাল রেলের দুলকিতে দুলছে। গালে গাল লাগাচ্ছে। চোখে চোখ। পৃথিবীটা অদৃশ্য হয়ে আছে ওদের কাছে। দু'পাশের বেঞ্চিতে যারা বসে আছে তাদের চোখ বন্ধ। পাতাল রেলে বসার জায়গা পেলেই বাঙালির ঘুম পেয়ে যায়। সবে ডিম ভেঙে বেরিয়েছে বাঙালি, ডানায় জোর আসেনি তাই এখনও ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরতে পারেনি। কিন্তু এই দৃশ্য মাটির ওপরে হলে ভিড় হয়ে যেত। মাটির নিচের পাবলিক নিরাসক্ত। মাটির নিচে নামলে স্বভাব পালটাবেই।

প্রস্রাব পেয়েছে? যদি পুরুষ হও, তাহলে ফুটপাতের ধারে চলে গিয়ে দেয়াল ভেজাও, কারও বাপের সধ্যি নেই কিছু বলবে। আমরা সবাই রাজা। যদি মেয়ে হও তাহলে মা আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রকৃতি তোমাদের শত্রু। তাই জিন্‌স, প্যান্টি খোলার ঝামেলা আছে এখনও। তোমাদের খুঁজতে হবে সুলভ টয়লেট। কী জ্বালা!

আমাদের অল্প বয়েসে ইংরেজি সিনেমা দেখতে গিয়ে নায়িকার বুকের দিকে তাকাতাম। বুকের বিভাজন রেখা দেখে মোহিত হয়ে ভাবতাম, বাঙালি মেয়েরা কবে একটু সাহসী হবে। হিন্দি সিনেমার ভ্যাম্পরা যখন সেই সাধ পূর্ণ করল তখনও নায়িকারা কাপড়ের আড়াল ধরে রেখেছিল। কিন্তু এখন? আমরা সবাই রানি। বড় বড় শপিং মল-এ গেলেই নিতম্ব বিভাজিকার ফেস্টিভাল দেখা যায়। ডগ শো, ফ্লাওয়ার শো এখন ব্যাকডেটেড ব্যাপার-স্যাপার। বাজার জমে উঠেছে এখন মেরুদণ্ডের নিচের বিভাজিকা প্রদর্শন করায়। দেখলেই ভয় হবে, প্যান্টটা পড়ে গেল বলে!

যুবকদের ভয় হয় না। আশা হয়, যদি পড়ে যায় তাহলে তাদের পরাণ জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু পড়েও পড়ে না—এ কেমন প্যান্ট!

এ এক ভাঙচুরের সময়। যে যার ইচ্ছে তাই করছে। আমি করব, তোমার বাপের কী! 'ভাঁড়মে পাঠিয়ে দেব'র মানে বুঝতে পারছেন না? আপনি কী ধুর বাঙালি? আমি গল্প লিখব, যা ইচ্ছে তাই লিখব, আপনি বলার কে? আমার লেখায় যদি নয় বছরের ছেলে হস্তমৈথুন করে আনন্দ পায় তো লিখব না কেন? আমার লেখায় যদি আট বছরের মেয়ে মা-দিদিকে দেখে লুকিয়ে কেয়ারফ্রি পরে পাড়ার ছেলেদের সামনে দুলকি চালে হাঁটে আর সেটা যদি আপনি অপছন্দ করেন তাহলে

বাংলা সাহিত্য আপনার জন্যে নয়। কেস করবেন? অশ্লীলতা? হা হা হা? টুক্‌ করে আ ব্যালেন্স বাড়িয়ে দিন না। তখন দেখব কী করে আমাকে আকাদেমি না দিয়ে থাকে!

গতকাল এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি সুন্দরী মহিলাকে তার ি শিশুকন্যা এসে জিজ্ঞেস করল,—মা, ফাক্‌ মানে কী?

মা হেসে বলল,—ওটা আর ক'টা বছর পরে জানতে পারবে, এখন থাক।

কথাটা বলে হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে,—আমি একদম কন্‌জার্‌ভেটিভ নই, শেখর, আমরা সবাই রাজা কেন? কেন রানিও নয়?

এখনও সেকেলে থেকে গেলে হে!

আগস্ট ২০০৮

B-রোধি পক্ষ

যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে তাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষ প্রথম কয়েক মাস একটু চুপচাপ থাকেন। আশায় থাকেন, যেন নতুন সরকার মানুষের কথা ভেবে কাজ করেন। এই অপেক্ষার আয়ু বড়জোর ছয় কী আট মাস। আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভাব এত তীব্র যে-কোনো সরকারেরই পক্ষেই তার সবগুলোর সমাধান সম্ভব নয়। অতএব আশাভঙ্গ হতে বাধ্য। চালু কথা আছে, সরকারের সমর্থক তাদের দলের সদস্যরা, বাকি জনসাধারণ তাদের বিরোধী। সাধারণ মানুষ সবসময় সরকারের বিপক্ষে। সাতচল্লিশ সালে আমার বয়েস ছিল তিন। কিছু বোঝার কথা নয়। কিন্তু পাঁচে পৌঁছে বন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার করলে গায়ে কাঁটা দিত। আর একটু বড় হয়ে জেনেছিলাম, কংগ্রেস আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল। অতএব আমরা তখন মনে মনে কংগ্রেসি। কিন্তু সরকারের দায়িত্ব পাওয়ার পর কংগ্রেসি নেতাদের আচরণে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এমনকী সিনেমা হলগুলোতে যখন ছবি শুরুর আগে নিউজ রিলে গান্ধিজিকে দেখানো হত তখন দর্শকরা চিৎকার করে তাঁকে গালাগাল দিতেন। তবু অতীত ভাঙিয়ে কংগ্রেস সেই সাতষট্টি সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকতে পেরেছিল, কারণ বিরোধীদের ওপর মানুষের আস্থা ছিল না। কম্যুনিস্টরা তখন হয় রাশিয়ার বা চীনের এজেন্ট। সাধারণ মানুষের থেকে বহু দূরের জগৎ তাঁদের। তাঁরা যে ভাষায় বক্তৃতা করেন, যে গান গা'ন সভাগুলোতে, তার সঙ্গে বাঙালির পরচিয় ছিল না। কংগ্রেসিদের অপছন্দ করা সত্ত্বেও তাদেরই ভোট দিতে মানুষ বাধ্য হয়েছিল।

আমরা তখন সুকান্তর কবিতা পড়ে কংগ্রেসের প্রতি মোহ ঝেড়ে ফেলে বামপন্থী হয়েছি। এক পয়সা ভাড়া বাড়ানোর জন্যে আন্দোলন করতে গিয়ে যখন দেখলাম ট্রাম-বাস পোড়ানো হচ্ছে তখন থমকে গিয়েছিলাম। ওই বাস-ট্রাম তো আমাদের উপকারের জন্যেই রাস্তায় চলে। পুড়িয়ে ফেললে কাল তো আমাদেরই অসুবিধে হবে। এ তো নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা! দাদারা এসব ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। বললেন—কালকের কথা কাল ভাবব। এই ট্রামবাস এখন না পোড়ালে সরকারের টনক নড়বে না।

মানুষ কংগ্রেসকে বাতিল করেছিল, যখন অজয়বাবুর নেতৃত্বে সবক'টা বিরোধী দল যুক্তফ্রন্ট গঠন করেছিল। কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার কয়েক মাস পরেই মানুষ তাদের হঠাতে চেয়েছিল, পরিবর্তে কেউ যোগ্য ছিল না বলে পারেনি। এখন সবাই একত্রিত ভেবে সেই কাজটা করে দেখল, বিরোধীরা সরকারে এসেই খেয়োখেয়ি শুরু করে দিয়েছেন। ভোটে মানুষ বাতিল করেছিল বিরোধীদের।

মজার কথা হল, যাঁরা নিজেদের বামপন্থী ভাবেন, ভেবে অভ্যস্ত, তাঁরা যখন তিরিশ বছর আগে ক্ষমতায় এলেন, এসে থেকে গেলেন তাঁরা আর ডানপন্থী হলেন না। আগে প্রচার ছিল, ক্ষমতায় যাঁরা থাকবেন তাঁরা ডানপন্থী, যাঁরা থাকবেন না তাঁরা বামপন্থী। মুশকিল হল, কংগ্রেসিদের যেমন বামপন্থী বললে ভালো শোনায় না, তেমনি কম্যুনিস্টদের ডানপন্থী বললে অশিক্ষিত বলে মনে হবে

নিজেকে। তাই ক্ষমতা হাতে পেয়েও বামফ্রন্ট বারংবার সেই আচরণ করে গেছেন, যা তাঁ দল হিসেবে করতেন। কারখানা বন্ধ করেছেন, একসময় কম্প্যুটার ঢুকতে দিতে চাননি, শি তাড়িয়েছেন। মানুষ সহ্য করেছে কিন্তু ওদের সরিয়ে কাকে ভোট দেবে তারা? কংগ্রেস আস্থা তাদের এখন কোনো নেতা নেই, যাঁর ওপর মানুষ নির্ভর করতে পারে। তাই যতই অন বামফ্রন্ট তো একটা শৃঙ্খলাপরায়ণ দল—এই ভেবে ভোট দিয়ে এসেছেন এতকাল।

বিরোধী নেতা নেই। এই ফাঁকটা ভরাট করতে যখন মমতা নেমে পড়লেন আসরে মিত্রের কাছে দলীয় নির্বাচনে হেরে আলাদা দল করলেন, তখন মানুষ ওঁর কথায় মুগ্ধ হ বামপন্থীর মতো কথা বলতে লাগলেন তিনি। ছুটে যাচ্ছেন মানুষের বিপদে আপদে। গলায় চিৎকার, বাড়ির কাজের মেয়ের মতো সাদা শাড়ি পরা মমতা আসামাত্রই যে অর্জন করলেন তা পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক আসরে স্বাধীনতার পর কেউ করেননি। এক একাই দল চালাচ্ছেন। না আছে কোনো আদর্শ অথবা কেন্দ্রীয় কমিটি, তার জন্যে কোনে নেই, তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই জনতা জমে যাচ্ছে। লক্ষ্য করুন, ওঁর পাশে যেস নেতা প্রথমদিকে ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ সরে গেছেন বা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে থেকে সুদীপ, নির্বেদ, সুব্রতবাবুরা ওঁর নৌকোয় উঠে বৈতরণী পার হতে চেয়েছিলেন, করতে না পেরে ফিরে গেছেন পুরোনো দলে। মমতা তাঁর দলে কোনো নেতা রাখেননি, কর্মী সেই কর্মী নেতা হতে চাইলে সরিয়ে দিয়েছেন। কেউ তাঁকে পরামর্শ দিতে সাহস পান তাঁর আচরণ ক্রমশ এমন জায়গায় পৌঁছে গেল, যা বিশ্বাসযোগ্যতা হারাল। তা সে আলিপু ছাদে দাঁড়িয়ে গলায় চাদর পেঁচিয়ে আত্মহত্যার ভয় দেখানো হোক অথবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পার্টি অফিসে গিয়ে থাকা হোক।

হতাশা মানুষকে উন্মাদ করে। মমতা সবসময় প্রচারের মধ্যে থাকতে চান। আর সে গিয়ে মাঝে মাঝেই যা বলেন বা করেন তা যে তাঁর জনপ্রিয়তা হু হু করে কমিয়ে দি টের পান না, দলে কারও সাহস নেই ওঁকে বলার। এখন ওঁর মাথায় শিল্প, দেশের উন্না কথা নেই। একমাত্র চিন্তা—সিপিএম হঠাও। তার মধ্যে যদি শিল্প না হয়, হাজার হাজ চাকরি না পায়, তো না পাবে। এখন বিরোধিতার আর এক নাম মমতা।

ছেলেবেলায় এক জেঠিমাকে দেখেছিলাম। বিধবা মহিলাকে আমাদের বাড়িতে আ মনে হয়নি। বাবা-কাকাকে ধমকাতেন, মা-পিসিরা তটস্থ থাকত। ঠাকুরদার দূর- সম্পর্কে হওয়ার সুবাদে আমাদের বাড়িতে থাকতেন। সারাদিন বাড়িতে ওঁর গলা কেউ শুনত না। পুরুষরা কাজ থেকে ফিরতেন, তখনই কার কী ত্রুটি হয়েছে তা চিৎকার করে শোনাতেন বেরিয়ে পড়তেন পাড়া ঘুরতে। পাড়ায় মহিলাদের কাছে আমাদের নিন্দে করে না এলে হজম হত না।

ভারতীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকা এখন প্রায় ওই জেঠিমার মতো।

নভেম্বর ২০০৮

জোটের জট

তিন দশকের বেশি আমাদের রাজ্য শাসন করছে একটা জোটবদ্ধ দল, যার নাম—বামফ্রন্ট। বাঙালিরা একত্রিত হয়ে পুজো শুরু করলে দেখা যায় পাঁচ বছরের মধ্যে খেয়োখেয়ি করে আরও দুটো পুজো শুরু হয়ে গেছে। কোনো বাঙালি ক্লাব কয়েক বছরে ভাঙেনি, এমন রেকর্ড আমার জানা নেই। পার্টনারশিপের ব্যবসায় অবিশ্বাস এসে পড়ে স্বাভাবিক স্বভাবে। সেক্ষেত্রে এতগুলো রাজনৈতিক দল বামফ্রন্টের সাইনবোর্ডের নিচে এতকাল ঘর করছে—এ খবর গিনেজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে জায়গা পেলে অবাক হব না। সারা বাংলা জুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো সিপিএম থেকে মেদিনীপুরের একাংশে টিমটিম করে টিকে থাকা কিরণময় নন্দর দল হাতে হাত রেখে বলতে পারেন—আমরা বামফ্রন্ট।

সম্প্রতি আমার এক প্রবাসী সাংবাদিক বন্ধু কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি এ রাজ্যের খবর ভাসা-ভাসা রাখেন। বিধায়কদের সংখ্যা পর্যালোচনা করে আমায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন,—আমি বুঝতে পারছি না, সিপিএম যখন একাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তখন তারা নিজেরাই পশ্চিমবঙ্গ শাসন করছে না কেন?

বললাম,—সবাই একসময় কংগ্রেসের বিপক্ষে ছিল, একসঙ্গে লড়াই করেছে, সবাই বামপন্থী। তাই সরকারের দায়িত্ব পেয়ে মিলেমিশে আছে।

বন্ধু মাথা নাড়ল,—তাহলে এসইউসি বাদ কেন? ওরা তো কট্টর বামপন্থী।

—এসইউসি যদি না আসতে চায় তাহলে কী করা যাবে?—উদাস গলায় বললাম।

যেদিন কথা হচ্ছিল, সেদিন টিভিতে শুনলাম, মেট্রোকে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে অপমানিত বোধ করায় ফরওয়ার্ড ব্লক বামফ্রন্ট ছেড়ে চলে যাবে। মেট্রোকে লাইসেন্স দিয়ে, তাদের প্রচুর বিনিয়োগ করিয়ে আবার সেটা প্রত্যাহারের পেছনে যে যুক্তি তাঁরা দেখাচ্ছিলেন তা এত হাস্যকর যে সাধারণ মানুষ দপ্তরের মন্ত্রীকে মহম্মদ বিন তুঘলকের অপসংস্করণ হিসেবে দেখতে পেল। বামফ্রন্টের ইজ্জত রাখতে মুখ্যমন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হল। ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে ফরোয়ার্ড ব্লকের হম্বিতম্বি শুরু হয়ে গেল। তাঁদের দপ্তরের মন্ত্রীর কাজে নাক গলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রচণ্ড অন্যায় করেছেন। তাই একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদেশ প্রত্যাহার না করলে তাঁরা মহাকরণে আর ঢুকবেন না। পাড়ার পানওয়ালা ঠাকুরের ছেলে দিব্যি বাংলা বলে। বলল,—যাবি কোথায়? গেলে তো না খেয়ে শুকিয়ে মরবি!

সাংবাদিক বন্ধু বললেন,—ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতা বৃদ্ধ, অভিজ্ঞ মানুষ। আমি আগেও শুনেছি, ওঁদের সঙ্গে সিপিএমের নানান ব্যাপারে সংঘাত হয়েছে। এখন যখন উনি আল্টিমেটাম দিয়েছেন তখন মুখ্যমন্ত্রী নরম না হলে ওরা ফ্রন্ট ভেঙে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু মুশকিল হল, তারপর কী হবে?

উত্তরটা ওঁর জানা ছিল। ফ্রন্ট ভেঙে বেরিয়ে এলে ফরোয়ার্ড ব্লকের কী হবে তা একটি বালকও জানে। এবং এও জানে যে, আস্ফালন দেখাবার পর ওই দল এখন খুঁজছে, কোন সম্মানজনক

সমাধানের সুযোগ নিয়ে আবার বামফ্রন্টে ফেরা যায়। দলের নেতাকে রক্ষা করতে বামফ্রে ডাকা হল। বৈঠকের শেষে কোলাকুলি, হাসিমুখ নিয়ে ঘোষণা করা হল, ফরোয়ার্ড ব্লক সংসারেই থাকছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করে নির্দেশ দিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে দিতে হবে।

এ কথা সবাই জানেন, সিপিএমকে বাদ দিয়ে ভোটে দাঁড়ালে বাকিরা মিলে গোটা ব পেলেও পেতে পারেন, কিন্তু মন্ত্রিত্বের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন। সেই স্বাদ এত মধুর মরে গেলেও তা ত্যাগ করতে রাজি নন। অপদার্থ বেকার আত্মীয় যেমন অবহেলা স কোনো পরিবারে থেকে যান দু'মুঠো খাবার আর আশ্রয়ের লোভে, তেমনি এঁরাও বাম চলে যাবেন না।

বন্ধু সাংবাদিক আবার জিজ্ঞেস করলেন,—সিপিএম একা লড়লে মন্ত্রিত্ব পেত?

—গতবারে অবশ্যই পেত।—বললাম।

—তা সত্ত্বেও বামফ্রন্ট করার পেছনে, আমার মনে হয়, অন্য কারণ আছে।—সাং বললেন,—সিপিএম নিরাপদে থাকতে চেয়েছে। বিরোধীদের সংখ্যা বাড়াতে চায়নি। তাতে বেড়ে যেত। সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে অনেক নিশ্চিন্ত থাকতে চেয়েছে।

হয়তো সাংবাদিক বন্ধু ঠিক বলেছেন। কিন্তু বাঙালি যত খেয়োখেয়ি করুক, তিরিশ ব আছে, এটা কম কথা নয়।

সাংবাদিক বন্ধু হাসলেন,—ফরোয়ার্ড ব্লক বেঁচে গেল, কিন্তু সিপিএম বাঁচেনি।

—মানে?

—আমেরিকার সঙ্গে সই-সাবুদ না করার জন্যে কংগ্রেসের ওপর চাপ দিচ্ছিল, ভে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছিল; কিন্তু মনমোহন সিং যে অনড় থাকবেন, তা ভাবতে পারেনি। এল তখন প্রধানমন্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়াবার লোক জুটে গেল। ফলে সরকারকে নিয়ন্ত্র ক্ষমতা হারিয়ে ফেলল তারা। শুধু তাই নয়, তৃতীয় ফ্রন্ট তৈরি করার স্বপ্ন ভেঙে যা পর এক দল তাদের সঙ্গ ত্যাগ করায়।—সাংবাদিক বন্ধু জানালেন।

অতএব জোটে থাকার সুফল নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। একটু নিমপাতা, উচ্ছে গিলতে কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রে গায়ে গা মিলিয়ে থাকলে রাজভোগ রাবড়িও শেষ পাতে পাং

ডিসেম্বর ২০০৮